হেমেন্দ্র
কুমার রায়
রচনাবলী

সূচীপত্র

ভূমিকা

হেমেন্দ্রকুমার রায়, আমাদের হেমেনদার কথা মনে হলেই তাঁর সমুজ্জ্বল উপস্থিতির কথা স্মরণে ভাসে।

প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেটা অবশ্যই তাঁর প্রথম দর্শন নয়। তার অনেক আগেই মৌচাক কার্যালয়ে তাঁকে একাধিকবার দেখেছি। তবে এটাকে তাঁর সাক্ষাৎকার বলতে পারি।

একেবারে ট্যাক্সি করে তিনি আমার ঠনঠনের ক্ষেত্রকুটীর বাসায় এসেছেন। গাড়িতে অসামান্যা রূপসী তাঁর দুই মেয়ে।

আমি তাঁর ট্যাক্সিতে উঠলে তিনি বললেন, চলো, এবার নজরুল-কে পাকড়াই।

নজরুল সে-সময়ে জেলে পাড়ায় থাকতেন। আর সত্যি বলতে জেল-খানাটাই ছিল নজরুলের আসল পাড়া। তাই জেলে থাকলেতো বটেই, বাইরে থাকতেও তিনি যেন জেলের চৌহদ্দিতেই, নামগন্ধের দিক দিয়ে বেছে নিয়েছিলেন।

হেমেনদা, তাঁর নতুন বাড়ি বানিয়েছিলেন। গঙ্গার বিচালি ঘাটে, কলকাতার বাগবাজার স্ট্রীটের মোড়টায়।

সেখানে তেতলার এক কোণে তাঁর পরিপাটি লেখার জায়গাটি, চেয়ার টেবিল নিয়ে, লেখার প্যাড সাজিয়ে, আশেপাশে নানা ভাস্কর্য সৃষ্টির সমারোহের মধ্যে।

তাঁর লেখার ঐ কোণটির কাছ থেকে সম্মুখে প্রবাহিত সুবিস্তৃত উদার গঙ্গার সুবিপুল বিস্তার চোখের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত। লেখা-টেখা যেন আপনার থেকেই আসতে চাইত।

হেমেনদার বাড়ির ঐখেনে বসে অনেক দিন আমরা আপ্যায়িত হয়েছি।

হেমেনদার বন্ধু শিশিরকুমার, শিশির ভাদুড়ি প্রায়ই সেখানে আসতেন— খানাপিনার জন্য। এবং নিজের নাট্যশালার অভিনয় প্রযোজনার বিষয়ে কলা কৌশলের সন্ধানে হেমেনদা, কেবল লেখকমাত্র ছিলেন না, তিনি নাট্য প্রয়োগ -নাটকীয় প্রযোজনা —পারিপাট্যের ব্যাপারেও ছিলেন ওয়াকিবহাল।

শিশিরকুমারের সীতাতে তো বটেই, ষোড়শী পর্যন্ত তাবৎ সৃজনেই

হেমেনদার যথেষ্ট অবদান ছিল। শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরেই বেশির ভাগ সময় কাটাতে দেখেছি তাঁকে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমারের অবদান অতুলনীয়। ছোটদের সাহিত্য আগে ছিল নিছক রূপকথার জগত, বেঙ্গমা বেঙ্গমির মুলুক। হেমেন্দ্রকুমার সেখানে যকের ধনের আমদানি করে অ্যাডভেঞ্চারের অবকাশ গড়লেন। অ্যাডভেঞ্চার মূলক তাঁর কাহিনীগুলির তুলনা হয় না।

সত্যি বলতে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর জগত থেকে ছোটদের সাহিত্যকে যে প্রশস্ত রাজপথে তিনি নিয়ে এলেন, সেখানে আমাদের সবারই দরাজ গতি ছিল অবারিত। সকলেই আমরা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য মতো রচনার অবকাশ পেয়েছিলাম। ধূমায়িত কিশোর জগত তাঁর সমুজ্জ্বল আলোয় প্রধূমিত হয়েছিল।

বাংলা শিশু-কিশোরদের সাহিত্যকে সেই আদ্যিকালের বেঙ্গমা বেঙ্গমীর জগত থেকে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন হেমেন্দ্রকুমারই। তার পরে আমরা সবাই তাঁরই অনুবর্তী।

শিশুসাহিত্যকে সাহিত্যের পর্যায়ে তিনি তুলে ধরার পর থেকে তার পাঠক দলে বয়স্করাও আসর জমিয়েছেন। সাহিত্য, আমার ধারণায়, বয়স্ক বা কিশোর সাহিত্য রূপে ভাগ করা যায় না বোধহয়। সেই কারণে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় প্রভৃতির শিশু-সাহিত্য বয়স্করা প্রচুর আগ্রহে পড়েন এবং আনন্দ পান। আর বয়স্কদের পাঠ্য লেখা শিশু-কিশোররা পড়ে স্ফূর্তি পায়।

সাহিত্য মূলত এক প্রবহমান আনন্দধারা। যাতে অবগাহণে ছোটবড় কারোরই কোনো বাধা নেই। রসো বৈ সঃ— সেই রস আনন্দ রস। কিশোর সাহিত্যে বা শিশু পাঠ্য কেতাবে তার অনন্য স্ফূর্তি প্রকাশ পেলে সকল বয়সের সব পাঠকই সমবয়সীর পর্যায়ে পড়ে যান এবং সানন্দে পড়ে যান। সেই আনন্দ কেবল ছত্রে ছত্রেই পাত্র থেকে পাত্রে বয়ে চলে। কোনোদিনই তার ইতি হয় না।

শিবরাম চক্রবর্তী

ড্রাগনের
দুঃস্বপ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

উড়ন্ত ছায়ামূর্তি

শখের ডিটেক্‌টিভ জয়ন্ত এবং বন্ধু মাণিকলালের নাম-ডাক অল্প নয়। তাদের কৃতিত্ব-কাহিনী বাঙলা মাসিকপত্রে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। শুনতে পাই, বাঙলার ছেলে-মেয়েরা তাদের কথা শুনতে ভালোবাসে।

এবং অনেক রকম অসমসাহসিক কার্য করে বিমল আর কুমারও বাঙলাদেশে অত্যন্ত নাম কিনেছে, এ-কথাও অত্যুক্তি নয়।

এই জয়ন্ত ও মাণিক এবং বিমল ও কুমার একবার একটি অদ্ভুত ঘটনাক্ষেত্রে এসে পড়ে একত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেই আশ্চর্য কাহিনী এখনো কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আমরা আজ সেই গল্পই আরম্ভ করলুম।

অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় দু-দুটো ভীষণ হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানান সংবাদপত্রে বিষম আন্দোলন হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হত্যাকারীর খোঁজ পাওয়া যায় নি, কিন্তু মৃতদেহের পাশে পাওয়া গিয়েছে, ড্রাগনের ছবি-আঁকা ও ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যা লেখা একখানা করে কাগজ।

এই সময়েই একটি বৃষ্টিস্নাত সকালে জয়ন্তের নিদ্রাভঙ্গ হল।

জয়ন্তের এক অভ্যাস ছিল। রোজ ভোরবেলায় উঠে অন্তত কিছুক্ষণ বাঁশী বাজাবার সময় না পেলে সারাটা দিন তার মন খুশি থাকত না।

সেদিনও সে বাঁশীতে যখন রামকেলি রাগিণী ধরেছে, তখনও সূর্য ওঠে নি।

হঠাৎ তার ঘরের দরজার উপরে বাহির থেকে দুম-দাম করে জোর-ধাক্কা পড়তে লাগল। জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার

খিল খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল মাণিকলাল।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'সূর্যোদয়ের আগে তোমার উদয়!'

মাণিক উত্তেজিত স্বরে বললে, 'জয়ন্ত—জয়ন্ত! কলকাতায় ড্রাগনের তৃতীয় আবির্ভাব হয়েছে!'

জয়ন্ত কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বাঁশীটি মুখে তুলে আবার ফুঁ দিলে।

—'আবার একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড! হত্যাকারী এবারেও পলাতক!'

জয়ন্তের বাঁশী ধরলে রামকেলি রাগিণীর অন্তরা।

—'জয়ন্ত, এবারে আর খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়, আমি হচ্ছি প্রত্যক্ষদর্শী।'

জয়ন্ত বাঁশীটি পাশের টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে 'দেখছি, আজ আর বাঁশী বাজাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমি কি বলতে চাও, ভালো করে গুছিয়ে বল। আমি টুক্‌রো টুক্‌রো খবর শুনতে ভালোবাসি না।'

মাণিক চেয়ারের উপরে বসল। জয়ন্ত আগে চেঁচিয়ে বেয়ারাকে ডেকে ছুজনের জন্যে চা, টোস্ট আর এগ্‌-পোচ্‌ আনবার হুকুম দিলে, তারপর এসে মাণিকের সামনে আসন গ্রহণ করলে।

মাণিক বলতে লাগল: 'কাল তোমার এখান থেকে যখন গেলুম তখন রাত বারোটা। কালকের রাতে কি রকম গুমোট গেছে, তোমার মনে আছে তো? গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছিল না। সেই গুমোটে বিছানায় শুয়ে ঘুম আর আসে না। শেষ-রাতে হঠাৎ বৃষ্টি এল, ঠাণ্ডা বাতাস বইল।'

'চোখের পাতায় সবে তন্দ্রার একটু আমেজ লেগেছে, এমন সময়ে বিকট এক চিৎকারে রাত্রির বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল!'

'চিৎকারটা এল আমার বাড়ির ডান পাশ থেকে। ওদিকে পাড়ার

পাশের ব্যাড়ির ছাদের উপর থেকে কি-একটা জীবন্ত মূর্তি···

চৌধুরীদের একখানা ভাড়া-বাড়ি আছে, মাস ছয়েক আগে নীরদচন্দ্র বসু নামে এক ভদ্রলোক সেই বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছিলেন।'

'নিশুত-রাতে ও-রকম বিকট চিৎকার শুনলে বুকের ভিতরটা কেমন-ধারা হয়, সেটা তুমি আন্দাজ করতে পারবে। আমার সমস্ত তন্দ্রা ছুটে গেল, কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মতন বিছানায় শুয়ে রইলুম।'

তারপরেই পাশের বাড়িতে বিষম একটা হৈ-চৈ উঠল। নানা কণ্ঠে শুনলুম—'খুন!' 'ডাকাত!' 'পুলিশ!'

'তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে পাশের বাড়িটা দেখা যায়।'

'তখন ঝর-ঝর বৃষ্টি ঝরছিল, আর দমকা হাওয়া গজ্‌রে-গজ্‌রে উঠছিল গোঁ-গোঁ করে। এবং অন্ধকারে আকাশ-চাতালে বসে কোন এক অদৃশ্য বিরাট পুরুষ যেন থেকে থেকে বিদ্যুতের চকমকি ঠুকে ঠুকে

মেঘে মেঘে আগুন জ্বাল্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল !'

'জয়ন্ত ! হঠাৎ বিপদে হতবুদ্ধি হলে মানুষের চোখ যে অনেক ভ্রম করে এ-কথা তুমিও জানো, আমিও জানি। তার উপরে আমি যে তখন কেবল হতবুদ্ধি হয়ে ছিলুম তা নয়, অন্ধকারে আমি তখন বিশেষ কিছু দেখতেও পাচ্ছিলুম না। সুতরাং সেই অবস্থায়, পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের মায়াময় ক্ষণিক আলোকে আমি যা দেখলুম, আমার মন কিছুতেই তাকে সত্য বলে স্বীকার করতে চাইছে না !'

বিদ্যুৎ দপ্‌ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তের মধ্যেই আমি দেখলুম বলে মনে হল, পাশের বাড়ির ছাদের উপর থেকে কি একটা জীবন্ত মূর্তি যেন বেগে শূন্যের দিকে উঠে বা উড়ে যাচ্ছে ! সে মূর্তি পুঞ্জীভূত অন্ধকারে গড়া, আর দেখতে যেন মানুষেরই মতো !'

'আমার এই চোখের ভ্রমের কথা উল্লেখ করতুম না, কিন্তু কলকাতায় যখন প্রথম বার ড্রাগনের আবির্ভাব ও হত্যাকাণ্ড হয়, তখনও কেউ কেউ রাত্রের আকাশপটে ছায়ামূর্তির মতো কি যেন দেখেছিল বলে প্রকাশ পেয়েছে, তাই আমারও চোখের ধাঁধার কথা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না। কিন্তু যা অসম্ভব তোমাকে তা বিশ্বাস করতে বলি না।'

'তারপর পাশের বাড়ির গোলমাল আরো বেড়ে উঠল, আমিও তাড়াতাড়ি নেমে পাশের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। প্রতিবেশী হিসাবে নীরদবাবুর সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প পরিচয় হয়েছিল, দু-দিন তাঁর বৈঠকখানাতে গিয়ে বসে দু-পাত্র চা পানও করেছি।'

'নীরদবাবুর জীবনের কথা অল্প যা জানি, তা হচ্ছে এই ঃ

নীরদবাবুর বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। তাঁর স্ত্রী দুটি ছেলে রেখে মারা গেছেন, দুই ছেলেই বিবাহিত। নীরদবাবু মিলিটারি একাউন্ট্‌স্ অফিসে চাকরি করতেন। গত মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁকে

চীনদেশে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বহুকাল রেঙ্গুনে বাস করেন। কিন্তু তারপরে আবার হঠাৎ রেঙ্গুনের বাসা তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। তাঁর চাকরি ছাড়বার ও রেঙ্গুন ত্যাগ করবার কারণ আমি জানি না। ধনবানরা প্রায়ই খেয়ালী হয়, আর নীরদবাবুর যে অর্থের অভাব ছিল না, পাড়ার সকলেই তা টের পেয়েছিল। তিনি দু-হাতে টাকা খরচ করতেন।

'সকলের সঙ্গে দোতলায় উঠে নীরদবাবুর শয়নগৃহে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলুম, খুব সংক্ষেপেই তোমাকে তা বলতে চাই।'

'ঘরের মেঝের উপরে নীরদবাবুর মৃতদেহ পড়ে ছিল। তাঁর চোখে-মুখে দারুণ ভয়ের স্থির চিহ্ন, এবং কোন বলিষ্ঠ হস্ত তাঁর গলাটি মুচ্ড়ে ভেঙে দিয়েছে। দেহের উপরে আর কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই।'

'দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে ড্রাগনের চেহারা-আঁকা একখানা কাগজ। কেতাবের ছবিতে ড্রাগনের যে রকম কাল্পনিক ছবি দেখি, তার সঙ্গে সে মূর্তিরও বিশেষ তফাৎ নেই। সুদীর্ঘ দেহ প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো, বীভৎস মুখখানা একেবারেই সৃষ্টিছাড়া, নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরুচ্ছে অনেকগুলো অগ্নিশিখা এবং পৃষ্ঠদেশে রয়েছে দু-খানা বড় বড় ডানা! ড্রাগনের সেই মূর্তির তলাতেই ইংরেজীতে রয়েছে অঙ্কের এই চিহ্ন—১, ২, ৩, ৪! কিন্তু প্রথম থেকে তৃতীয় চিহ্ন পর্যন্ত লাল কালি দিয়ে কাটা!'

'ঘরের কোণে ছিল একটা লোহার সিন্দুক। তার উপরের দাগ দেখে বোঝা যায় যে, হত্যাকারী সিন্দুকটা খোলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকজন এসে পড়াতে চেষ্টা সফল হয় নি।'

'হত্যাকারী ঘরে ঢুকেছিল জানলার লোহার গরাদে দুমড়ে ফাঁক করে। তার শক্তি যে অসুরের মতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কি করে যে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে, আর কোন্ পথ দিয়েই বা পালিয়ে গিয়েছে, কেউ তা ধরতে পারছে না। নীরদবাবুর

বাড়ির চারিদিকেই বেশ খানিকটা করে খোলা জমি,—কোন মানুষ বা কোন জীবই অন্য বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে নীরদবাবুদের ছাদের উপরে আসতে পারে না। বাড়ির ফটক ও সদর দরজা বন্ধ ছিল এবং কেন জানি না, নীরদবাবুর হুকুমে রাত্রেও সেখানে সজাগ পাহারার ব্যবস্থা ছিল। দ্বারবান্ বলে, সে ঘুমোয় নি,—কারুকে ঢুকতে বা বেরুতে দেখেনি। অথচ বাড়িতে শত্রু ঢুকেছে, নরহত্যা করেছে, আর পালিয়েও গিয়েছে!'

'জয়ন্ত, মোটামুটি সব কথাই তোমাকে আমি বললুম। কলকাতায় খুন-খারাপি আর চুরি-ডাকাতি নিত্যই হচ্ছে, সে হিসাবে এ ঘটনাটা বিশেষ কিছুই নয়। সে-সব ঘটনাতেও প্রথমে রহস্যের অভাব থাকে না। কিন্তু এবারকার ঘটনা কেবল রহস্যময়ই নয়,—যেমন আশ্চর্য, তেমনি অলৌকিক! অপরাধী কোন্ পথে বাড়ির ভিতরে ঢুকল? কোন্ পথে সে আবার অদৃশ্য হল? বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে ছায়া-মূর্তিটাকে শূন্যের দিকে উঠে যেতে দেখলুম, সেটা কি সত্যই আমার চোখের ভুল? তোমার কি মনে হয়?'

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে ঘরের ভিতরে খানিকটা পায়চারি করলে। তারপর ফিরে মাণিকের সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'খবরের কাগজের রিপোর্টে আমরা জেনেছি, মাস দেড়েকের মধ্যে কলকাতায় আরো দুটো খুন হয়েছে, আর সেই দুই জায়গাতেই ড্রাগনের ছবি-আঁকা কাগজ একখানা করে পাওয়া গিয়েছে। এ-থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই তিনটে হত্যাকাণ্ডের মূলে আছে একই মস্তিষ্ক বা একই ব্যক্তি বা একই দল।'

'প্রথম বারে মারা পড়েছেন অনাথনাথ সেন। দ্বিতীয় বারে হত হয়েছেন চন্দ্রনাথ দত্ত। আর এবারে বলি দেওয়া হয়েছে তোমাদের প্রতিবেশী নীরদচন্দ্র বসুকে। আমি যদি এই মামলাটাকে হাতে নি তা হলে প্রথমেই আমাকে দেখতে হবে, মৃত তিন ব্যক্তির মধ্যে আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক আছে কি না?'

তিনটে হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই কেবল ড্রাগনের ছবি নয়, আরো অনেক বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। যেমন প্রথমত, কারুকেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয় নি। হত্যাকারী গলা মুচড়ে তিনজনকেই মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয়ত, তিন জায়গাতেই হত্যাকারী কোন্ পথে এসেছে আর কোন পথে পালিয়েছে তা জানা যায় নি। প্রত্যেক বারেই সে জানলার লোহার গরাদে দুমড়ে ফাঁক করে ঘরে ঢুকে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তৃতীয়ত, অনাথবাবু যখন মারা পড়েন পাড়ার কোন-কোন লোক তখনও নাকি দেখেছিল যে, ছাতের উপর থেকে ছায়ামূর্তির মতন কি একটা শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল! দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের সময় ঘটনাস্থলে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নি। কিন্তু এবারে তোমার মুখেও শুনছি, তুমিও নাকি একটা উড়ন্ত মূর্তিকে দেখেছ—আর সে-মূর্তি নাকি দেখতে মানুষেরই মতন! প্রথম বারে ছায়ামূর্তির কথা আমরা উড়িয়েই দিয়েছিলুম, কিন্তু এবারে তোমার কথা তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না! অবশ্য তোমার নিজের মত হচ্ছে, তোমার চোখের ভ্রম হয়েছে। সেটাও অসম্ভব নয়। এই বিংশ-শতাব্দীতে উড়ন্ত ছায়ামূর্তির আবির্ভাব যেমন অসম্ভব তেমনি হাস্যকর। আজকের মানুষ রূপকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ।'

'কিন্তু মাণিক, ড্রাগনের ছবি-আঁকা কাগজে যে অদূর ভবিষ্যতের আর একটা হত্যাকাণ্ডের ইঙ্গিত আছে, সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ কি?'

মাণিক বিস্মিত-কণ্ঠে বললে, 'কি রকম?'

জয়ন্ত বললে, 'সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়েছি, প্রথম খুনের সময়ে যে ড্রাগন-মার্কা কাগজ পাওয়া যায় তারও তলায় ইংরেজী অঙ্কে লেখা ছিল—১, ২, ৩, ৪ সেবারে নাকি কাটা ছিল কেবল একের অঙ্ক। দ্বিতীয় খুনের সময়ও কাগজে ছিল ঐ চারটি সংখ্যা আর কাটা ছিল তার দুই সংখ্যা পর্যন্ত। এবারে অর্থাৎ তৃতীয় বারে আবার ড্রাগন-মার্কা চার সংখ্যা লেখা কাগজ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এবারে

কেটে দেওয়া হয়েছে তিনের সংখ্যা পর্যন্ত।...এ-থেকে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? যে কারণেই হোক, কোন লোক বা কোন দল প্রতিজ্ঞা করেছে, নির্দিষ্ট চার ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। কাগজের উপরে ঐ চারটি সংখ্যা সেই চিহ্নিত চার জনকেই বোঝাচ্ছে। তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করে তাই একে একে তিন সংখ্যা পর্যন্ত কেটে রেখেছে। এখনও চারের অঙ্ক কাটা হয় নি, তার মানে এখনো চতুর্থ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় নি!'

মাণিক শিউরে উঠে বললে, 'কি সর্বনাশ! তা হলে এই হতভাগ্য চতুর্থ ব্যক্তি কে?'

জয়ন্ত বললে, 'সেটা যদি আমরা তাড়াতাড়ি আবিষ্কার করতে না পারি, তা হলে তাকেও অকালে হঠাৎ ইহলোক ছাড়তে হবে।'

—'কিন্তু প্রত্যেক কাগজে ড্রাগনের এই ছবি থাকারও কোন অর্থ হয় না তো!'

—'অর্থ হয় মাণিক, খুব অর্থ হয়। সম্ভবত এই: এই ড্রাগনের ছবি হচ্ছে কোন গুপ্তদলের সাংকেতিক চিহ্ন। চারজন লোক যে-কোন কারণেই হোক্ ঐ গুপ্তদলের বিরাগভাজন হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডগুলো হচ্ছে তাদেরই মুখ বন্ধ করার চেষ্টায়।'

এই সময়ে সিঁড়ির উপরে ধুপ্ ধাপ করে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের ইন্সপেক্টর বন্ধু সুন্দরবাবু আসছেন।' বলেই টেবিলের উপর থেকে সে আবার বাঁশীটা তুলে নিলে। সে জানত সুন্দরবাবু বাঁশী বাজালেই চটে লাল হন।'

পর-মুহূর্তেই ঘরের দরজার সামনে আত্মপ্রকাশ করল সুন্দরবাবুর চক্চকে টাক ও দোদুল্যমান ভুঁড়ি।

জয়ন্ত সেদিকে দৃক্পাত না করেই আবার বাঁশী বাজানো শুরু করে দিলে।

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'হুম্! মরছি নিজের জ্বালায়, আর তুমি ধরলে বাঁশী! ছোঃ!'

মাণিক বললে, 'রাগ করছেন কেন সুন্দরবাবু, আপনার জ্বালা কমাবার জন্যেই তো জয়ন্ত বাঁশী বাজাচ্ছে।'

সুন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠাট্টা কোরো না মাণিক, তোমার ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। আর এই কি ঠাট্টার সময় ?'

জয়ন্ত বাঁশী থামিয়ে বললে, 'কেন সুন্দরবাবু, হয়েছে কি ?'

সুন্দরবাবু দুই পা ফাঁক করে নিজের ভুঁড়ির জন্যে জায়গা করে নিয়ে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হতাশভাবে বললেন, 'হবে আর কি, আমারই পোড়া-কপাল! যত রাজ্যির ওঁচা মামলা পড়বে কিনা আমারই ঘাড়ে! খুনে বেটারা নীরদ বসুকে যদি অন্য থানার এলাকায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলত, তা হলে আমাকে তো আর এই ভুতুড়ে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হতো না!'

—'নীরদচন্দ্র বসুর হত্যাকাণ্ডের মামলার ভার কি আপনার ওপরই পড়েছে ?'

—'তা নয়তো কি ? হুম্! ছাই ফেলতে আমিই হচ্ছি ভাঙা কুলো কিনা! কিন্তু বাবা, এটা কি খুনের মামলা না ভৌতিক কাণ্ড!'

জয়ন্ত বললে, 'কেন সুন্দরবাবু ?'

—'খালি ভৌতিক কাণ্ড নয় জয়ন্ত, ভয়ানক কাণ্ড! শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়, পেটের পিলে চমকে যায়! বাপ্, এ মামলায় আমি নেই, আজই ছুটির জন্যে দরখাস্ত করব! হুম্!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পোর্সিলেনের পুতুল

সুন্দরবাবুকে আশ্বস্ত করবার জন্য জয়ন্ত বললে, 'আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন, এটা মোটেই ভুতুড়ে ব্যাপার নয়। ভূতেরা অশরীরী, তারা লোহার গরাদে দুমড়ে ঘরে ঢোকে না। তারা লোহার সিন্দুক খোলার চেষ্টা করেও বিফল হয় না। ভূতেরা যত দুষ্টই হোক্, তারা চোর নয়। চোরাই মাল নিয়ে তারা কি করবে বলুন, প্রেতলোকে চোরাই মাল তো কেউ কেনে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আ-হা-হা, কে বলছে ভূতেরা চোর? প্রথম আর দ্বিতীয় খুনের সময়েও হত্যাকারী ঘরের আলমারি আর সিন্দুক খুলে ফেলেছিল, কিন্তু কিছুই চুরি করে নি। নীরদ বসুর সিন্দুকও হয়তো সে শখ করেই খুলতে গিয়েছিল, কিন্তু খুলতে পারে নি।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি কি ঠিক জানেন যে, প্রথম আর দ্বিতীয় খুনের পরে হত্যাকারী আলমারি-সিন্দুক ঘেঁটেছিল, অথচ কিছুই চুরি করে নি?'

—'পুলিশের রিপোর্ট তো তাই বলে। আলমারি-সিন্দুকে গয়না ছিল, টাকা ছিল, কিন্তু হত্যাকারীর কিছুই পছন্দ হয় নি! হয়তো প্রেতলোকে নরলোকের মুদ্রা আর গয়না অচল!'

জয়ন্ত বললে, 'তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, গয়না বা টাকা নয়, হত্যাকারী খুঁজেছিল অন্য কোন জিনিস। নইলে এ-সব খুনের কোনই অর্থ হয় না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, তাই নাকি? তা হলে শোনো জয়ন্ত! নীরদ বসুর যে লোহার সিন্দুকটা হত্যাকারী তাড়াতাড়িতে খুলতে পারে নি, আমি সেটা খুলে দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয়,

সিন্দুকের ভিতরে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না, ছিল কেবল এই বাজে পুতুলটা!' বলেই তিনি পকেট থেকে ফস করে একটা পুতুল বার করলেন।

পুতুলটা পোর্সিলেনের—লম্বায় ছয় ইঞ্চির বেশি নয়। রাম-ছাগলের উপরে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে এক বুড়ো চীনেম্যান!

মূর্তিটাকে খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে জয়ন্ত বললে, 'দেখছি এটা খুব পুরোনো পোর্সিলেনে গড়া। এর কারিকুরিও চমৎকার, একে সেকেলে চীনে-শিল্পের অতুলনীয় নমুনাও বলা যেতে পারে। শুনেছি চীনদেশের পুরোনো পোর্সিলেনের কোন কোন নমুনা সাপের মাথার মণির মতই দুর্লভ আর অমূল্য। সেইজন্যেই কি নীরদবাবু এই মূর্তিটাকে সযত্নে লোহার সিন্দুকের ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন? আর হত্যাকারী এসেছিল কি এরই লোভে?'

মাণিক বলল, 'হতে পারে। কিন্তু নীরদবাবুর হত্যাকারী এর আগেই আরো দুজন লোককে খুন করেছে, তাঁদের ঘর খানাতল্লাস করেছে, কিন্তু টাকাকড়ি চুরি করে নি। হত্যাকারী সেখানে কি খুঁজতে গিয়েছিল?'

জয়ন্ত বললে, 'তোমার প্রশ্নটা খুব ভালো। কিন্তু এর উত্তর আপাতত আমার কাছে নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আর একটা মজার কথা বলি শোনো।' নীরদবাবুর খুনের তদন্ত করছি, হঠাৎ সেখানে দুটি ছোক্‌রা এসে হাজির। সব ব্যাপারেই তাদের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে ভারি সন্দেহ হল আমার। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'কে তোমরা? কী চাও? তারা হেসে বললে,—'আমরা চাই অ্যাড্‌ভেঞ্চার!' আমি রুখে বললুম—'পুলিশের রুলের গুঁতো তোমাদের কেমন লাগে?' তারা আরো জোরে হেসে উঠে বললে—'মন্দ কি? রুলের গুঁতো খেয়ে আমরাও যদি করি গুঁতোগুঁতি আর চড়-চাপড় ঘুষি-বৃষ্টি, সেও তো একটা ছোটখাটো অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলে গণ্য হতে পারে!' তারপরেই

সিন্দুক থেকে বেরুলো এই পুতুলটা। অমনি তাদের একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—'লাউ-ৎজু! লাউ-ৎজু!' আমি রেগে তিনটে হয়ে বললুম, 'পাগলামির জায়গা পাও নি আর? এখুনি বেরোও এখান থেকে!' আমার অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখলে বড় বড় চোর-ডাকাতও ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে, কিন্তু তারা একটুও ভয় পেলে না। উলটে হেসে গড়িয়ে পড়ে ঘর থেকে হাত-ধরাধরি করে হেলে-দুলে বেরিয়ে গেল!'

জয়ন্ত বললে, 'কে তারা?'

—'কে জানে! তাদের নাম তো শুনলুম বিমল আর কুমার! বাজে নিষ্কর্মা লোক আর কি!'

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, 'বিমল আর কুমার? যাঁদের অদ্ভুত সব অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে, এঁরা কি সেই বিমলবাবু আর কুমারবাবু?'

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, 'কে জানে। আমি জানতে চাই না। বুঝলে হে, সেই মাণিকজোড়কে দেখে আমার মনে পড়ল তোমাদেরই কথা! হুম্, তোমাদেরই মতো বয়সে তারা ছোকরা, তোমাদেরই মতো তাদের কথার কিছু মানে হয় না, আর তোমাদেরই মতন তারা বদ্ধ পাগল। লাউ-ৎজু। লাউ-ৎজু কি রে বাবা .... আমি এখন চললুম!'

সুন্দরবাবু চলে গেলে পর জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'বিমলবাবু আর কুমারবাবুর নাম আমিও শুনেছি। তাঁদের বুদ্ধি আর শক্তি দুই-ই নাকি আশ্চর্য! যেখানে অসাধারণ ঘটনা ঘটে, সেইখানেই তাঁদের আবির্ভাব হয়। নীরদবাবুর হত্যা-কাণ্ডে তাঁদের টনক যখন নড়েছে তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা এ ব্যাপারটাকেও অসাধারণ বলে মনে করেন, আর আমাদের চেয়ে তাঁরা বেশি-কিছু জানতে পেরেছেন।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু লাউ-ৎজু কোন্ দেশী কথা? তার অর্থই বা কি?'

..... খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মাণিক হঠাৎ......

জয়ন্ত বললে, 'আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না.........আচ্ছা মাণিক, এক কাজ কর দেখি! এন্‌সাইক্লোপিডিয়াখানা বার করে আনো। দেখ, তার মধ্যে 'লাউ-ৎজু-র খোঁজ মেলে কি না!'

তখনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া এল। তার পাতা উলটে মাণিক সানন্দে বলে উঠল, 'পেয়েছি জয়ন্ত, পেয়েছি! এই যে! লাউ-ৎজু বা লাও-জি, চীনদেশের দার্শনিক! 'তাও'-ধর্ম্মমতের প্রবর্তক। জন্মকাল— খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬০৪!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু যে পোর্সিলেনের পুতুলটা দেখালেন, তবে কি সেটা ঐ লাউ-ৎজুরই প্রতিমূর্তি?'

মাণিক বললে, 'কিন্তু আড়াই হাজার বছরেরও আগে যিনি চীন-

দেশে বিদ্যমান ছিলেন, সেই দার্শনিক লাউ-ৎজুর সঙ্গে বিশ শতাব্দীর বাঙালী কেরানী নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। মাণিক বুঝলে, জয়ন্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে।

পরদিন চা-পানের সঙ্গে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মাণিক হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'এ আবার কি ব্যাপার।'

জয়ন্ত চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললে, 'আবার নতুন খুন নাকি?'

—'না। কাগজে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।'

—'পড়ে শোনাও।'

—'শোনো।—অনাথনাথ সেন, চন্দ্রনাথ দত্ত ও নীরদচন্দ্র বসুকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। ইঁহারা তিনজনেই রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন আর এক ভদ্রলোক, তিনি এখনও জীবিত আছেন। লাউ-ৎজুর ভক্তরা তাঁহাকে খুঁজিতেছে, শীঘ্রই তাঁহাকেও হত্যা করিবে। যদি তিনি আত্মরক্ষা করিতে চান তাহা হইলে অবিলম্বে ৪০ নং শ্যামাকান্ত বসু স্ট্রীটে বিমলবাবু ও কুমারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। বিলম্ব করিলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।'

জয়ন্ত অভিভূত স্বরে বললে, 'মাণিক, আমরা হচ্ছি আহাম্মক—পয়লা-নম্বরের আহাম্মক। ঐ বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল আমাদেরই, আর আজকে আমি বিজ্ঞাপন দিতুমও! কারণ চতুর্থ যে-ব্যক্তির খুন হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁকে তাড়াতাড়ি সাবধান আর আবিষ্কার করবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। কিন্তু বিমলবাবু আর কুমারবাবু দেখছি আমাদের চেয়েও চট্‌পটে! কেবল তাই নয়, তাঁরা আমাদেরও আগে আসল রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছেন!

মাণিক, আমরা হেরে গেছি। এ মামলা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, নইলে মান বাঁচানো দায় হয়ে উঠবে।'

মাণিক বললে, 'জয়ন্ত, সব কাজেই হার-জিত আছে, তার জন্যে নিজেকে এতটা ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভাই, বিজ্ঞাপনে লাউ-ৎজুর ভক্তদের হত্যাকারী বলা হয়েছে। তারা আবার কারা?'

—'নিশ্চয়ই তারা চীনেম্যান।'

—'কিন্তু লাউ-ৎজুর চীনে-ভক্তদের সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্ক কি?'

—'মাণিক, তুমি আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ গাধা! তোমার মুখেই তো আমি শুনেছি, মৃত নীরদবাবু গেল মহাযুদ্ধের সময়ে মিলিটারি অ্যাকাউণ্ট্ অফিসের কেরানীরূপে চীনদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কি করেছিলেন তা কে জানে? আমার বিশ্বাস, আরো যে দুজন লোক খুন হয়েছেন তাঁরাও নীরদবাবুর সঙ্গে চীনদেশে গিয়েছিলেন।'

মাণিক বললে, 'এতক্ষণে বুঝলুম, প্রত্যেক হত্যার পর ড্রাগনের ছবি আঁকা কাগজ কেন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টানদের যেমন ক্রুশ, মুসলমানদের যেমন অর্ধচন্দ্র, হিন্দুদের যেমন পদ্ম, তেমনি চীনদেশেরও নিদর্শন হচ্ছে ড্রাগন!'

জয়ন্ত বললে, 'ড্রাগনের অন্য অর্থ থাকাও অসম্ভব নয়।'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ি জাগিয়ে, সিঁড়ি কাঁপিয়ে হস্তদন্তের মতো সুন্দরবাবু হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েই বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে!'

'—কি হয়েছে সুন্দরবাবু, কি হয়েছে?'

সুন্দরবাবু ধপাস্ করে একখানা চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আগে এক কাপ চা! হুম্, আমার গলা মরুভূমির মতো শুকিয়ে গেছে, এক কাপে ভিজবে না হে,—শীগগির দু কাপ চা চাই।'

জয়ন্ত চেঁচিয়ে চা আনবার হুকুম দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সেই পোর্সিলেনের পুতুলটা চুরি গেছে!'

জয়ন্ত ও মাণিক এক সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'থানা থেকে চুরি!'

—'হ্যাঁ জয়ন্ত, হ্যাঁ মাণিক, থানা থেকে চুরি! হুম্, শুধু কি চুরি? ভুতুড়ে চুরি!'

—'ভালো করে সব কথা বলুন সুন্দরবাবু!'

—'সেই পুতুলটা আমি আমার শোবার ঘরের টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিলুম, রাত্রে ভালো করে পরীক্ষা করব বলে। তোমরা জানো, থানার উপরে তেতলায় আমি থাকি। একতলায় অফিস-ঘরে বসে রাত দশটা পর্যন্ত আমি একটা বড় চুরির মামলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। তারপর উপরে উঠে খেয়ে-দেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকি রাত এগারোটার সময়ে। তখন বেশ জোরে একপশলা বৃষ্টি এসেছে। ঘরে ঢুকেই দেখি, টেবিলের উপরে সেই পোর্সিলেনের পুতুলটা আর নেই! তারপরেই খট্-খট্ করে একটা লাঠির শব্দ শুনে চম্‌কে ফিরে দেখি, দরজার বাইরে বারান্দার উপর থেকে জমাট ধোঁয়ার মতো কি-একটা ভয়ানক ব্যাপার হুম্ করে আকাশের দিকে উঠে গেল! তাই না দেখেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমি ঘর থেকে আবার পালিয়ে এলুম।'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'ঐ উড়ন্ত ছায়া আর ধোঁয়ার নিকুচি করেছে! আমি জানতে চাই পুতুলটার কি হল?'

—'কী আবার হবে, আর পাওয়া গেল না। থানার চারিদিকে এয়া জোয়ান জোয়ান পাহারাওয়ালা, অফিসে আমি, স্বয়ং থানার কর্তা, স্ব-শরীরে বর্তমান, দোতলায় থাকে লালমুখো সার্জেন্ট্ আর সব-ইন্‌স্পেক্টররা, তেতলায় আমার পরিবারবর্গ,—তাদের এড়িয়ে চোর কিছুতেই আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারে না। অথচ সে এসেছে আর চুরি করে পালিয়েছে। এটা ভোজবাজি না ভৌতিক কাণ্ড!

—'চোর কি কোন চিহ্নই রেখে যায় নি ?'

—'হ্যাঁ, দুটো চিহ্ন ! একটা হচ্ছে ড্রাগনের ছবি-আঁকা কাগজ, কিন্তু তাতে কোন সংখ্যা লেখা নেই। আর একটা চিহ্ন রেখে গেছে বটে, কিন্তু এখন আর তা বর্তমান নেই।'

—'তার মানে ?'

—'বলেছি, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরের মেঝেতে কতকগুলো জল-মাখা পায়ের ছাপ দেখেছিলুম, কিন্তু দেখতে দেখতেই সেগুলো মিলিয়ে গেল !'

—'পায়ের দাগের মাপ নিয়েছিলেন ?'

—'না ভায়া, গোলমালে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করতে ভুলি নি। ঘরের ভিতরে কেবল একখানা পায়ের ছাপই ছিল, সব ছাপ ডান পায়ের ! হুম্, চোর-বেটা বোধহয় এক পায়ে ভর দিয়ে ঘরময় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছিল !'

জয়ন্ত রূপোর নস্যদানী থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে একটু খুশি হয়ে বললে, 'এতক্ষণ পরে এই চোর বা হত্যাকারীর একটা-কিছু হদিস পাওয়া গেল। সুন্দরবাবু, আপনার ঘরে যে চুরি করতে ঢুকেছিল, তার একখানা পা নেই !'

—'হেঃ, কি প্রমাণে তুমি এ-কথা বলছ ?'

—'আপনিই না বললেন যে, ঘরের মধ্যে ঢুকেই লাঠির খট্‌খট্ শব্দ শুনেছিলেন ?'

—'হ্যাঁ, তা শুনেছি বটে।'

—'চোরের বাঁ-পায়ে কাঠের খোঁটা বাঁধা ছিল—খোঁড়াদের পায়ে যেমন থাকে।'

—'অসম্ভব ! তুমি কি বলতে চাও, চোর যদি এই কাঠের খোঁটা বাজিয়ে খট্‌খটিয়ে তেতলায় উঠত, তা হলে থানার কেউ তা শুনতে পেত না ? থানাসুদ্ধ সবাই আমরা কি চোখ বুজে আর কানে তুলো

গুঁজে বসেছিলাম—কিছু দেখতেও পাই নি, শুনতেও পাই নি? হুম্, কী যে বল তুমি!'

—'তা হলে আপনার মত কি?'

—'আমার ঘরে ঢুকেছিল এক বেটা এক-ঠেঙো ভূত! আমাকে দেখেই ভয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল আর কি! পুলিশকে কে না ভয় করে?'

জয়ন্ত গেঞ্জির উপরে জামা পরতে পরতে বললে, 'চল মাণিক, আমরা এখন বিমলবাবু আর কুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, 'সেই বদ্ধ পাগল-দুটোর সঙ্গে? কেন হে?'

—'এই রহস্যের অনেক খবর তাঁরা জানেন। আপনিও যদি আসতে চান, আসুন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ল্যাসো

তখন বিমল ও কুমারের চা-পান শেষ হয়ে গেছে। বাঙলা দেশের প্রায় সব ছেলে-মেয়েই বিমল ও কুমারকে চেনে, কাজেই তাদের পরিচয় আর নতুন করে দিলুম না।

রামহরি টেবিলের উপর থেকে প্রাতরাশের বাসনগুলো সরাচ্ছিল এবং তাদের আদরের কুকুর বাঘা টেবিলের তলায় বসে দুধের বাটি চেটেপুটে সাফ করে ফেলছিল। বাঘা চায়ের ভক্ত নয় বলে রোজ সকালে তার বরাদ্দ ছিল কুকুর-বিস্কুট ও এক বাটি করে গরম দুধ।

কুমার খবরের কাগজখানা নিয়ে পাতা উলটে বললে, 'আমাদের বিজ্ঞাপনটা বেশ ভালো জায়গায় বেরিয়েছে, পাতা ওলটালেই চোখে পড়ে।'

বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিমল বললে, 'যার জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া, হয়তো এতক্ষণে তার চোখে পড়েছেও। হয়তো এতক্ষণে সে ভয়ে পাগলের মতো আমাদের ঠিকানায় ছুটে আসছে!'

কুমার বললে, 'তা হলে তোমার বিশ্বাস, এ লোকটি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আসবে?'

—'নিশ্চয়ই আসবে। ঐ তিনটে হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য সে জানে। এইবার যে তার পালা, এটাও সে বুঝেছে। সে এখন কি করবে বুঝতে না পেরে ভয়ে মরো-মরো হয়ে আছে। আমাদের বিজ্ঞাপন পড়লে সে এখানে না এসে কিছুতেই থাকতে পারবে না।'

রামহরি মন দিয়ে বিমলের কথাগুলো শুনছিল। সে বললে, 'খোকাবাবু, কোথায় কারা খুন হয়েছে তা নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বল দেখি? কাশীধামে কাক মরেছে, কামরূপেতে

হাহাকার! আবার কোন নতুন হুলুস্থূল কাণ্ড নিয়ে হৈ-চৈ করবার ইচ্ছে আছে বুঝি!'

বিমল হেসে বললে, 'তুমি তো জানোই রামহরি, দুদিন সুখে থাকলেই আমাদের ভূতে কিলোয়! মাতাল যেমন মদ চায়, আমরাও চাই তেমনি হানাহানি আর মাতামাতি!'

রামহরি বিরক্ত মুখে অস্ফুট স্বরে বক্-বক্ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমল, এ-ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলত। পুলিশের সুন্দরবাবুর হাতে যখন নীরদ বসুর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার পড়েছে, তখন তাঁর বন্ধু বিখ্যাত ডিটেক্টিভ জয়ন্তের সাহায্য তিনি নেবেনই। সকলেই জানে, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে সুন্দরবাবু কোন কাজই করেন না। আমার বিশ্বাস, জয়ন্তবাবুর পরামর্শে পুলিশ এ মামলাটার কিনারা করতে পারবে।'

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবুকে কখনো চোখে দেখি নি, যদিও গোয়েন্দাগিরিতে তাঁর বাহাদুরির অনেক কথাই জানি। ড্রাগনমার্কা কাগজে আমরা যে সূত্র পেয়েছি, সেই সূত্র ধরে জয়ন্তবাবুও হয়তো অনেক কিছুই অনুমান করতে পেরেছেন। নীরদবাবুর আত্মীয়দের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আমাদের মতো তাঁরাও হয়তো আরো কিছু খবর পেয়েছেন। কিন্তু কুমার, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাও সবজান্তা নন। জয়ন্তবাবু গোয়েন্দাগিরিতে আমাদের ওপর টেক্কা মারতে পারেন, কিন্তু তাও-ধর্মের গুপ্তকথা আর লাউ-ৎজুর নাম হয়তো তিনি জানেন না। নতুন অ্যাড্ভেঞ্চারের খোঁজে ও-সব বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ আলোচনা করেছি বলেই লাউ-ৎজুর মূর্তি দেখেই চিনেছি আর বুঝেছি যে, নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অদ্ভুত কোন ব্যাপারের সম্পর্ক আছে। গোয়েন্দারা খুনীর খোঁজ করুন, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না, আমরা ছুটতে চাই কেবল ঐ অদ্ভুত রহস্যের পিছনে।

···কুমার, ঐ শোনো, কে সদর-দরজায় কড়া নাড়ছে ! যার অপেক্ষায় বসে আছি, এইবারে বোধহয় তার দেখা পাব !'

রামহরি ঘরে ঢুকে বললে, 'তিনটি বাবু তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

—'তিনটি বাবু ?'

—'হ্যাঁ। নাম বললে, জয়ন্তবাবু, মাণিকবাবু ও সুন্দরবাবু।'

—'তাঁদের নিয়ে এস। ···কুমার, এঁরা আমাদের কাছে কেন ?'

—'হয়তো আমাদের বিজ্ঞাপন ওঁদেরও চোখে পড়েছে। ওঁদের সন্দেহ হয়েছে, আমরা কিছু খবর দিতে পারব।'

সর্বপ্রথমে এসে দাঁড়াল জয়ন্তের প্রায় সাত ফুট লম্বা বিশাল দেহ। তারপর দেখা গেল মাণিক এবং বিপুল ভুঁড়ি ও টাকের অধিকারী সুন্দরবাবুকে।

বিমল হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে, 'আসতে আজ্ঞা হোক। নাম শুনেই বুঝেছি মশাইরা কে ! বসতে আজ্ঞা হোক।'

জয়ন্ত প্রতি-নমস্কার করে বললে, 'আপনাদের পরিচয়ও আমাদের অজানা নেই, আপনাদের সঙ্গে আলাপ থাকাও সৌভাগ্য।'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু সুন্দরবাবু হয়তো ও-কথা স্বীকার করবেন না। কাল সকালেই হতভাগ্য নীরদবাবুর বাড়ি থেকে উনি আমাদের পাগল বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

সুন্দরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, 'ও কথা যেতে দিন, আমি ভুল করেছি। আপনাদের চিনতুম না, আজ পথে আসতে আসতে মাণিকের মুখে আপনাদের ইতিহাস কিছু-কিছু শুনেছি। হুম্ ! আপনাদের উপর আমার দস্তুরমত শ্রদ্ধা হয়েছে। বাপ্‌রে আপনারা নাকি সশরীরে মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলেন ?'

জয়ন্ত বললে, 'সে-সব কথা পরে হবে সুন্দরবাবু ! এখন যেজন্যে এখানে এসেছি সেই কথাই হোক !

ইতিমধ্যে বাঘা টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে সুন্দরবাবুর কাছে

গিয়ে মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে একটা ডন্ দিতে উদ্যত হল এবং সুন্দরবাবু তাকে দেখেই আঁৎকে উঠে একলাফে জয়ন্তের পিছনে গিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে বাবা! বাঘের মতো মস্ত নেড়ী কুকুর!'

বিমল বললে, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু! আমাদের বাঘা সাধু মানুষকে কিছু বলে না, বড়-জোর ও আপনার গা শুঁকে পরীক্ষা করবে!'

সুন্দরবাবু আরো পিছনে হটে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'না, না! ওকে আমি কিছুতেই আমার গা শুঁকতে দেব না। হুম্, চতুষ্পদ জীবদের আমি ভয় করি!'

মাণিক বললে, 'তা হলে আপনি ভেড়াকেও ভয় করেন সুন্দর-বাবু?'

—'দেখ মাণিক, সব সময়ে তোমার ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। হ্যাঁ, ভেড়াও আমার চোখের বালি। জানো, একটা ভেড়া একবার আমাকে ঢুঁ মেরেছিল।...বিমলবাবু, আমাকে যদি ঘর থেকে তাড়াতে না চান, তা হলে ঐ নেড়ী-কুকুরটাকে এখান থেকে পত্রপাঠ বিদায় করুন। পাজী কুকুর! ছুঁচো কুকুর! দেখুন, এত লোক থাকতে ওর দৃষ্টি আমার দিকেই! হুম্, ওর মতলব ভালো নয়!'

কুমার বললে, 'বাঘা, তুই বাইরে যা! সুন্দরবাবু আজ তোর সঙ্গে ভাব করবেন না।'

বাঘা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বাইরে চলে গেল এবং ঠিক সেই সঙ্গেই রামহরি আবার এসে খবর দিলে, 'একটি বাবু দেখা করতে চান।'

বিমল ব্যস্ত ভাবে বললে, তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও।—কুমার, যাঁর অপেক্ষায় আছি, ইনিই বুঝি তিনি!'

জয়ন্ত ও মাণিকও আগন্তুকের স্বরূপ আন্দাজ করতে পারলে, তারাও উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

দরজা দিয়ে যিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, তিনি হচ্ছেন আধা-প্রাচীন মাঝারি আকারের লোক। রঙ শ্যামল, মাথার চুল

কাঁচায়-পাকায় মিশানো, বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে কেমন একটা ভয় বিহ্বল ভাব।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই সকলের মুখের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি বিমলবাবু আর কুমারবাবুকে খুঁজছি!'

বিমল এগিয়ে বললে, 'আমার নাম বিমল, আর এঁর নাম কুমার। কিন্তু মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি?'

—'শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।'

—'বোধহয় আমাদের বিজ্ঞাপন দেখেই আপনি এসেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। মশাই, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। আপনার সঙ্গে আড়ালে কিছু কথাবার্তা কইতে চাই।'

—'নরেনবাবু, আড়ালে যাবার দরকার নেই। আমার বিশ্বাস, এঁরাও আপনাকে সাহায্য করবেন। ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ জয়ন্তবাবু, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত মাণিকবাবু, এঁরই সহকারী। আর ওঁর নাম সুন্দরবাবু—পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার, নীরদবাবুর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছেন।'

নরেনবাবু শ্রান্ত ভাবে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে করুণ-স্বরে বললেন, 'অনাথকে মেরেছে, চন্দ্রকে মেরেছে, নীরদকে মেরেছে, এইবারে আমার পালা। তারা যখন তিনজনের নাগাল ধরতে পেরেছে, তখন আমারও আর রক্ষা নেই! হা ভগবান, কেন মরতে সান্‌-কুয়ান্‌ মন্দিরে গিয়েছিলুম!'

—'সান্‌-কুয়ান্‌ মন্দির! নিশ্চয়ই চীনদেশের মন্দির?'

—'হ্যাঁ বিমলবাবু! আপনি কি সেখানে গিয়েছিলেন?'

—'না। তবে আমি জানি যে, হিন্দুদের ত্রিমূর্তি— অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর চীনদেশে গিয়ে সান্‌-কুয়ান্‌ নাম পেয়েছেন, আর তাও-ধর্মাবলম্বীরা চীনে-পোশাক পরিয়ে সেই ত্রিমূর্তির পূজা করে।'

—'আপনি আর কি জানেন?'

—'খুব সম্ভব, তাওদের আদি-গুরু লাউ-ৎজুর একটি প্রতিমূর্তি

আপনার কাছে আছে, আর সেইজন্যেই আপনার এত ভয় !'

—'ঠিক বলেছেন ! সেই মূর্তিই হয়েছে এখন আমার অভিশাপের মতো ! তাকেও আমি সঙ্গে করে এনেছি, এই দেখুন।' বলেই নরেনবাবু ভিতরকার জামার পকেট থেকে একটি সবুজ রঙের পুতুল বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি যে মূর্তিটাকে পেয়েছিলুম এটাও যে ঠিক তারই মতন দেখতে ! সেই রামছাগল, সেই বুড়ো চীনেম্যান ! কিন্তু এ মূর্তিটা তো পোর্সিলেনের নয় !'

নরেনবাবু বললেন, 'না, এটি হচ্ছে জেড-পাথরে গড়া। শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, এই বিচিত্র মূর্তির মাথা থেকে বুক পর্যন্ত গরম, কিন্তু বুকের তলা থেকে পা পর্যন্ত ঠাণ্ডা !'

সকলে একে একে ব্যগ্রভাবে পরীক্ষা করে বুঝলে, নরেনবাবুর কথা মিথ্যা নয় !

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, 'এই ভুতুড়ে মূর্তিটা রাত্রে হয়তো চলে বেড়ায়, বাপ্‌রে !'

বিমল বললে, 'জার্মান সাহেব রিচার্ড উইল্‌হেল্‌মের লেখা দি সাউল অফ চায়না (The Soul of China) নামে বইয়ে পড়েছি, চীনেদের পবিত্র পাহাড় থাইসানের তলায় থাইয়ান্‌ফু মন্দিরেও একখানি আশ্চর্য জেড-পাথর আছে, তারও একদিক গরম আর একদিক ঠাণ্ডা ! এই মূর্তিটিও হয়তো সেই রকম কোন পাথরে গড়া !'

নরেনবাবু বললেন, 'অত-শত আমি জানি না, আমি খালি জানি যে, চীনেরা বলে লাউ-ৎজুর এই মূর্তির ভিতরে দৈবশক্তি আছে। একে পাবার জন্যে অনেক চীনে প্রাণ দিয়েছে, একে পেয়েও আমার তিন বন্ধু প্রাণ দিয়েছেন, আর আমার প্রাণ যায়-যায় হয়েছে !'

বিমল বললে, 'ভয় নেই নরেনবাবু, আমরা আপনাকে রক্ষা করব।'

নরেনবাবু বিষণ্ণমুখে একটু হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,

'বাঁচবার আশা আর রাখি না। জানেন বিমলবাবু, আজ কদিন ধরে দেখছি, আমার বাড়ির আনাচে-কানাচে এক-একটা চীনেম্যানের মূর্তি হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ অদৃশ্য হয়! আজই যখন এখানে আসছিলুম, দুটো চীনেম্যান দূর থেকে আমায় অনুসরণ করছিল! তারপর এই রাস্তায় এসে আর তাদের দেখতে পেলুম না!'

বিমল কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছা দড়ি রাস্তার জানালার ভিতর দিয়ে একটা লিক্‌লিকে লম্বা সাপের মতো সপাং করে টেবিলের উপরে এসে পড়ল এবং চোখের পলক পড়বার আগেই লাউ-ৎজুর মূর্তিটাকে বেঁধে ফেলে তীরবেগে আবার জানলার দিকে টেনে নিয়ে গেল—কিন্তু পর-মুহূর্তেই সদাসতর্ক জয়ন্ত একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মূর্তিসুদ্ধ দড়িগাছা সজোরে চেপে ধরলে।

সদাসতর্ক জয়ন্ত একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মূর্তিসুদ্ধ দড়িগাছা সজোরে চেপে ধরলে।

বিমল বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে দেখলে, দুজন

চীনেম্যান প্রাণপণে দৌড়ে একখানা ট্যাক্সিগাড়ির উপরে গিয়ে উঠল এবং গাড়িখানা ঝড়ের মতো ছুটে মোড় ফিরে হয়ে গেল অদৃশ্য।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকে সে ক্ষুব্ধস্বরে বললে, 'ধরতে পারলুম না, ট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়ে গেল! সুন্দরবাবু, ট্যাক্সির নম্বর হচ্ছে ৪৪৪৪।'

সুন্দরবাবু নোট-বুক বার করে নম্বরটা টুকে নিয়ে বললেন, 'কি গাড়ি? কী রঙ?'

—'সাদা রঙের ফোর্ড। সিডান বডি। শিখ ড্রাইভার।'

—'আচ্ছা, আজই খোঁজ নেব, বেটারা পালাবে কোথায়?... কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, দড়ি ছুঁড়ে পুতুলটা টেনে নিলে কি করে বল দেখি?'

কুমার বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি অদ্ভুত চট্পটে! আপনি না থাকলে মূর্তিটা তো খোয়াই গিয়েছিল!'

জয়ন্ত একমনে দড়িগাছা পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'এ তো দেখছি 'ল্যাসো'! আমি জানতুম 'ল্যাসো' ব্যবহার করতে পারে খালি আমেরিকার 'কাউ-বয়'রাই।'

বিমল বললে, 'আমেরিকায় চীনেদের মস্ত উপনিবেশ আছে। হয়তো সেইখান থেকেই কোন কোন চীনে ল্যাসোর ব্যবহার শিখেছে।'

মাণিক বললে, 'আমি শুনেছি সাইবেরিয়ারও স্থানে স্থানে এক রকম ছোট ল্যাসোর চলন আছে। সাইবেরিয়া চীনদেশ থেকে বেশি দূরে নয়।'

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'হুম্, ল্যাসো আবার কি ব্যাপার?'

কুমার বললে, 'বাঙলায় ল্যাসোকে বলা চলে পাশবন্ধ। দড়ির মুখে থাকে একটা ফাঁসকল, সেই দড়ি ছুঁড়ে কাউ-বয়রা বড় বড় বন্য জন্তু ধরে। সময়ে সময়ে ল্যাসো একশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।'

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, 'এতও আছে বাবা!'

নরেনবাবু ভীত গম্ভীর মুখে চুপ করে বসেছিলেন। এতক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'আমার শত্রুদের বিক্রম দেখলেন

তো ? এখন আমার কি উপায় হবে ?'

বিমল খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে নীরব হয়ে রইল। তারপর বললে, 'নরেনবাবু, কোন বিচিত্র শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যুঝতে হবে, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতে পারছি। নিজেদের শক্তির বড়াই করি না, তবে লাউ-ৎজুর এই মূর্তিটা যদি আমার কাছে রাখতে রাজী হন, তা হলে আপনার শত্রুদের শক্তি হয়তো পরীক্ষা করবার সুযোগ পাব।'

নরেনবাবু বললেন, 'ও আপদ এখন বিদায় করতে পারলেই বাঁচি, ওটা আপনার কাছেই থাকুক।'

বিমল উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'তা হলে লাউ-ৎজুর ভক্তরা খুব সম্ভব আজ রাত্রেই আমাকে আক্রমণ করবে। হয়তো সেই সময়ে আমরা কোন অলৌকিক দৃশ্যও দেখতে পাব!'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অলৌকিক দৃশ্য কি মশাই ? ভূত-প্রেত নাকি ?'

—'সে যে কি রহস্য, যথা সময়েই তা প্রকাশ পাবে। কিন্তু নরেনবাবুর কাহিনী এখনো আমাদের শোনা হয় নি। আগে সেটা শোনা দরকার।

নরেনবাবু, লাউ-ৎজুর এই মূর্তিটা কি করে আপনার কাছে এল ?'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেনবাবুর কাহিনী

নরেনবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, 'বিমলবাবু, আমার কথা শুনতে চাইছেন বটে, কিন্তু আমার কথা হয়তো আপনারা কেউ বিশ্বাসই করবেন না। অবশ্য এটাও স্বীকার করছি যে, আমি যা বলব, তার সবটা বিশ্বাস করাও হয়তো অসম্ভব। আমার এই কাহিনীর খানিকটা আশ্চর্য হলেও, অলৌকিক। স্বচক্ষে যা দেখেছি আর স্বকর্ণে যা শুনেছি তার সমস্ত রহস্য আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি নি। হাতে যদি কতকগুলো নিরেট প্রমাণ না থাকত, তা হলে আমরাও সমস্ত ব্যাপারটা আজগুবি দুঃস্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতুম।...

'কিন্তু থাক্, আপাতত গৌরচন্দ্রিকার সময় নেই। কেবল এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, আমি খুব সংক্ষেপেই সব কথা বলব।'

'অনাথবাবু, চন্দ্রবাবু আর নীরদবাবুর সঙ্গে আমি যে সামরিক বিভাগে চাকরি নিয়ে চীনদেশে গিয়েছিলুম, এ কথা আপনারা জানেন। ওঁরা তিনজন ছিলেন কেরানী, আর আমি ছিলুম ডাক্তার।'

'হংকং শহরের একটি বাসার দোতলায় আমরা চারজনে বাস করতুম। নীচের তলায় থাকত একজন চীনেম্যান, তার নাম ইয়ন্ মঙ। বয়স তার পঁচাত্তরের কম নয়, দেহখানি বেঁকে পড়েছে কুমড়োর ফালির মতো।'

'মঙের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ জানাশোনার সুযোগ হয়েছিল। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, প্রায়ই সে অসুখে পড়ত, আর অসুখ হলেই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসত। মঙ অল্পস্বল্প ইংরেজী বলতে পারত।'

'একদিন রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না, বিছানায় শুয়ে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করছিলুম। হঠাৎ নিশুত রাত কাঁপিয়ে বিকট

এক চিৎকারে কে আমার সর্বাঙ্গ অভিভূত করে দিলে! চিৎকারটা এল আমাদের নীচের তলা থেকে।'

'ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আমি তিন বন্ধুরই ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম। তারপর আলো জ্বেলে, বন্দুক নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শুনলুম, কারা যেন দ্রুতপদে বাড়ির বাইরে ছুটে পালিয়ে গেল! তাদের ভয় দেখাবার জন্যে একবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলুম।'

'নীচের তলায় নেমে দেখলুম, মঙের শয়ন-গৃহের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর থেকে একটা অবরুদ্ধ আর্তনাদও শোনা গেল।'

'তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে আমরা সভয়ে দেখলুম, ঘরের মেঝেয় পড়ে মঙ বিষম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে, আর তার দেহের চারিদিকে রক্তের ধারা!'

'অল্পক্ষণ পরীক্ষা করেই বুঝলুম, পৃথিবীতে মঙ আর কালকের সূর্যোদয় দেখতে পাবে না।'

'মঙ নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিল। অত যাতনার মধ্যেও একটুখানি ম্লান হাসি হেসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'বাবু, আমার দিন ফুরিয়েছে। আপনার ওষুধও আর কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু সে জন্যে ভাবি না, জন্মালেই মরতে হয়!'

আমি বললুম, 'মিঃ মঙ, কারা আপনার এ দশা করলে?'

—'লাউ-ৎজুর ভক্তরা।'

—'তারা আবার কারা?'

—'অত কথা বলবার সময় নেই। অসুখ-বিসুখে আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। মরবার আগে আমিও আপনার একটি উপকার করে যেতে চাই। বাবু, আপনি 'সিয়েন' হবেন?'

'ভাবলুম, মরবার সময়ে মঙের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কারণ চীনে-ভাষায় 'সিয়েন' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'অমর'!'

'আমার মুখ দেখে মঙও বুঝতে পারলে যে, আমি তার কথায় অবিশ্বাস করছি। সে আবার একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'বাবু,

'আমি পাগল হইনি। কিন্তু এখন আপনাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময়ও আমার নেই, এখনি আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে আগে এক গেলাস জল দিন, তারপর আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন।'

'আমি তাড়াতাড়ি জল এনে দিলুম। জলপান করে মঙ বলতে লাগল : 'আমার বিছানার উপরে, মাথার বালিশের সেলাই কাটলেই ভিতরে দুখানা কাগজ পাবেন। সে কাগজ দুখানি হচ্ছে ম্যাপ। একখানি ম্যাপে য়ুঅন্‌কাংয়ের গুহা-মন্দিরের কাছে সান্‌-কুয়ানের গুপ্তমন্দিরে যাবার অজানা পথ আঁকা আছে দেখবেন। ঐ গুপ্ত-মন্দিরে অনেক ধনরত্ন লুকানো আছে। আর একখানা ম্যাপ হচ্ছে অমরদের দ্বীপে যাবার ম্যাপ। সে দ্বীপকে লোকে বলে, পৃথিবীর স্বর্গ। যারা তাও-ধর্ম গ্রহণ করে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেই দ্বীপে যাওয়া। সেখানে যারা বাস করে তারা অমর। জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের অবাধ গতি, আর জল-স্থল-শূন্যের সমস্ত জীব তাদের বশীভূত। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে লাউ-ৎজুর মন্ত্রপূত প্রতিমূর্তি সঙ্গে থাকা চাই। নইলে সে দ্বীপে গিয়ে নামবার উপায় নেই। ঐ প্রতিমূর্তি আছে সান্‌-কুয়ানের গুপ্তমন্দিরে। এই ম্যাপ দুখানা আমি পেয়েছি সারা-জীবনের চেষ্টার পর, গেল বছরে। আরো কিছুকাল আগে পেলে আমি নিশ্চয়ই সান্‌-কুয়ানের গুপ্তমন্দিরে যেতে পারতুম, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দরজার কাছে এসে, পঙ্গু, ভগ্নদেহে সেখানে যাবার শক্তি আর সাহস আমার হয় নি। অথচ অমন মূল্যবান জিনিস হাতছাড়া করতেও পারি নি। বাবু, সেই লোভই আমার কাল হল। তাও-দলের লোকেরা সেই ম্যাপের খোঁজে এখানে এসে আমার বুকে ছুরি মেরেছে। আপনারা না এসে পড়লে তারা নিশ্চয়ই ম্যাপ দুখানা নিয়ে পালিয়ে যেত।'

'এই পর্যন্ত বলে মঙ অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল। আবার একবার জলপান করে অনেক কষ্টে সে বললে, 'বাবু, যদি ধনরত্ন চান, তা হলে

সান্-কুয়ানের গুপ্তমন্দিরে যেতে বিলম্ব করবেন না। শত্রুরা যখন ম্যাপের সন্ধান পেয়েছে, তখন দেরি করলে ম্যাপ দুখানা আবার আপনাদের হাতছাড়া হবেই। কিন্তু আর একটা কথা জেনে রাখবেন। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে লাউ-ৎজুর মূর্তি পাবার পর আর সেখানে একটুও অপেক্ষা করবেন না। কারণ তারপরেই সেখানে অজানা এক বিপদের উৎপত্তি হবে। সে বিপদ যে কি তা আমি জানি না, কিন্তু শুনেছি সে নাকি ভয়ঙ্কর! মন্দিরের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলে তখনকার মতন নিষ্কৃতি লাভ করবেন বটে, কিন্তু যারা আজ আমাকে আক্রমণ করেছে, তাও-দলের সেই হত্যাকারীদেরও সাবধান। লাউ-ৎজুর মূর্তিকে অমরদের দ্বীপে নিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত তারাও আপনাদের পিছনে পিছনে ফিরবে—কারণ ঐ মূর্তি হস্তগত করবার জন্যে তারা যে-কোন পাপ-কাজ করতেও কুণ্ঠিত হবে না।'

'এই পর্যন্ত বলেই হতভাগ্য মঙের কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই হল তার মৃত্যু।'

'মঙের বালিশ ছিঁড়ে আমরা সত্য-সত্যই দুখানা ম্যাপ পেলুম। সেই ম্যাপে চীনে-ভাষার কথা ছিল বটে, কিন্তু অল্পস্বল্প চীনে-ভাষা জানতুম বলে অর্থ বুঝতে আমার কষ্ট হল না।'

'তারপর তিন-চারদিন ধরে আমরা চারজনে কর্তব্য স্থির করবার জন্যে অনেক আলোচনা করলুম। অমরদের দ্বীপের কথা আমরা গাঁজাখুরি রূপকথা বলে উড়িয়ে দিলুম, কিন্তু সান্-কুয়ানের গুপ্তধনের লোভ অবিরাম জ্বরের মতো আমাদের যেন পেয়ে বসল। শেষটা সকলে মিলে স্থির করলুম, চীনের য়ুঅন্কাং প্রদেশ যখন এখান থেকে বেশি-দূরে নয়, তখন মঙের কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখলে দোষ নেই। আর কিছু না হোক, অন্তত, য়ুঅন্কাঙের পৃথিবীবিখ্যাত গুহা-মন্দিরগুলো তো স্বচক্ষে দেখা হবে! আপনারা বোধহয় জানেন না, সুদূর অতীতে চীনদেশের উপরে ভারতবর্ষের কতটা প্রভাব পড়েছিল, য়ুঅন্কাঙের গুহা-মন্দিরগুলিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। দেড়

হাজার বছরেরও আগে ওখানকার গুহা-মন্দিরের ভিতরে যে-সব অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল, আজও তারা মৌন ভাষায় ভারত-শিল্পের জয় ঘোষণা করছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।'

'তারপর কেমন করে আমরা য়ুঅন্‌কাঙের গুহা-মন্দিরের কাছে গিয়ে ম্যাপ দেখে পাহাড়ের ভিতর সান্‌-কুয়ান্ বা ভারতের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের গুপ্তমন্দির খুঁজে বার করলুম, তা চিত্তাকর্ষক হলেও এখন বলবার দরকার নেই।'

'আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করলুম। নির্জন পাহাড়ের উপরে যখন দিনের কোলাহল থামিয়ে রাতের নীরব অন্ধকার নেমে এল, তখন আমরা পেট্রোলের লণ্ঠন জ্বেলে একে একে পাহাড়ের বুকের মধ্যে লুকানো সেই আশ্চর্য গুহা-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলুম।'

'সেই গুহার মধ্যে ঢুকেই মনে হল, আমরা যেন পৃথিবীর বাইরে কোন এক রহস্যময় স্থানে এসে পড়েছি! কত শতাব্দীর বদ্ধ বাতাস সেখানে যেন বন্দী হয়ে আছে, এতকাল পরে মানুষের অভাবিত পদশব্দ শুনে তারা যেন সবিস্ময়ে চমকে উঠল! আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ-গুলো শোনাতে লাগল সদ্য-জাগ্রত নিস্তব্ধতার অস্ফুট ভীত আর্তনাদের মতো! সমুজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার দূরে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু গুহাগর্ভের চারিদিকেই কি যেন এক অজানিত, অদৃশ্য ও জীবন্ত বিভীষিকা ক্রমাগত আমাদের আশপাশ দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল,—আমরা দেখতে না পেয়েও তাকে অনুভব করতে পারলুম!'

নীরদবাবু সভয়ে চুপিচুপি বললেন, 'নরেনবাবু, আমার বুক কেমন করছে! চলুন, এখান থেকে পালিয়ে যাই!'

'চন্দ্রবাবু এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ঐ দেখুন ত্রিমূর্তির বিগ্রহ!'

'পাথরের বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিপুলবপু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, কিন্তু চীনা শিল্পীর হাতে পড়ে তাঁদের চেহারা আর সাজ-

'সিন্দুকের ভিতর জ্বল্-জ্বল্ করছে রাশ রাশি হীরা, চুনী, মরকত···

পোশাক রীতিমত বদলে গিয়েছে !'

'ত্রিমূর্তির ঠিক পায়ের তলায় সাজানো রয়েছে সারি সারি লাউ-ৎজুর মূর্তি ! প্রত্যেক মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দিয়ে গড়া,—কোনটি পোর্সিলেনের, কোনটি য়্যাম্বারের, কোনটি জেড-পাথরের ! আমরা প্রত্যেকে এক-একটি মূর্তি তুলে নিয়ে পকেটে ফেললুম।'

অনাথবাবু বললেন, 'কিন্তু লাউ-ৎজুর মূর্তির লোভে তো আমরা এখানে আসি নি। মঙ গুপ্তধনের কথা বলেছিল, মনে আছে তো ?'

'বেদীর ঠিক নীচেই চমৎকার কারুকার্য-করা তালাবন্ধ প্রকাণ্ড একটা ল্যাকারের সিন্দুক ছিল। তার উপরে বার-কয়েক কুড়ুলের ঘা মারতেই ডালা গেল ভেঙে, তারপর ডালা তুলে দেখেই আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল।'

'সিন্দুকের ভিতর জ্বল্-জ্বল্ করছে রাশি রাশি হীরা, চুনী, মরকত প্রভৃতি রকম রকম পাথর, তাদের আর সংখ্যা হয় না, বড় বড় রাজাও কখনো তত ঐশ্বর্য এক জায়গায় চোখে দেখেন নি ! আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবাক ও আচ্ছন্ন হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর পাগলের মতো সিন্দুকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেই-সব রত্ন মুঠো মুঠো তুলে নিতে লাগলুম !'

'আচম্বিতে সমস্ত গুহা কাঁপিয়ে জেগে উঠল গভীর এক গর্জন ! তেমন অমানুষিক গর্জন আমি জীবনে আর কখনো শুনি নি। এক মুহূর্তেই আমার সর্বশরীর এলিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়তে চাইলে !'

'গুহার দক্ষিণ-দিকটা অন্ধকারের ভিতরে কত দূর এগিয়ে গিয়েছে আমরা তা পরীক্ষা করবার সময় পাই নি। গর্জনটা জেগেছে সেই দিকেই। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে আমরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না !'

'কয়েক মুহূর্ত চারিদিক মৃত্যুর মতন স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপরই শুনতে পেলুম আর এক ভয়াবহ শব্দ ! যেন কোন অতিকায় মূর্তি, বিপুল পায়ের চাপে গুহাতল কম্পিত করে অন্ধকারের মধ্য থেকে

আলোকের দিকে এগিয়ে আসছে !'

অনাথবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমি দুটো চোখ দেখতে পেয়েছি ! আগুন-ভরা বড় বড় চোখ !'

'সর্বাগ্রে নীরদবাবু গুহার দরজার দিকে ছুটলেন। বলা বাহুল্য সিন্দুক-ভরা ধনরত্ন ফেলে আমরাও নীরদবাবুর পিছনে ছুটতে এক মুহূর্তও দেরি করলুম না।'

'তারপর আর বেশি কিছু বলবার নেই। হংকঙে নিরাপদে ফিরে এলুম বটে কিন্তু লাউ-ৎজুর ভক্তদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলুম। আমাদের উপরে সর্বদাই যে একদল সাংঘাতিক শত্রুর দৃষ্টি কড়া-পাহারা দিচ্ছে, দিন-রাত তার প্রমাণ পেতে লাগলুম। দু-তিনবার প্রাণে মারা যেতে-যেতেও বেঁচে গেলুম। গুহা থেকে যে রত্নগুলি আনতে পেরেছিলুন, তারই মহিমায় আমরা ধনীর মতন জীবন কাটাতে লাগলুম।'

'কিন্তু কিছুকাল পরে শত্রুরা বর্মাতেও আমাদের ঠিকানা আবিষ্কার করে ফেললে। আবার আমাদের জীবন পদে পদে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন আমরা কলকাতায় পালিয়ে এলুম। এখানেও কিছু দিন বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। তারপর কি হয়েছে, আপনারা সকলেই জানেন। আমার তিন বন্ধুই হত্যাকারীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন, বাকি আছি খালি আমি। কিন্তু বিমলবাবু, আমিও আর বেশিদিন নেই, লাউ-ৎজুর শিষ্যরা আবার নরবলি দেবেই।'

নরেনবাবুর কাহিনী শেষ হবার পর সকলেই খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন সুন্দরবাবু। তিনি বললেন, 'হুম্ ! বেশ বোঝা যাচ্ছে, যকের ধনে হাত দিয়ে আপনারা যকের খপ্পরে পড়েছেন !'

জয়ন্ত বিরক্ত-স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, পাগলের মতো বাজে বকবেন না ! যক কখনো ল্যাসো ছোঁড়ে না, কলকাতার রাস্তায়

দিনের বেলায় ট্যাক্সি চড়ে পালায় না।'

—'আচ্ছা, তা যেন মানলুম। কিন্তু গুহার মধ্যে অমন ভয়ানক গর্জন করে নরেনবাবুদের তেড়ে এসেছিল কে?'

—'গুহার মধ্যে হয়তো কোন বন্যজন্তুর বাসা ছিল।'

—'বেশ, তাও আমি মানলুম। কিন্তু প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের পর আকাশে ছায়ামূর্তির মতো হুস্ করে উড়ে যায় কারা? তোমরা তো জানো, আমি নিজেই স্বচক্ষে ঐ-রকম একটা বিচ্ছিরি ছায়ামূর্তি দেখেছি?'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, ও-সব রহস্য আজ রাত্রেই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লাউ-ৎজুর মূর্তি আজ তো আমার বাড়িতে থাকবে, দেখি, আমার কাছ থেকে সেটা কেউ কেড়ে নিতে আসে কি না!...হ্যাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা নরেনবাবু, সেই ম্যাপ দুখানা কোথায়?'

নরেনবাবু বললেন, 'একখানা ম্যাপ আমরা তাড়াতাড়ি সান্-কুয়ান্ মন্দিরেই ফেলে পালিয়ে এসেছি, পথ চিনে সেখানে যাওয়ার কোন উপায়ই আর নেই। তবে অমরদের দ্বীপে যাবার ম্যাপখানা এখনো আমার কাছে আছে, এই নিন্। কিন্তু এই ছেলেখেলা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই বোধ হয়।'

বিমল ম্যাপখানা সাগ্রহে হস্তগত করে বললে, 'নরেনবাবু, আমার বিশ্বাস এই ম্যাপের মধ্যে ছেলেখেলার চেয়ে গুরুতর কোন রহস্য আছে! আপনারা সকলে শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সত্য সত্যই অমরদের দ্বীপের উল্লেখ দেখেছি। তার কথা আমি আপনাদের বলতে পারি।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উড়ন্ত কালো-ছায়া

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, তাওদের সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলতে পারেন, তা হলে আমরা অত্যন্ত সুখী হবো। অন্তত আমার কথা যদি ধরেন, এ-বিষয়ে আমি কিছুই জানি না—অর্থাৎ যাকে বলে ডাহা মূর্খ।'

বিমল বললে, 'আপনারা আমাকে মস্ত-বড় জ্ঞানী বলে ভাববেন না। নতুন নতুন 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারের' খোঁজে মাঝে মাঝে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'-তে আমি যাই নানান রকম বই ঘাঁটতে! এই ভাবেই আমি চীনদেশের তাও-ধর্মের ইতিহাস জানতে পেরেছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু চীনেম্যানদের ধর্মের সঙ্গে বাঙলা দেশের এই-সব খুন-খারাপির সম্পর্ক কি! কাশীধামে মরল কাক, আর কামরূপে উঠল হাহাকার! হুম্!'

—'আচ্ছা, আগে আপনারা আমার কথা শুনুন।......যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ছয়শ চার বছর আগে চীনদেশে লাউ-ৎজু জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি চীনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ হন। বহুকাল ধ্যান-ধারণার পর লাউ-ৎজু স্থির করলেন, এই সংসারে তিনি আর বাস করবেন না। সংসার ত্যাগ করবার সময়ে তিনি যে বই লিখে যান তার নাম হচ্ছে 'তাও-তে-কিং'—অর্থাৎ তাও আর তের গ্রন্থ। 'তাও' বলতে 'পথ'ও বোঝায়, 'পথিক'ও বোঝায়। এই পুঁথিতে লাউ-ৎজুর সমস্ত ধর্মমত লেখা আছে। মোটামুটি তাঁর মত হচ্ছে এই মানুষের পৃথিবীতে বাস করা উচিত ঠিক শিশুর মতোই। গাছপালা যেমন কোন চিন্তা করে না, অথচ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, মানুষও তেমনি নিশ্চিন্তভাবে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করবে। সাহিত্য, আর্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিগ্রহ সমস্তই মিথ্যা। এ-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মানুষকে

'তাও' বা পথিক হতে হবে। মানুষ তার আকার পায় পৃথিবী থেকে, পৃথিবী তার আকার পায় স্বর্গ থেকে, আর স্বর্গ তার আকার পায় 'তাও' থেকে! 'তাও' হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। 'তাও' ধর্মের সমস্ত খুঁটিনাটির কথা বলবার সময় এখন হবে না, তবে এইটুকু জেনে রাখুন যে, প্রাচীন 'তাও' ধর্মের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্মের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্মের মতো 'তাও' ধর্মও পরে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তার মধ্যে ক্রমেই ভূত-প্রেত, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক আর হরেক-রকম ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। লাউ-ৎজুর মতামতের ভিতর থেকে নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হতে থাকে। পরের যুগের তাও-সাধকরা অমরত্বেরও দাবি করে। তাওদের সিদ্ধ-পুরুষরা কেবল অমরই হয় না, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ!—'

সুন্দরবাবু হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'হুম্! তাও-সাধকরা নিশ্চয়ই গাঁজার কলকেতে দম মারত?'

বিমল বললে, 'সে কথা ইতিহাসে লেখে না। তবে চীনেদের পবিত্র পাহাড় থাইসানের তলায় থাইআন্‌ফু নামে এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের কাছে একজন অমর তাও-সাধকের সমাধিস্থ দেহ কত কাল থেকে বিদ্যমান আছে কেউ তার হিসাব জানে না। আপনারা ইচ্ছা করলেই সেখানে গিয়ে তাঁকে সশরীরে দেখে আসতে পারেন, কারণ য়ুরোপ-আমেরিকার শত শত অবিশ্বাসী সাহেব তাঁকে দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছে। রিচার্ড উইলহেল্‌ম্ সাহেব তাঁর কেতাবে লিখেছেন, 'এই সমাধিস্থ তাও-সাধক মৌনব্রতী। তিনি কত কাল খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করেন নি। বাইরের কোন-কিছুই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে না। তাঁর দেহ শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, দেখতেও তাঁকে মৃতের মতো, কিন্তু তাঁর দেহ একটুও পচে যায় নি। প্রতিদিন দলে দলে ভক্ত এই তাও-সাধুকে দেখে প্রণাম করে পুণ্য সঞ্চয় করতে যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু বিমলবাবু, বিজ্ঞান তো এ-সব কথা মানবে না।'

—'বিজ্ঞান হয়তো মানবে না, কিন্তু ভারতবর্ষেও তো অনেক সাধু-পুরুষ বার বার প্রমাণিত করেছেন যে, সমাধিস্থ দেহ মাটির ভিতর বহুকাল পুঁতে রাখলেও মারা পড়ে না বা পচে যায় না। কাশীর ত্রৈলঙ্গ-স্বামী কত শত বৎসর বেঁচে ছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। সময়ে সময়ে তাঁর দেহ মড়ার মতো বৎসরের পর বৎসর ধরে গঙ্গাজলে ভাসত, তবু তার কোন ক্ষতি হোত না! এ সব রহস্যের কারণ আমি জানি না বটে, তবু এদের স্বীকার করতে বাধ্য হই। কিন্তু তর্ক রেখে এখন যা বলছিলুম তাই বলি।......তাও-ধর্মে যেদিন থেকে ভূত-প্রেত ম্যাজিকের বাড়াবাড়ি হল, সেইদিন থেকেই চীনদেশে তার প্রভাব বেড়ে উঠল অত্যন্ত। এমন কি শিক্ষিত চীনেম্যানরাও তাও সাধুদের ভক্তি আর ভয় না করে পারত না। চীনদেশের কোন কোন সম্রাটও তাও-ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার মান-মর্যাদা আরো বাড়িয়ে তুললেন।'...

'তাও-সাধুদের আর একটা বিশ্বাসের কথা এখনো বলা হয় নি। তারা বলে, পূর্ব মহাসাগরে একটি দ্বীপ আছে, তার নাম 'অমৃতের দ্বীপ।' সেখানে 'সিয়েন' অর্থাৎ অমররা বাস করে। সেখানে অমর-লতা জন্মায়, তার অমৃত-ফল ভক্ষণ করলে মানুষও অমর হয়। সেখানে জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ শোক নেই, অমৃত-দ্বীপের বাসিন্দারা দিন-রাত আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা, পান-ভোজন নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন কাটায়। চীনে চিত্রকররা এই অমৃতের দ্বীপের অনেক চমৎকার ছবি এঁকেছে, দুই-একখানা ছবি আমিও সংগ্রহ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার ঐ অমৃতের দ্বীপে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, কিন্তু এতদিন কিছুতেই তার ঠিকানা জানতে পারি নি। আজ নরেনবাবুর ম্যাপে প্রথম তার ঠিকানা পেলুম। এখন দেখতে হবে, এই ঠিকানা নির্ভুল কি না!'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'বিমলবাবু, আপনার পথ আর আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনার মতো আমিও রূপকথার দেশে যাবার জন্যে ব্যস্ত নই। আমি চাই

হত্যাকারীর সন্ধান করতে। অমৃতের দ্বীপের সঙ্গে এই-সব হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই।'

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমার মতে, যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।'

—'কি-রকম ?'

—'সেই বুড়ো চীনেম্যান মঙ, নরেনবাবুর কাছে যাবার সময়ে কি বলে গিয়েছিল, স্মরণ করুন। সে বলেছিল,—'যারা তাও-ধর্ম অবলম্বন করে, তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, অমৃতের দ্বীপে যাওয়া। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে লাউ-ৎজুর মন্ত্রপূত প্রতিমূর্তি সঙ্গে থাকা চাই।' সম্প্রতি পরে পরে যে তিনটে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে, তাদের মূলে আমরা কি দেখতে পাই ? দেখতে পাই, নরেনবাবুরা চার বন্ধুতে মিলে চীনদেশে গিয়ে দৈবগতিকে লাউ-ৎজুর চারটি দুর্লভ মূর্তি সংগ্রহ করে পালিয়ে এসেছেন। ঐ মূর্তিগুলো পাবার পর থেকেই তাঁদের পিছনে লেগেছে শত্রু। শত্রুরা তিনবার নরহত্যা করে তিনটে মূর্তি হস্তগত করেছে, কিন্তু তবু তারা তৃপ্ত হয় নি, বাকি মূর্তিটাও হস্তগত করতে চায়। এই শত্রুরা যে চীনেম্যান, আজ আমরা তার চাক্ষুষ প্রমাণও পেয়েছি। তারা যে তাও-ধর্মের ভক্ত, সে বিষয়েও আর সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব, কেবল লাউ-ৎজুর মূর্তি নয়, নরেনবাবুর কাছ থেকে ম্যাপ দুখানাও কেড়ে না নিয়ে তারা ক্ষান্ত হবে না— যদিও একখানা ম্যাপ যে হারিয়ে গেছে এ-কথা তাদের জানা নেই। আমাদের মতো তারাও অমৃতের দ্বীপে যেতে চায়, আর সেইজন্যেই তারা হত্যার পর হত্যা করে পথের কাঁটা তুলে ফেলেছে! সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এই হত্যাকাণ্ডগুলো হচ্ছে, অমৃত-দ্বীপে যাবারই প্রাণপণ চেষ্টা!'

জয়ন্ত বললে, 'এতক্ষণে বুঝলুম। বিমলবাবু, আপনার ধারণা এখন সত্য বলেই মনে হচ্ছে।'

বিমল উঠে ঘরের ভিতরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আজ রাত্রেই হয়তো শত্রুদের আবার

দেখা পাব। সুন্দরবাবু, আজ আমি আপনাদের সাহায্য পেলে সুখী হবো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্ ! এ-সব তো দেখছি আজগুবি ব্যাপার ! মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেত, ভোজবাজী ! আকাশে ছায়ামূর্তিও দেখা যায় ! জয়ন্ত বলে, যে ভূতটা মানুষ খুন করে পুতুল নিয়ে পালায়, তার নাকি একখানা ঠ্যাং আবার কাঠে বাঁধানো ! আমরা হচ্ছি পুলিশের লোক, মানুষ-খুনীকে ধরতে পারি, কিন্তু ভূত-খুনীকে গ্রেপ্তার করবার মন্ত্র-তন্ত্র তো আমরা জানি না !'

কুমার হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমরা ভূত ধরবার মন্ত্র জানি, সুতরাং আপনার ভয় নেই। আপনি খালি দয়া করে একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে কাছাকাছি কোথাও হাজির থাকতে পারবেন তো?'

—'তা পারব না কেন ? কিন্তু জয়ন্ত আর মাণিককেও আমার সঙ্গে রাখতে চাই।'

বিমল বললে, 'নিশ্চয়ই ! ভূত ধরবার ফাঁদ পেতে কুমার আর নরেনবাবুকে নিয়ে আমি বাড়ির ভেতরে পাহারা দেব। লাউ-ৎজুর মূর্তিটা থাকবে আমার তেতলার ঘরে, আর আপনারা লোকজন নিয়ে বাড়ির চারিধারে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর আমি যথাসময়ে নেচে বা গান গেয়ে নয়, কেবল বাঁশী বাজিয়ে আপনাদের আহ্বান করব। কেমন, এ ব্যবস্থা মন্দ কি ?'

জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, 'বেশ, তা হলে এই কথাই রইল।'

সে রাত্রে সন্ধ্যার খানিক পরেই চাঁদের ফালি আকাশের গা থেকে মিলিয়ে গেল।

রাত এগারটার পরে শহরের গোলমাল ক্ষীণ হয়ে এল এবং দুটোর পর থেকে মনে হতে লাগল, সারাদিন পরিশ্রম করে কলকাতা যেন মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে !

জয়ন্ত, মাণিক ও সুন্দরবাবু একটা বেসরকারি অন্ধকার গলির

ভিতরে লুকিয়ে আছেন, অন্যান্য জায়গায় আনাচে-কানাচে একদল পাহারাওয়ালাও চোখের আড়ালে অপেক্ষা করছে।

অনেক দূর থেকে একটা বড় ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং করে তিনটে বাজল। সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, আজ আর কেউ আসবে না। আমরা ভূতদের দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু ভূতরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে! এত মানুষ দেখে তারা বোধ হয় ভয় পেয়েছে।'

জয়ন্ত গলি থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, 'চুপ! একটা লোক এই দিকেই আসছে!'

মাণিকও উঁকি মেরে বললে, 'লোকটা যে চীনেম্যান!'

—'হ্যাঁ। ভেতরে সরে এসো। লোকটা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আসছে। কিছু সন্দেহ করলেই সরে পড়বে!'

সকলে গলির আরো ভিতরে সরে এসে দাঁড়াল, এবং সেইখান থেকেই শুনতে পেলে নিস্তব্ধ রাজপথের উপরে জেগে উঠছে আগন্তুকের পায়ের শব্দ। খানিক পরেই পায়ের শব্দ একবার থামল। তারপর শব্দটা আবার জাগল, আবার থামল।

সুন্দরবাবু চুপি চুপি বললেন, 'লোকটা চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ছে কেন বল দেখি? রাস্তার ওদিকের আলোও ক্রমেই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে! ব্যাপার কি?'

জয়ন্ত খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে আবার মুখ বাড়িয়ে দেখে ফিরে এল। তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'চীনেম্যানটা গ্যাস-পোস্টে উঠে একে একে আলো নিবিয়ে দিচ্ছে!'

মাণিক বললে, 'অন্ধকারেই ওদের লীলাখেলা শুরু হবে।'

আকাশে চাঁদ নেই, রাস্তায় আলো নেই। তারপরেই নিবিড় অন্ধকারের নীরবতা ভেঙে দিলে একখানা মোটরগাড়ির শব্দ।

জয়ন্ত উৎসাহিত স্বরে বললে, 'অন্ধকারের আসর তৈরি দেখে এইবারে বোধ হয় আমাদের বন্ধুরা আসছেন! মাণিক, বিমলবাবুর বাঁশী শোনবার জন্যে প্রস্তুত হও।'

মোটরের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। খানিকক্ষণ আর কারুর সাড়া নেই। মৌন নিশীথ রিম্‌-রিম্‌ করতে লাগল কেমন একটা ভয়ের ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। অনেক দূর থেকে একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠল যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখে। কালিমাখা আকাশের বুকের ভিতর থেকে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল একটা ভীত প্যাঁচা।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'চারিদিক কেমনধারা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে! রাস্তার ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার মন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করছে। কারুর কোন সাড়া-শব্দ নেই, এমন নিঃসাড়ে ওরা ওখানে কি করছে?'

জয়ন্ত আবার এগিয়ে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।...না, না, একটা কি যেন দেখা যাচ্ছে!'

মিনিটখানেক জয়ন্ত আর কোন কথা কইলে না। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, 'মাণিক একবার এগিয়ে এসো তো!'

মাণিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'কি জয়ন্ত?'

—'বিমলবাবুদের বাড়ির উপর দিকে তাকিয়ে দেখ। কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

মাণিক সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য! কালো আকাশের গায়ে অন্ধকারের চেয়েও কালো কি-যেন একটা নড়ে নড়ে দুলে দুলে উঠছে!'

সুন্দরবাবু দেখবার জন্য সাগ্রহে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু মাণিকের কথা শুনেই তিনি শিউরে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবরুদ্ধ স্বরে বল্‌লেন, 'হুম্‌! সেই ছায়ামূর্তি!'

মাণিক বললে, 'জয়ন্ত! নীরদবাবু যে রাতে খুন হন, সেদিনও আমি তাঁর বাড়ির উপর থেকে ঐ-রকম ধোঁয়ার মতো কি একটাকে শূন্যের দিকে উঠে যেতে দেখেছিলুম!'

জয়ন্ত বোবার মতো নীরবে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবতে লাগল, তা হলে এই সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কি

সত্যসত্যই কোন অলৌকিক ব্যাপারের সম্পর্ক আছে? ওটা যে জীবন্ত তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ঐ নিবিড়তর অন্ধকারের রহস্য বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব!

সুন্দরবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'জয়ন্ত, আমাদের আর এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়! আমার বোধ হয় বিমলবাবুদের বাড়ির ভেতরে এতক্ষণে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে! চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

জয়ন্ত বললে, 'না! বিমলবাবুর কথামত বাঁশী না বাজা পর্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভারি তোমার বুদ্ধি! বিমলবাবু বেঁচে না থাকলে বাঁশী কেমন করে বাজবে?'

জয়ন্তেরও মনে মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ জাগছিল। যদি বাঁশী না বাজে? যদি হত্যাকারীরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে মানুষ মেরে কাজ সেরে পালিয়ে যায়।

কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাদের সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দিয়ে বিকট একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বাঁশীর আওয়াজে নৈশ স্তব্ধতা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপরেই সে কী গোলমাল, কী ছুটোছুটি! এখানে ওখানে আড়ালে আড়ালে যত কনস্টেবল এতক্ষণ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, চারদিক থেকে তারা ঘটনাস্থলে দৌড়ে এল উর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুতবেগে!

অন্ধকারে জাগল এক মোটরের শব্দ। মুহূর্ত মধ্যেই শব্দটা অনেক দূর চলে গেল।

সুন্দরবাবু গর্জন করে বললেন, 'এই সেপাই! ধর্-ধর্! যাঃ, ব্যাটারা আমাদের চোখে ধুলো দিলে।'

জয়ন্ত ছুটতে ছুটতে শূন্যে মুখ তুলে দেখলে। আকাশের গায়ে সেই জ্যান্তো কালো ছায়াটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ উপরের বারান্দা থেকে বিমলের চিৎকার শোনা গেল—'জয়ন্তবাবু! সুন্দরবাবু! শীগগির আসুন! আসামী গ্রেপ্তার!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের আবিষ্কার

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, 'হুম্! আসামী গ্রেপ্তার, না ঘোড়ার ডিম গ্রেপ্তার! আসামীরা মোটরে চড়ে চম্পট দিয়েছে, আমাদের খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল।'

জয়ন্ত ও মাণিক কোন জবাব না দিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে পড়ে ঝড়ের মতো বেগে বিমলদের বাড়ির দিকে ছুটে চলল। অগত্যা সুন্দরবাবুকেও তাদের পিছনে পিছনে ছুটতে হল—যদিও বেশি দৌড়াদৌড়ি করে তিনি তাঁর গুরুভার ভুঁড়িটিকে বেশি কষ্ট দিতে মোটেই ভালোবাসেন না। আরো একটু হেতু আছে। এখানে একলা যদি কিছু দেখা দেয়? বাপরে! হুম্!

গ্যাসের আলোগুলো শত্রুরা নিবিয়ে দিয়েছিল বলে আশপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিমলের চিৎকার, কনস্টেবলদের দাপাদাপি ও সম্মিলিত কণ্ঠের কোলাহল এবং সকলের দ্রুত পদধ্বনি রাত্রের স্তব্ধ অন্ধকারকে করে তুললে বিচিত্র শব্দের জগৎ!

রাস্তার দু-পাশের বাড়িতে বাড়িতে জানলা-দরজাগুলো দুম-দাম করে খুলে যেতে লাগল এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আলোকের পর আলোকরেখা ও গৃহস্থদের কৌতূহলী মুখের পর মুখ!

আচম্বিতে খানিক তফাৎ থেকে সমস্ত শব্দ ডুবিয়ে জেগে উঠল আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন এবং বিষম এক আর্তনাদ!

মাণিক চমকে বলে উঠল, 'কে রিভলভার ছুঁড়লে? কে আর্তনাদ করলে?'

দু-পাশের বাড়ি থেকে মজা দেখবে বলে যারা তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়েছিল, রিভলভারের গর্জন ও মানুষের আর্তনাদ শুনেই তাদের সমস্ত কৌতূহল ঠাণ্ডা হয়ে গেল—সকলে মহা আতঙ্কে জানলা

দরজাগুলো দুম্-দাম্ করে আবার বন্ধ করে দিলে। চারিদিক আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার!

জয়ন্ত ইলেকট্রিক টর্চ বার করে আলো জ্বেলে পথের উপর ফেললে এবং তীব্র আলোকরেখার মধ্যে দেখা গেল, একটি লোক ছুটতে ছুটতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!

সুন্দরবাবু তাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এই যে শান্তরাম! ব্যাপার কি? কে রিভলভার ছুঁড়লে? কে গুলি খেয়ে চ্যাঁচালে? তুমি পালিয়ে আসছ কেন?'

—'পালিয়ে আসছি না হুজুর. আপনাকে খবর দিতে আসছি। আসামীরা মোটরে করে পালাচ্ছিল, কনস্টেবল পূরণ সিং তাদের গাড়ির পা-দানীর উপরে উঠে পড়েছিল। আসামীরা গুলি করে তাকে পথে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

বারান্দার উপর থেকে আবার বিমলের গলা শোনা গেল, 'সুন্দর-বাবু! যারা পালিয়েছে তাদের নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আসল আসামী আমার শোবার ঘরে বন্দী হয়েছে! লোকজন নিয়ে শীগগির আসুন।'

ততক্ষণে কুমার নীচে নেমে সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তিনতলার বারান্দায় নরেনবাবুকে পাশে নিয়ে বিমল দাঁড়িয়ে ছিল—তার হাতে রিভলভার।

জয়ন্ত বললে, 'বাহাদুর বিমলবাবু, বাহাদুর! আজ আপনারই বুদ্ধির জয়! কিন্তু আসামীকে কি করে আপনি বন্দী করলেন?'

বিমল বললে, 'আজ বৈকালে আমার দাসী বাজার থেকে ফিরে এসে বললে, একটা অচেনা লোক তাকে জিজ্ঞাসা করছিল, বাড়ির কোন্ ঘরে কে শোয়! আমি তিনতলায় শুই শুনেই সে চলে যায়। বুঝলাম, শত্রুরা চর পাঠিয়ে আমার শোবার ঘরের সন্ধান নিতে চায়।

তখন ঐ ঘরেই আমি শত্রু-ধরা ফাঁদ পাতলুম। প্রথমে লাউ-ৎজুর মূর্তিটা একটা ছোট্ট টেবিলের উপরে বসিয়ে রাখলুম—চোর যাতে সহজেই সেটা দেখতে পায়। তারপর ঘরের আলো না নিবিয়েই, দরজাটা ভেজিয়ে আমরা পাশের এই ঘরটায় বসে কান খাড়া করে পাহারা দিতে লাগলুম।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'কেবল কান খাড়া করে পাহারা দিয়ে কাঁচা কাজ করেছেন। চোর যদি চুপি চুপি কাজ সেরে লম্বা দিত?'

বিমল হেসে বললে, 'অসম্ভব। সুন্দরবাবু, আমার শোবার ঘরের দরজা পাহারাওলার কাজ করে। যত আস্তেই তাকে ঠেলুন, সে ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ করে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করবেই!......কিন্তু যাক্ সে কথা। তারপর কি হল শুনুন। রাত তিনটে পর্যন্ত পাহারা দেবার পর শুনলুম রাস্তায় একখানা মোটরের শব্দ। শব্দটা যে আমার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এসে থেমে গেল, তাও বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ! তারপর আশ্চর্য হয়ে শুনলুম, বারান্দার উপরে পায়ের শব্দ হল!'

মাণিক বললে, 'বারান্দার সামনে শূন্যে কোন কালো ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন?'

—'কালো ছায়া! সে আবার কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেবল কান খাড়া না করে বাইরে একবার উঁকি মারলেই তাকে দেখতে পেতেন! আমরা সবাই দেখেছি!'

—'না, আমরা ছায়া-টায়া কিছুই দেখি নি, অন্তত দেখবার সময় পাই নি। কারণ পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার বিশ্বস্ত দরজা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ চিৎকার করে জানিয়ে দিলে যে শিকার ফাঁদের ভিতরে ঢুকেছে! আমি তীরের মতন ছুটে গিয়ে দরজার পাল্লা টেনে বন্ধ করে বাহির থেকে শিকল তুলে দিলুম, আর সেই সময়েই চকিতের মধ্যে দেখে নিলুম, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা খুব লম্বা-চওড়া চীনেম্যানের মূর্তি!'

জয়ন্ত কৌতূহল-ভরে জিজ্ঞাসা করলে, 'নিশ্চয়ই তার বাঁ পা নেই? পায়ের বদলে সে কাঠের খোঁটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল?'

—'অত বেশি দেখবার সময় পাই নি জয়ন্তবাবু! কিন্তু আর হাতে-পাঁজি মঙ্গলবারের দরকার কি? চোর তো পাশের ঘরেই আছে, সবাই মিলে এইবারে তার উপরে জোড়া জোড়া দৃষ্টিবাণ ত্যাগ করা যাক না কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! সবাই হাতে রিভলভার নাও। এ শুধু চুরি করে না, খুনও করে!'

বিমল সব-আগে অগ্রসর হল, তারপর জয়ন্ত, কুমার ও মাণিক এবং সব-শেষে সুন্দরবাবু। কেবল নরেনবাবু অর্ধ-মৃতের মতো সেই-খানেই বসে রইলেন এবং সভয়ে বারংবার বলতে লাগলেন, 'দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা-শ্রীহরি, দুর্গা-শ্রীহরি!'

বিমল ডান-হাতে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে বাঁ-হাতে দরজার শিকলটা নামালে। তারপর এক পদাঘাতে খুলে ফেললে পাল্লা দুটো সশব্দে।

উজ্জ্বল আলোকে ঘর ধব-ধব করছে। ভিতরে জনপ্রাণী নেই!

সকলে বিপুল বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ মূর্তির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে সুন্দরবাবু নীরবতা ভেঙে বলে উঠলেন, 'হুম্! এমন যে হবে, এ আমি আগেই জানতুম। ছায়ামূর্তিকে কেউ দরজা বন্ধ করে ধরে রাখতে পারে?'

কুমার তিক্তস্বরে বললে, 'এ ছায়া নয় সুন্দরবাবু, নিরেট কায়া। টেবিলের উপরে ছিল লাউ-ৎজুর মূর্তি, ঐ দেখুন, চোরের নিরেট হাত সেটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে!'

জয়ন্ত নির্বাক ভাবে একবার সারা ঘরখানার উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর ভিতরমুখো একটা জানলার দিকে অঙুলি নির্দেশ করলে। জানলার দুটো লোহার গরাদে বেঁকিয়ে ফাঁক করা!

সুন্দরবাবু দুই চোখ ছানাবড়ার মতো পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বাপ্‌রে বাপ্! চোর-ব্যাটার গায়ে কি অসম্ভব জোর!'

বিমল জানলার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর দুই হাত দিয়ে টেনে সেই দুমড়ানো গরাদে দুটো রীতিমত অবলীলাক্রমে আবার সিধে করে দিয়ে বললে, 'এ কাজ অসম্ভব নয় সুন্দরবাবু! জয়ন্তবাবুর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এ কাজ ওঁরও পক্ষে শক্ত নয়! কিন্তু আমার কাছে কি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে জানেন? চোর পালালো কেমন করে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এ তো রসগোল্লা খাওয়ার চেয়েও সোজা! আপনারা যখন বারান্দায় গিয়ে আমাদের ডাকাডাকি করছিলেন, চোর তখন জানলা দিয়ে নীচে নেমে সদর দরজা খুলে সরে পড়েছে আর কি!'

কুমার বললে, 'তা হয় না মশাই! নীচে নামবার একটি মাত্র সিঁড়ি। দোতলায় কি দেখেন নি সিঁড়ির মুখে বাঘাকে নিয়ে রামহরি পাহারা দিচ্ছে? আপনি হয়তো যমকে ফাঁকি দিতে পারবেন, কিন্তু আমার কুকুর বাঘাকে পারবেন না। আর সদর দরজার খিল ভিতর থেকে খুলেছি আমি নিজের হাতে।'

বিমল ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'সিঁড়ির আর এক মুখ গেছে তিন-তলার ছাদে। এইবারে ছাদটা দেখতে হবে।'

তেতলার ছাদে কেউ নেই। জয়ন্ত ধারে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে আন্দাজ করে দেখলে, রাস্তা থেকে ছাদটা প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ ফুটের চেয়ে কম-উঁচু হবে না। অত উঁচু থেকে লাফ মেরে কোন মানুষেরই পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

মাণিক বললে, 'চোর কোন ঘরে ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?'

কুমার বললে, 'দোতলার সিঁড়ি আগলে আছে বাঘা আর রামহরি তেতলায় মোটে দু-খানা ঘর। দু-খানাই তো আমরা দেখেছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা, এ-সব হয় ভুতুড়ে কাণ্ড, নয় ভোজবাজি! ভূত-প্রেত কি যাদুকররা যদি এমনি চুরি-টুরি করতে শুরু করে, তা হলে পুলিশকে হয় মরে ভূত হতে, নয় ভোজবাজি শিখতে হয়!'

মাণিক বললে, 'সুন্দরবাবু, বুড়ো-বয়সে ভোজবাজি শিখতে গেলে আপনার অনেক দিন কেটে যাবে! কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে এখনি মরে খুব সহজেই ভূত হতে পারবেন! একগাছা দড়ি সংগ্রহ করে আনব নাকি?'

সুন্দরবাবু রাগে লাল হয়ে বললেন, 'মাণিক, পিছু লেগে লেগে তুমিই আমাকে দেশছাড়া করবে দেখছি!'

মাণিক একগাল হেসে সুন্দরবাবুর একখানা হাত ধরে বললে, 'তা কি আর হয় দাদা? পিছু যখন নিয়েছি তখন আপনি দেশ ছাড়লেও আমি আপনাকে ছাড়ব কেন?'

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'চোর যে আমার দর্পচূর্ণ করেছে সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। নীচে চলুন জয়ন্তবাবু, আজকের শেষ-রাতটা আপনারা এইখানেই কাটিয়ে দিয়ে যান।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি থানায় চললুম, আমাকে আবার রিপোর্ট লিখতে হবে।'

মাণিক বললে, 'রিপোর্ট লেখবার পর পলাতক ভূতের নামে একখানা ওয়ারেন্টও বার করতে ভুলবেন না যেন!'

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'মাণিক, আবার!'

সকাল আটটা। গোল-টেবিলটা ঘিরে বসে আছে বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মাণিক ও নরেনবাবু এবং গৃহতলে থাবা পেতে বসে বাঘা মুখ তুলে সতৃষ্ণনয়নে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত ল্যাজ নাড়ছে আর নাড়ছেই! তার এমন সতৃষ্ণনয়ন ও লাঙুল-আন্দোলনের কারণ হচ্ছে, নূতন অতিথিদের জন্যে আজকের ব্রেকফাস্টের আয়োজনটা হয়েছে রীতিমত গুরুতর!

বিমল বললে, 'চোর পালিয়েছে বলে আমি তত দুঃখিত নই, কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে লাউ-ৎজুর ঐ দুর্লভ মূর্তিটা হারিয়ে। হায় হায়, ঐ মূর্তি নিয়েই যে আমি অমৃত-দ্বীপে যাত্রা করব ভেবেছিলুম!'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আপনি খুঁজছেন খালি 'অ্যাডভেঞ্চার', তাই ঐ মূর্তিটার জন্যে শোক করছেন। কিন্তু আমরা হচ্ছি গোয়েন্দা, আমাদের দৃষ্টি কেবল অপরাধীদের দিকেই। আমাদের এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে অপরাধী গেল পালিয়ে, এটা কি কম লজ্জা আর কলঙ্কের কথা?'

কুমার বললে, 'ও লজ্জা-কলঙ্কের কালি আমাদেরও মুখকে কালো করে দেবে জয়ন্তবাবু।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনাদের কোনই লজ্জা নেই, গোয়েন্দাগিরি তো আপনাদের কাজ নয়! আপনারা ব্যাপারটা আর একবার ভালো করে বুঝে দেখুন। এই বাড়িখানার চারিদিকে আর কোন বাড়ি নেই—অন্য ছাদ থেকে কেউ এখানে লাফিয়ে আসতে পারবে না। বাড়ির সদর-দরজা বন্ধ ছিল, দোতলায় রামহরি আর তেতলায় আপনারা ছিলেন সজাগ হয়ে। তার উপরে রাস্তায় আশেপাশে লুকিয়েছিলুম আমরা অনেক লোক। তবু সবাইকে ফাঁকি দিয়ে তেতলায় চোরের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান হল কেমন করে? যদিও এর কোন সদুত্তর পাচ্ছি না, তবু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, চোর যে-উপায়ে তেতলায় উঠেছে, পালিয়েছেও ঠিক সেই উপায়ে। কিন্তু সেই উপায়টা কি? চোরের সহকারীরা যদি পথের গ্যাসগুলো নিবিয়ে না দিত, তা হলে সমস্ত রহস্যই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু অন্ধকারেও আমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি। চোরের আবির্ভাবের সময়ে আমরা সকলেই দেখেছি, এই বাড়ির কাছে শূন্যে দুলছে একটা কালো ছায়া। গোলমাল হবার পরেই কিন্তু সেই আশ্চর্য কালো ছায়াটা আকাশের গায়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম নয়, প্রত্যেক বার চোরের আবির্ভাবের সময়েই ঐ কালো ছায়ার আবির্ভাব হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা চোরের ছায়া নয়, তার আবির্ভাব-অন্তর্ধানের সঙ্গে ঐ ছায়ার একটা যোগ আছে। বিমলবাবু, ঐ ছায়াটাকে আপনার কী বলে মনে হয়?'

বিমল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু সে সন্দেহও যদি সত্য না হয়, তা হলে এ মামলাটাকে অলৌকিক বলে মানতেই হবে।'

হঠাৎ ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। বিমল রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে দিয়েই বললে. 'জয়ন্তবাবু, থানা থেকে সুন্দরবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আপনাকে ডাকছেন।'

জয়ন্ত রিসিভারটা ধরেই শুনলে; সুন্দরবাবু ব্যস্ত ভাবে বলছেন, 'কে, জয়ন্ত? হুম্, ভয়ানক ব্যাপার!'

—'কি ব্যাপার সুন্দরবাবু?'

—'সেই জুজুর মূর্তিটা আমি পেয়েছি!'

—'জুজুর মূর্তি কি আবার?'

—'ঐ জুজু আর লাউ-ৎজু একই কথা। বিদঘুটে নাম, উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়! মূর্তিটা আবার পেয়েছি—সেই যার মাথার দিক গরম আর পায়ের দিক ঠাণ্ডা!'

—'কি আশ্চর্য, কোথায় পেলেন?'

—'বিমলবাবুদের বাড়ির উত্তর দিকের একটা মাঠে। কিন্তু আমি তার চেয়েও অদ্ভুত আরো-একটা মস্ত আবিষ্কার করেছি! হুঁ-হুঁ বাবা, আমি তো তোমাদের মতো শখের গোয়েন্দা নই, চোর ব্যাটা আমার চোখে আর কতদিন ধুলো দিতে পারবে? জয়ন্ত ভায়া, এবারে আমারই জিত!'

—'বেশ, আমি না-হয় হার মানছি। কিন্তু আপনার মস্ত আবিষ্কারটা কি শুনি?'

—'তা হলে ভায়া, তোমাদের স্ব-শরীরে থানায় এসে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে হবে। শীগগির এস, এ-একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার, নাটক-নভেলেও এমন কথা পড়া যায় না! কী কাণ্ড!'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকালের দুর্যোধন

জয়ন্ত টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ফিরে বললে, 'বিমল-বাবু, আশ্চর্য খবর! লাউ-ৎজুর যে মূর্তি আজ চুরি গেছে, ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু এখান থেকে উত্তর-দিকের কোন মাঠে এর-ই মধ্যে সেটা আবার কুড়িয়ে পেয়েছেন!'

বিমল এবং আর আর সকলেই বিস্ময়ে নির্বাক ভাবে তাকিয়ে রইল।

—'কেবল তাই নয়, সুন্দরবাবু আরো কি-একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন, আর তাই দেখবার জন্যে আমাদের সকলকে ডাকছেন।'

বিমল সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলুন, আমরা সবাই তা হলে এখনি সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই।'

পথে বেরিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে নীরব হয়ে রইল। তারপরে মৃদুস্বরে বললে, 'এখান থেকে উত্তর দিকে!…হুঁ, কাল রাতে বাতাস কোন দিকে বয়েছিল, আপনারা কেউ কি তা লক্ষ্য করেছিলেন?'

কুমার বললে, 'দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। কালকে বাতাসের জোরও ছিল খুব বেশি।'

জয়ন্ত পকেট থেকে রূপোর নস্যদানী বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাণিক জানত, এটা হচ্ছে জয়ন্তের অতিরিক্ত খুশির লক্ষণ। নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেই ঘন ঘন নস্য না নিয়ে সে তৃপ্ত হতো না।

মাণিক চুপি চুপি শুধোলে, 'কি হে, বাতাসে আবার কিসের গন্ধ পেলে?'

জয়ন্ত এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে, যেন সে মাণিকের প্রশ্ন শুনতেই পায় নি।

থানার ভিতরে ঢুকে তারা দেখলে, ঘরের মধ্যে সুন্দরবাবু বীর-বিক্রমে পদচারণা করছেন। সকলের সাড়া পেয়েই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এবং তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতির মতো বুক ফুলিয়ে টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

টেবিলে একখানা রঙিন রুমালের উপরে শোয়ানো ছিল জেড-পাথরে গড়া সেই লাউ-ৎজুর মূর্তিটি।

মাণিক খিল্‌খিল্ করে কৌতুক-হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলে।

সুন্দরবাবু খাপ্‌পা হয়ে বললেন, 'হাসলে বড় যে?'

মাণিক বললে, আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন এই মাত্র সূর্যলোক চন্দ্রলোক জয় করে ফিরে আসছেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, সূর্যলোক চন্দ্রলোক জয় করি আর না করি, তোমরা কেউ যা পারো নি, আমি তাই করেছি তো বটে! আমি চোরাই মাল উদ্ধার করেছি—বুঝলে হে, এটা বড় যে-সে কথা নয়! তার উপরেও আরো এমন গুপ্ত রহস্য জানতে পেরেছি—'

হঠাৎ জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'গুপ্ত রহস্যের কথা পরে শুনব। আগে বলুন দেখি, এই মূর্তিটাকে আপনি কোথায়,কেমন করে কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

সুন্দরবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'অবিশ্যি, সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ঐ জুজুর মূর্তিটাকে ঠিক আমি কুড়িয়ে পাই নি। বিমলবাবুদের বাড়ি থেকে খানিক তফাতে উত্তরদিকে আছে একটা মাঠ। সেই মাঠে একটা খুব-উঁচু নারকেল-গাছের তলায় লাল রুমালে জড়ানো এই পুতুলটা পড়েছিল। কনস্টেবল সুন্দর সিং দেখতে পেয়ে এটাকে তুলে এনেছে।'

জয়ন্ত রুমালখানা টেবিলের উপরে ভালো করে বিছিয়ে রেখে পরীক্ষা করতে লাগল। হালকা-লাল-রঙা রেশমের রুমাল, আর

তার এক কোণে একটি ড্রাগনের ছবি আঁকা। এর চেয়ে বেশি কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে সে হতাশভাবে বললে, 'নাঃ, এ রুমাল আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।'

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, এখন বলুন দেখি, আপনি আর কি গুপ্ত রহস্য জানতে পেরেছেন?'

সুন্দরবাবু ভারিক্কে-চালে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হুম্, বাবা! যেখানেই আঁধার-রাতে খুন হয় কি জুজুর মূর্তি চুরি যায়, সেইখানেই সবাই দেখে আকাশ দিয়ে হুস্ করে কালো ছায়া উড়ে গেল! কেউ ভাবে তাকে ভূত, কেউ ভাবে চোখের ভ্রম! কিন্তু আসলে সেটা যে কি, তোমাদের বড় বড় ভারি ভারি মাথা আজও তা ধরতে পারে নি। কনস্টেবল সুন্দর সিং আজ সকালে মাঠের এক নারকেল গাছের তলায় প্রথমে এই জুজুর মূর্তিটা কুড়িয়ে পায়। তারপর উপর পানে তাকিয়ে দেখে—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'সে কি দেখেছিল, হয়তো আমি তা বলতে পারি।'

সুন্দরবাবু অবহেলার হাসি হেসে বললেন, 'হুম্, অসম্ভব! বলবার মিছে চেষ্টা কোরো না জয়ন্ত, বলতে তুমি পারবে না।'

জয়ন্ত বললে, 'কনস্টেবল সুন্দর সিং উপর-পানে তাকিয়ে দেখলে নারকেল গাছে রয়েছে একটা বেলুন!'

ঘরের মধ্যে যারা ছিল সকলেই মহা বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল।

সুন্দরবাবু প্রথমটা থতমত খেয়েই বলে উঠলেন, 'ও, বুঝেছি! আর কারুর মুখ থেকে আগেই সব কথা শুনে নিয়ে এখন বাহাদুরি ফলানো হচ্ছে!'

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, 'মোটেই নয়। আমি আন্দাজে বলেছি।'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আন্দাজ? তুমি প্রায়ই আন্দাজ

করে অসম্ভব সব কথা বল। হুম্, তোমার আন্দাজের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে উঠলুম!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমার আন্দাজি অসম্ভব কথাগুলো তো প্রায়ই সত্য হয় সুন্দরবাবু! এর কারণ কি জানেন? আপনি অসম্ভব ভেবে যা উড়িয়ে দেন, আমি তাকেই নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাই। অপরাধীরা হয়তো বেলুন ব্যবহার করছে, এই সন্দেহটা খানিক আগেই বিমলবাবুর কাছে প্রকাশ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আপনি ফোন করাতে আমি আর বলবার সময় পাই নি। গোড়া থেকেই বার বার আমার সন্দেহ হয়েছে যে, এই সব ঘটনার সঙ্গে অলৌকিক নয়, অসাধারণ কোন কিছুর সম্পর্ক আছে। তখন নিজেকে অপরাধীদের সর্দারের আসনে বসিয়ে এই ভাবে আমি উপায় স্থির করতে লাগলুম। ধরুন, রামবাবুর বাড়িতে আমি চুরি করব। প্রথমে রামবাবুর বাড়ির ভিতরকার 'প্ল্যান' সংগ্রহ করলুম। তারপর যে রাস্তায় রামবাবুর বাস, সেই রাস্তায় বা তার কাছাকাছি কোথাও একটা মাঠ বা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে দু-চার দিনের জন্যে একটা কারখানা স্থাপন করলুম। কারখানায় লুকিয়ে রাখলুম একটা বেলুন। বড় বেলুন নয়, বিশেষভাবে তৈরি এমন একটা ছোট বেলুন, যা মাত্র একজন মানুষকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারপর বেলুনটাকে ব্যবহার করবার জন্যে এমন একটা রাত বেছে নিলুম, যে-রাতে আকাশে চাঁদ নেই, কিংবা মেঘে ঢাকা পড়েছে। গভীর রাতে আমার কারখানায় 'হাইড্রোজেন গ্যাসে'র সাহায্যে বেলুনকে ফুলিয়ে জ্যান্তো করে তোলা হল। তারপর বেলুনকে বাইরে এনে তার ভিতরে লোক বসিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিলুম বটে, কিন্তু মিলিটারি 'বন্দী' বেলুনের মতো তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলুম। এইভাবে ছোট একটা দড়ি বাঁধা বেলুনকে আঁধার রাতে আকাশে উড়িয়ে কলকাতার রাস্তাতেও সকলের অগোচরে মোটরে চড়ে বেশ-খানিক দূর আনা যায়। বেলুনের দড়ি মোটরে লোকের হাতে থাকবে বটে, কিন্তু পথে লোক থাকলেও কেউ

তা দেখবার সময় বা সুবিধা পাবে না। কারণ একে রাত, তায় চলন্ত মোটর, তায় একগাছা সরু লিক্‌লিকে ম্যানিলা দড়ি, যা তিরিশ-চল্লিশ মণ মালের টান সহ্য করতে পারলেও সময়-বিশেষে লোকের চোখে প্রায়-অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার দিন, নির্জন গভীর রাতে মোটরে চেপে দলবল আর বেলুন নিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। একজন লোক আমাদেরও আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তার অনেকগুলো গ্যাস নিবিয়ে দিয়ে রাতের আঁধারকে আরো ঘোরালো করে তুললে। তারপর আমরা অন্ধকারের মধ্যে আরো-নিবিড় অন্ধকারের ছায়ার মতো বেলুনটাকে শূন্যে টেনে যে-বাড়িতে ঘটনা ঘটবে তার কাছে নামিয়ে আনলুম। বেলুনের ভিতরের লোক বাড়ির উপরে নামল, কাজ হাসিল করে আবার বেলুনে চড়ে শূন্যে উঠল, আমরাও দড়ি-বাঁধা উড়ন্ত বেলুন নিয়ে আবার কারখানায় ফিরে এলুম।......

সুন্দরবাবু, এই হচ্ছে আমার অনুমান। কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ আমাদের আবির্ভাবে অপরাধীদের 'প্ল্যান' ওলট-পালট হয়ে যায়। ফলে কি হয়েছে, অনুমানে তাও কিছু-কিছু বলতে পারি। শত্রু যেই ঘরে ঢুকল, বিমলবাবু অমনি দরজা বন্ধ করে বাঁশী বাজালেন। কিন্তু এই শত্রু কেবল শক্তিমান নয়, বিষম চটপটেও বটে! সে বিপদে পড়বামাত্র জানলা ভেঙে বাইরে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে বেলুনে চড়ে অদৃশ্য হয়েছে যে, তার তৎপরতার কথা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়! মোটরের মধ্যে যারা বেলুনের দড়ি ধরে অপেক্ষা করছিল, আচম্‌কা পুলিশের আবির্ভাব দেখে দড়ি ছেড়ে তারা দিলে চম্পট, আর ওদিকে একজন শত্রুকে নিয়ে বেলুনটা শূন্যে উড়ে চলল স্বাধীন ভাবে। কিন্তু বেলুন-বাসী শত্রু তখনো বিপদে পড়ে বুদ্ধি হারায় নি, বেলুন তাকে নিয়ে পাছে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি 'সেফটি ভালভ্‌' বা গ্যাস বেরুবার ছ্যাঁদাটা খুলে দিলে। তখন বাতাস বইছিল উত্তর দিকে, বেলুনটাও 'ভালভ্‌' খুলে দেওয়ার দরুন নীচের দিকে নামতে নামতে উত্তরের মাঠের একটা নারকেল

গাছের টঙে আটকে গেল। তারপর শত্রু গাছ থেকে মাটিতে নেমে পালিয়ে গিয়েছে, আর সেই সময়েই কোন গতিকে লাউ-ৎজুর মূর্তিটা হারিয়ে ফেলেছে। সুন্দরবাবু, আমার বিশ্বাস, বেলুনটা যখন আপনাদের হাতে পড়ে, তখন সে খুব চুপসে গেয়েছিল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একেবারে। বেলুনের লম্বা দড়ি গিয়েছিল নারকেল-গাছের ডালে জড়িয়ে, আর চুপসে গিয়ে সে পড়েছিল ঝুলে। তার ভিতরে গ্যাস-ট্যাস কিছুই ছিল না।'

বিমল হঠাৎ জয়ন্তের হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললে, 'ধন্য জয়ন্তবাবু! আপনার সঠিক অনুমানশক্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখনো আমার সব কথা বলা হয় নি। জানো জয়ন্ত, খবর পেয়ে মাঠে ছুটে গিয়ে কি দেখলুম জানো? নারকেল গাছের তলাকার ঘাস টাটকা রক্তে তখনো ভিজে রয়েছে! রক্তের পরিমাণ দেখে বুঝলুম, নামবার সময়ে অপরাধী নারকেল গাছ থেকে পড়ে গিয়ে বিষম জখম হয়েছে। মনে খুব আহ্লাদ হল, ভাবলুম তা হলে অপরাধীকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হবে না। ঘাসের আর মাটির উপর দিয়ে রক্তের দাগ সমানে চলে গিয়েছে মাঠের মাঝখানকার একটা পুরানো আর ভাঙা কূপের দিকে। কূপের ভিতরে জল অল্প, কিন্তু সেখানে শত্রুর কোন চিহ্নই নেই!'

বিমল বললে, 'রক্তের রেখা কি কূপের কাছে গিয়েই শেষ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'অপরাধী যদি কূপের কাছ থেকে ফিরে আসে, তা হলে রক্তের দুটো রেখা দেখা যাবে।'

—'না, রক্তের রেখা ছিল একটাই।'

—'মাঠের বাইরে রাস্তায় কোন রক্তের দাগ দেখেছেন?'

—'এক ফোঁটাও নয়।'

জয়ন্ত ও বিমল দুজনেই একসঙ্গে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমল উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, অপরাধী তা হলে পালাতে পারেনি। আপনি সেখানে কোন পাহারাওয়ালাকে রেখে এসেছেন কি?'

—'নিশ্চয়! কিন্তু আমি বলছি, অপরাধী সেখান থেকে লম্বা দিয়েছে।'

জয়ন্ত ঘর থেকে ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'তবু আমরা সে-জায়গাটা একবার দেখতে চাই।'

আর-সকলের সঙ্গে সুন্দরবাবুও অগ্রসর হতে হতে অভিমানভরে বললেন, 'হুম্, ঐ-জন্যেই তো আমার দুঃখু হয়! তোমরা আমাকে ভারি বোকা ভাবো! অপরাধী কি মাছি না মশা, যে আমার চোখকে ফাঁকি দেবে?'

মাঠটার আকার হবে প্রায় পনেরো-ষোলো বিঘে। তার চারিদিকে গোটাকয়েক তাল-নারিকেল, অশথ-বট ও আম-জাম প্রভৃতি গাছ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এক জায়গায় একটা ভাঙা কূপও দেখা যাচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, 'নারকেল-গাছের তলাটা পরে দেখব। আগে ঐ কূপের দিকেই যাওয়া যাক।'

কূপের কাছে গিয়েই কুমার বলে উঠল, 'এই যে, কুয়োর পাড়ে ইঁটের ওপরেও শুকনো রক্তের দাগ! অপরাধী তা হলে কুয়োর পাড়েও উঠেছিল।

কূপের ভিতরে উঁকি মেরে নজরে পড়ল, অনেক নীচে কালো জল টল্‌মল করে নড়ছে!

বিমল বললে, 'কুয়োর অত নীচে জল এমন নড়ে কেন? যেন আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে কেউ ওখানে সবে ডুব দিয়েছে!'

কূপের চারিপাশ ঘিরে সবাই তীক্ষ্ণ-চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে প্রায় সাত-আট মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কারুকে দেখা গেল না, চঞ্চল জল ক্রমে স্থির হয়ে এল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখছ জয়ন্ত, এর মধ্যে কেউ নেই ? আট মিনিট ধরে পৃথিবীর কোন মানুষই জলের তলায় দম বন্ধ করে থাকতে পারে না।'

খানিক তফাতেই একগাদা পাঁকাটির উপর কতকগুলো চড়াই পাখি কিচির-মিচির করে ডাকতে ডাকতে ও নাচতে নাচতে খেলা করছিল। সেই দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, জলের তলায় থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার কোন উপায়ই কি নেই ?'

বিমলও যেখানে চড়াই-পাখি খেলা করছিল সেই দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তিন-চারটে বড় বাঁশ আর খানিকটা দড়ি চাই। যাও, শীগগির কেউ নিয়ে এস !'

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহারাওলারা বাঁশ ও দড়ি নিয়ে ফিরে এল।

বিমলের কথামত সবাই মিলে তখনি আর-একটা বাঁশ বেঁধে খুব লম্বা এক লগি তৈরি করে ফেললে। তারপরে সেই লগি-গাছা কূপের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

বিমল বললে, 'জলের তলায় জোরসে মারো খোঁচা। দেখি ওখানে কেউ আছে কি না !'

একটা, দুটো, তিনটে খোঁচা মারবার পরেই, লগি চেপে ধরে জলের উপরে হুস্ করে ভেসে উঠল মস্ত-বড় এক চীনেম্যানের মূর্তি— তার কুতসিত মুখে দুটো কুতকুতে ক্রুদ্ধ চোখ দু-টুকরো আগুনের মতো জ্বলছে !

পর-মুহূর্তেই ঘটল আর এক কাণ্ড। সেই চীনেম্যানটা হঠাৎ কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা ছোরা বার করে নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ আবার ডুবে গিয়ে কূপের সমস্ত জল তোলপাড় ও রক্তে রাঙা করে তুললে !

চীনেম্যানের বিপুল মৃতদেহটা তখন তুলে এনে মাঠে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, 'দেখ মাণিক, যা ভেবেছি তাই! ওর একটা পা কাঠের!'

মাণিক আশ্চর্য স্বরে বলল, 'বাবা, খোঁড়া পায়ের এত বিক্রম!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু উরুভঙ্গের পর দুর্যোধনের মতো, এ ব্যাটা জলের তলায় লুকিয়ে ছিল কি করে?'

জয়ন্ত বললে, 'গাছের উপর থেকে পড়ে গিয়ে লোকটার সর্বাঙ্গ কি-রকম ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, দেখছেন তো? কেবল এইজন্যেই ও এখান থেকে পালাতে পারে নি। কিন্তু লোকটার উপস্থিত-বুদ্ধি যথেষ্ট। যখন দেখলে পালানো সম্ভব নয়, তখনি অদৃশ্য হবার একটা উপায় বার করে ফেললে! ঐ পাঁকাটির গাদা থেকে তাড়াতাড়ি একটা পাঁকাটি টেনে নিয়ে সে জলের ভিতর গিয়ে নামে। তারপর যখনি কারুর সাড়া পেয়েছে, তখনি কুয়োর ধার ধরে জলের তলায় ডুব মেরে, ঐ ফাঁপা পাঁকাটির সামান্য অংশ জলের উপরে জাগিয়ে রেখে, মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালিয়েছে!'

কুমার বললে, 'কিন্তু লোকটা আত্মহত্যা করে আমাদের ভারি ফাঁকি দিলে! এখন ড্রাগন-মার্কা দলের বাকি লোকগুলোর সন্ধান পাওয়া আর সহজ হবে না!'

জয়ন্ত বলেল, 'কুমারবাবু, হয়তো এই লোকটাই হচ্ছে ড্রাগন-মার্কা দলের সর্দার! অন্তত এই লোকটাই যে কলকাতায় তিন-তিনটে নরহত্যা করেছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন শেষ হল বটে, কিন্তু আমার আশা এখনো সফল হয় নি। পূর্ব মহাসাগরে জাহাজ ভাসিয়ে আমি এখন যেতে চাই সেই অমরদের দ্বীপে, যেখানে শত শত অপূর্ব বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে বাঁ-হাত রেখে, মাথার টাকের উপরে ডান-হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'হুম্! আমি সেখানে যেতে রাজি নই।'

প্রথম পরিচ্ছেদ

শত্রুর উপরে শত্রু

জাহাজ ভেসেছে নীল জলে। এ জাহাজ একেবারেই তাদের নিজস্ব।

অমৃত-দ্বীপে যাবার সমস্ত জলপথটাই তাদের ম্যাপে আঁকা ছিল। সেই ম্যাপ দেখেই বোঝা যায়, কোন বাণিজ্য-তরী বা যাত্রী-জাহাজই ও-দ্বীপে গিয়ে লাগে না, 'চার্টে' ও-দ্বীপের কোন উল্লেখই নেই।

কাজেই বিমল ও কুমারের প্রস্তাবে একখানা গোটা জাহাজই 'চার্টার' বা ভাড়া করা হয়েছে। এটাও তাদের পক্ষে নতুন নয়। কারণ এই রকম একখানা গোটা জাহাজ ভাড়া করেই তারা আর একবার 'লস্ট-আটলান্টিস্'-কে পুনরাবিষ্কার করেছিল।

জয়ন্ত, মাণিক ও সুন্দরবাবুর এ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল না। বিমল ও কুমার এক রকম জোর করেই তাদের সঙ্গে টেনে এনেছে।

কাজে-কাজেই তাদের পুরাতন ভৃত্য ও দস্তুরমত অভিভাবক রামহরিও যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেও অন্যান্য বারের মতো এবারেও শেষ পর্যন্ত সঙ্গ নিতে ছাড়ে নি এবং এমন ক্ষেত্রে তাদের চির-অনুগত চতুষ্পদ যোদ্ধা বাঘাও যে সঙ্গে সঙ্গে লাঙুল আস্ফালন করে আসতে ছাড়বে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাদের পুরানো দলের মধ্যে কেবল বিনয়বাবু আর কমলকে এবারে সঙ্গীরূপে পাওয়া গেল না। বিনয়বাবু এখন ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কুইনিন ও আদার কুচির সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত এবং কমল দেবে এবার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা।

জাহাজখানির নাম 'লিট্‌ল্ ম্যাজেস্টিক'। আকারে ছোট হলেও যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এর মধ্যে চমৎকার সাজানো-গুছানো 'লাউঞ্জ', 'ডাইনিং সেলুন', 'প্রমেনেড ডেক' ও 'পাম-কোর্ট' প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। এ-রকম জাহাজ 'চার্টার' করা বহু ব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু বিমল ও কুমার যে অত্যন্ত ধনবান এ-কথা সকলেই জানেন। তার উপরে জয়ন্তও বিনা পয়সায় অতিথি হতে রাজি হয় নি এবং সেও রীতিমত ধনী ব্যক্তি।

জাহাজ তখন টুংহাই বা পূর্বসাগর প্রায় পার হয়ে রিউ-কিউ দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উপরে, নীচে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কেবল অনন্ত নীলিমা—কাছে চঞ্চল, দূরে প্রশান্ত।

এই নীলিমার জগতে এখন নূতন বর্ণ সৃষ্টি করছে নিয়ে শুধু শুভ্র ফেনার মালা এবং শূন্যে শুভ্র সাগর-বিহঙ্গের দল। প্রকৃতির রঙের ডালায় এখন আর কোন রঙ নেই।

প্রাকৃতিক সঙ্গীতেও এখানে নব নব রাগিণীর ঝঙ্কার নেই। না আছে উচ্ছ্বসিত শ্যামলতার মর্মর, না আছে গীতকারী পাখিদের সুরের খেলা, বইছে কেবল হু-হু শব্দে দুরন্ত বাতাস এবং জাগছে কেবল আদিম সাগরের উচ্ছল কল্-কল্ মন্ত্র—এ-দুই ধ্বনিরই সৃষ্টি পৃথিবীর প্রথম যুগে, যখন সবুজ গাছ আর গানের পাখির জন্মই হয় নি।

খোলা 'প্রমেনেড ডেকে'-র উপরে পায়চারি করতে করতে মাণিক বললে, 'আমাদের সমুদ্র-যাত্রা শেষ হতে আরো কত দেরি বিমলবাবু?'

বিমল বললে, 'আর বেশি দেরি নেই। চার ভাগ পথের তিন

ভাগই আমরা পার হয়ে এসেছি। ম্যাপখানা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আরো কিছু দূর এগুলেই বোর্নিন্‌ দ্বীপপুঞ্জের কাছে গিয়ে পড়ব। তাদের বাঁয়ে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে প্রায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকে। তারপরই অমৃত-দ্বীপ।'

মাণিক বললে, 'দ্বীপটি নিশ্চয়ই বড় নয়! কারণ তা হলে নাবিকদের 'চার্টে' তার উল্লেখ থাকত! এখানকার সমুদ্রে এমন অজানা ছোট ছোট দ্বীপ দেখছি তো অসংখ্য। অমৃত-দ্বীপকে আপনি চিনবেন কেমন করে?'

—'ম্যাপে অমৃত-দ্বীপের ছোট্ট একটা নকশা আছে, আপনি কি ভালো করে দেখেন নি? সে দ্বীপের প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তার চারিপাশই পাহাড় দিয়ে ঘেরা—পাহাড় কোথাও কোথাও দেড়-দুই হাজার ফুট উঁচু। তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, দ্বীপের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের উপরে আছে ঠিক পাশাপাশি পাঁচটি শিখর। সব চেয়ে উঁচু শিখরের উচ্চতা দুই হাজার তিনশো ফুট। এ-রকম দ্বীপ দূর থেকে দেখলেও চেনা শক্ত হবে না।'—বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে বিমল চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সমুদ্রের পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্‌! আচ্ছা বিমলবাবু, আমরা যাচ্ছি তো পূর্ব দিকে! অথচ আজ কদিন ধরেই আমি লক্ষ্য করছি, আপনি যখন-তখন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন? এর মানে কি?'

জয়ন্ত এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললে, 'এর মানে আমি আপনাকে বলতে পারি। বিমলবাবু দেখছেন আমাদের পিছনে কোন শত্রু-জাহাজ আসছে কি না!'

—'এখানে আবার শত্রু আসবে কে?'

—'কেন, কলকাতাকে যারা ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছিল, আপনি এরি মধ্যে তাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি?'

—'কী যে বল তার ঠিক নেই! সে দল তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে!'

—'কেমন করে জানলেন?'

—'পালের গোদা কুপোকাৎ হলে দল কি আর থাকে?'

দূরবীণ নামিয়ে বিমল বললে, 'আমার বিশ্বাস অন্য রকম। সে দলের প্রত্যেক লোকই মরিয়া, তারা সকলেই অমৃত-দ্বীপে যাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ও-দ্বীপের ঠিকানা তারা জানে না, কারণ ম্যাপখানা আছে আমাদের হাতে। আমরা যে তাদের দেশের কাছ দিয়ে অমৃত-দ্বীপে যাত্রা করেছি, নিশ্চয়ই এ-সন্ধান তারা রাখে। যারা লাউ-ৎজুর মূর্তি আর ঐ ম্যাপের লোভে সুদূর চীন থেকে বাঙলাদেশে হানা দিতে পেরেছিল তারা যে আর একবার শেষ-চেষ্টা করে দেখবে না, এ-কথা আমার মনে হয় না!'

সুন্দরবাবু বললেন 'হুম্, শেষ-চেষ্টা মানে? আপনি কি বলতে চান, তাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জলযুদ্ধ হবে?'

—'আশ্চর্য নয়।'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে ও উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য নয় মানে? জলযুদ্ধ অমনি হলেই হল? আমাদের সেপাই কোথায়? কামান কোথায়? আমরা ঘুষি ছুঁড়ে লড়াই করব নাকি?'

কুমার হেসে বললে, 'কামান নাই বা রইল, আমাদের সকলের হাতে আছে অটোমেটিক বন্দুক। আর আমাদের সেপাই হচ্ছি আমরাই।'

সুন্দরবাবু অধিকতর উত্তেজিত হয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিকট স্বরে 'হুম্' শব্দ করে মস্ত এক লাফ মেরে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে পড়লেন।

মাণিক বললে, 'কি হল সুন্দরবাবু, কি হল? আপনার ভুঁড়িটা কি ফট করে ফেটে গেল?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'যাও, যাও! দেখতে যেন পাও নি,

আবার ন্যাকামি করা হচ্ছে! কুমারবাবু, আপনার ঐ হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে এবার থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন। আমাকে দেখলেই ও-ব্যাটা কোত্থেকে ছুটে এসে ফোঁস করে আমার পায়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলে কি শোঁকে, বলতে পারেন মশাই?'

মাণিক বললে, 'আপনার পাদপদ্মের গন্ধ বাঘার বোধহয় ভালো লাগে।'—

—'ইয়ার্কি কোরো না মাণিক, তোমার ইয়ার্কি বাঘার ব্যবহারের চেয়েও অভদ্র। ঐ নেড়ে-কুত্তাটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, চললুম আমি এখান থেকে।'

সুন্দরবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হলেন, বাঘা বিলক্ষণ অপ্রতিভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এ লোকটি যে তাকে দু-চোখে দেখতে পারে না, এটা সে খুবই বোঝে। তাই বাঘার কৌতূহল হয়, সুন্দরবাবুকে কাছে পেলেই সে তাঁর পা শুঁকে দেখে। মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করবার এর চেয়ে ভদ্র উপায় পৃথিবীর কোন কুকুরই জানে না।

পরদিন প্রভাতে 'ব্রেকফাস্টে'র পর বিমল ও কুমার জাহাজের ডেকে উঠে গেল। জয়ন্ত লেব্‌লাঁকের লেখা একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস নিয়ে 'লাউঞ্জে' গিয়ে আরাম করে বসল, মাণিকও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে।

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, 'জাহাজে উঠে পর্যন্ত দেখছি, বিমলবাবু আর কুমারবাবু অদৃশ্য শত্রুর কাল্পনিক ছায়া দেখবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, আর তোমরা গাঁজাখুরি ডিটেক্‌টিভের গল্প নিয়েই বিভোর! কারুর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবার ফাঁক নেই!'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। মাণিক বললে, 'আচ্ছা, এই রইল আমার বই! এখন প্রকাশ করুন আপনার প্রাণের কথা।'

সুন্দরবাবু নিম্নস্বরে বললেন, 'কথাটা কি জানো? এই অমৃত-

দ্বীপ, অমর-লতা, জলে-স্থলে-শূন্যে চিরজীবী মানুষের অবাধ গতি,—এ-সব কি তুমি বিশ্বাস কর ভায়া ?'

—'আমার কথা ছেড়ে দিন। আগে বলুন, আপনার কি মত ?'

—'হুম্, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে ! বিমল আর কুমারবাবুর মাথায় তোমাদের চেয়েও বোধহয় বেশি ছিট আছে !'—বলেই সুন্দর-বাবু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—'হঠাৎ অমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন ?'

—'কি জানো ভায়া, প্রথমটা আমার কিঞ্চিৎ লোভ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সবই ভূয়ো ! যা নয় তাই !'

—'কিসের লোভ সুন্দরবাবু ?'

—'ঐ অমর-লতার লোভ আর কি ! ভেবেছিলুম দু-একটা অমৃত-ফল খেয়ে যমকে কলা দেখাব। কিন্তু এখন যতই ভেবে দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমরা ছুটেছি মরীচিকার পিছনে, কেবল কাদা ঘেঁটেই ফিরে আসতে হবে।'

—'তা হলে আপনি কেবল অমর হবার লোভেই বিমলবাবুদের অতিথি হয়েছেন ?'

—'না বলি আর কেমন করে ? অমর হতে কে না চায় ?'

—'অমর হওয়ার বিপদ কত জানেন ?'

—'বিপদ ?'

—'হ্যাঁ। দু-একটার কথা বলি শুনুন। ধরুন, আপনি অমর হয়েছেন। তারপর কুমারবাবুর কুকুর বাঘা হঠাৎ পাগল হয়ে আপনাকে কামড়ে দিলে। তখন কি হবে ?'

—'হুম্, কী আবার হবে ? আমি হাইড্রোফোবিয়া রোগের চিকিৎসা করাব !'

—'চিকিৎসায় রোগ যদি না সারে, তা হলে ? আপনি অমর, সুতরাং মরবেন না। কিন্তু সারা-জীবন—অর্থাৎ অনন্তকাল আপনাকে ঐ বিষম রোগের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।—অর্থাৎ সারা-জীবন

চেঁচিয়ে মরতে হবে পাগলা কুকুরের মতন ঘেউ-ঘেউ করে !

—'তাই তো হে, এ-সব কথা তো আমি ভেবে দেখি নি !'

—'তারপর শুনুন। আপনি অমর হলেও আপনার দেহ বোধ করি অস্ত্রে অকাট্য হবে না। কেউ যদি খাঁড়া দিয়ে আপনার গলায় এক কোপ বসিয়ে দেয়, তা হলে কি মুসকিল হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি ? আপনি অমর। অতএব হয় আপনার মুণ্ড, নয় আপনার দেহ, নয়তো ও-দুটোই চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু সেই কন্ধকাটা দেহ আর দেহহীন মুণ্ড নিয়ে আপনি অমরতার কি সুখ ভোগ করবেন ?'

—'মাণিক, তুমি কি ঠাট্টা করছ ?'

—'মোটেই নয় ! অমর হওয়ার আরো সব বিপদের কথা শুনতে চান ?'

—'না, শুনতে চাই না। তুমি বড্ড মন খারাপ করে দাও। অমৃত-ফল পেলেও আমি আর খেতে পারব কিনা সন্দেহ।'

জয়ন্ত এতক্ষণ কেতাবের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। এখন কেতাব সরিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, অমৃত-দ্বীপের কথা হয়তো রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকের শুকনো বৈজ্ঞানিক জগতে সরস রূপকথার বড়ই অভাব হয়েছে। সেই অভাব-পূরণের কৌতূহলেই আমরা বেরিয়েছি অমৃত-দ্বীপের সন্ধানে। সুতরাং অমর-লতা না পেলেও আমরা দুঃখিত হবো না। অন্তত যে কদিন পারি রূপকথার রঙিন কল্পনায় মনকে স্নিগ্ধ করে তোলার অবকাশ তো পাব ! আর ওরই মধ্যে থাকবে যেটুকু অ্যাডভেঞ্চার, সেটুকুকে মস্ত বলেই মনে করব !'

এমন সময়ে একজন নাবিক এসে খবর দিলে, বিমল সবাইকে এখনি ডেকের উপরে যেতে বলেছে।

সকলে উপরে গিয়ে দেখলে, ডেকের রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখে দূরবীণ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'বিমলবাবু কি আমাদের ডেকেছেন?'

বিমল ফিরে বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু! পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

পশ্চিম দিকে চেয়েই জয়ন্ত দেখতে পেলে, একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে এগিয়ে আসছে।

বিমল বললে, 'আমি খুব ভোরবেলা থেকেই ও-জাহাজখানাকে লক্ষ্য করছি। প্রথমটা ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয় নি। কিন্তু তারপরে বেশ বুঝলুম, ও-আসছে আমাদেরই পিছনে। জানেন তো, এখানকার সমুদ্রে চীনে-বোম্বেটেদের কি-রকম উৎপাত! খুব সম্ভব, আমাদের শত্রুরা কোন বোম্বেটে-জাহাজের আশ্রয় নিয়েছে। দূরবীণ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও-জাহাজখানায় লোক আছে অনেক—আর অনেকেরই হাতে রয়েছে বন্দুক। আমাদের কাপ্তেন-সাহেবের সঙ্গে আমি আর কুমার পরামর্শ করেছি। কাপ্তেন-সাহেব বললেন, জলে ওরা আক্রমণ করলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে না।'

—'তা হলে উপায়?'

—'দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

দক্ষিণ দিকে মাইল দুয়েক তফাতে রয়েছে ছোট্ট একটি তরুশ্যামল দ্বীপ।

—'আমরা আপাতত ঐ দ্বীপের দিকেই যাচ্ছি। আশা করি শত্রুদের জাহাজ আক্রমণ করবার আগেই আমরা ঐ দ্বীপে গিয়ে নামতে পারব। তারপর পায়ের তলায় থাকে যদি মাটি, আর একটা যুৎসই স্থান যদি নির্বাচন করতে পারি, তা হলে এক হাজার শত্রুকেও আমি ভয় করি না। আপনার কি মত?'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, এ অভিযানের নায়ক হচ্ছেন আপনি, আমরা আপনার সহচর মাত্র। আপনার মতেই আমাদের মত।'

সুন্দরবাবু নীরস স্বরে বললেন, 'তা হলে সত্যি-সত্যিই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে?'

কুমার বললে, 'তা ছাড়া আর উপায় কি? বিনা যুদ্ধে ওরা আমাদের মুক্তি দেবে বলে বোধ হয় না। তবে আশার কথা এই যে, আমরা ওদের আগেই ডাঙায় গিয়ে নামতে পারব।'

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, 'এর মধ্যে আশা করবার মতো কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঐ চীনে বোম্বেটে-ব্যাটারাও তো দলে দলে ডাঙায় গিয়ে নামবে?'

—'ভুলে যাবেন না, আমরা থাকব ডাঙায়, গাছপালা বা ঢিপি-ঢাপা বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। আমাদের এই অটোমেটিক বন্দুকগুলোর সুমুখ দিয়েই নৌকোয় করে ওদের ডাঙার উপরে উঠতে হবে। আমাদের এক-একটা অটোমেটিক বন্দুক প্রতি মিনিটে কত গুলি বৃষ্টি করতে পারে জানেন তো? সাতশো! আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত মারণাস্ত্র!'

সুন্দরবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু এ-ভাবে মানুষ খুন করে শেষটা আইনের পাকে আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে না তো?'

কুমার হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, এ জায়গা হচ্ছে অরাজক। এই বোম্বেটেদের জল-রাজ্যে একমাত্র আইন হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো।'

সুন্দরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম্!'

বিমল তখন আবার চোখে দূরবীণ লাগিয়ে শত্রু-জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে আর দূরবীণের দরকার হয় না। খালি চোখেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তার ডেকের উপরে দলে দলে চীনেম্যান ব্যস্ত, উত্তেজিত ভাবে এদিকে ওদিকে আনাগোনা বা ছুটাছুটি করছে!

হঠাৎ বিমল দূরবীণ নামিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। তার মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি ভয়-চকিত।

বিমলের মুখ-চোখে ভয়ের চিহ্ন! এটা যে অসম্ভব! কুমার রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, 'কি হল বিমলবাবু, আপনার মুখ চোখ

অমনধারা কেন ?'

বিমল দূরবীণটা জয়ন্তের হাতে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'শত্রু জাহাজের পিছনে চেয়ে দেখুন, বোম্বেটেদের চেয়েও ভয়াবহ এক শত্রু আমাদের গ্রাস করতে আসছে! আমি এখন 'ব্রিজে'র ওপরে কাপ্তেনের কাছে চললুম, আরো তাড়াতাড়ি ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠতে না পারলে আর রক্ষা নেই!'

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন,'বোম্বেটের চেয়েও ভয়াবহ শত্রু ? ও বাবা, বলেন কি ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দরবাবু! এমন আর এক শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে, যার নামে ভয়ে কাঁপে সারা দুনিয়া! তার সামনে আমাদের অটোমেটিক বন্দুকও কোন কাজে লাগবে না!'—এই বলেই বিমল জাহাজের 'ব্রিজে'র দিকে ছুটল দ্রুতপদে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর সাগর-স্নান

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে জয়ন্ত যা দেখলে তা ভয়াবহই বটে !

বোম্বেটেদের জাহাজেরও অনেক পিছনে—বহু দূরে, আকাশ ও সমুদ্রের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। নীচে বিপুল মাথানাড়া দিয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, উন্মত্ত, বৃহৎ তরঙ্গের পর তরঙ্গ—বলা চলে তাদের পর্বত-প্রমাণ! তারা লাফিয়ে উপরে উঠছে, আবার নামছে এবং ঘুরপাক খেতে খেতে ফেনায় ফেনায় সেখানকার নীলিমাকে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে এগিয়ে আসছে উল্কার মতন তীব্রগতিতে! উপরে আকাশেরও রঙ হয়ে গেছে কালো মেঘে মেঘে ঘোরা-রাত্রির মতই অন্ধকার! বেশ বোঝা যায় জেগে উঠেছে সেখানে সর্বধ্বংসী আকস্মিক
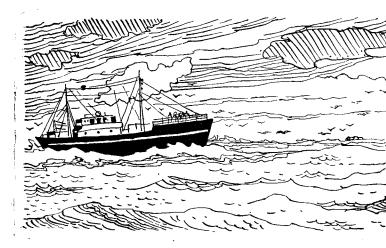
কিন্তু সে জাহাজ তখন এত কাছে

ঝঞ্ঝাবায়ু—যার মস্তকান্দোলনে দিকে দিকে ঠিকরে পড়ছে বাঁধন-হারা নিকষ-কালো মেঘের জটা এবং ঘন ঘন পদাঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে উথলে উঠছে তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র !

ফিরে দাঁড়িয়ে অভিভূত স্বরে জয়ন্ত বললে, 'টাইফুন ?'

কুমার খালি-চোখেই সেদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমরা যাকে বলি ঘূর্ণাবর্ত।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু আমাদের এখানে তো একটুও বাতাস নেই, অসহ্য উত্তাপে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে !'

কুমার বললে, 'ও-সব টাইফুনের পূর্ব-লক্ষণ। এ অঞ্চলে টাইফুন জাগবার সম্ভাবনা ঐ লক্ষণ থেকেই জানা যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, সমুদ্রযাত্রা আমার এই প্রথম, এর আগে টাইফুন কখনো দেখি নি। কিন্তু শুনেছি চীনা-সমুদ্রে টাইফুনের পাল্লায় পড়ে ফি বৎসরেই অনেক জাহাজ অতলে তলিয়ে যায়।'

—'সেইজন্যই তো ওকে আমরা বোম্বেটেদের চেয়েও ভয়ানক বলে
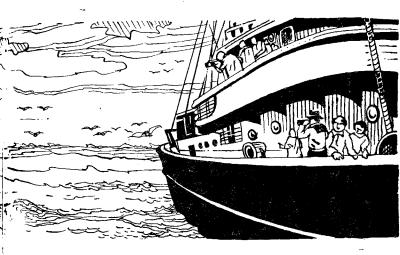
এসে পড়েছে যে আর দূরবীণের দরকার হয় না।

মনে করছি! বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। এখন আমাদের একমাত্র আশা ঐ দ্বীপ। যদি টাইফুনের আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি! হয়তো পারবও, কারণ আমরা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। এই দেখুন, আমাদের জাহাজের গতি আরো বেড়ে উঠেছে!'

এতক্ষণ সুন্দরবাবু ছিলেন ভয়ে হতভম্বের মতো। এইবারে মুখ খুলে তিনি বলে উঠলেন, 'হুম্! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজ এখনো দূরে রয়েছে, সে কি টাইফুনকে ফাঁকি দিতে পারবে?'

কুমার বললে, 'ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

মাণিক বললে, 'কি আশ্চর্য দৃশ্য! সমুদ্রের আর সব দিক শান্ত, কেবল একদিকেই জেগেছে নটরাজের প্রলয়-নাচন!'

কুমার বললে, 'সাধারণ 'সাইক্লোনে'র মতো টাইফুন বহু দূর ব্যাপে ছোটে না, ঐটেই তার বিশেষত্ব! কিন্তু ছোট হলেও তার জোর ঢের বেশি—যেটুকু জায়গা জুড়ে আসে, তার ভিতরে পড়লে আর রক্ষে নেই!'

দূর থেকে 'মেগাফোনে' বিমলের উচ্চ কণ্ঠস্বর জাগল—'কুমার, সবাইকে নিয়ে তুমি ডাঙায় নামবার জন্যে প্রস্তুত হও! কেবল নিতান্ত দরকারি জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও।'

সবাই কেবিনের দিকে ছুটল। তারপর তাড়াতাড়ি কতকগুলো ব্যাগ ভর্তি করে আবার তারা যখন ডেকের উপরে এসে দাঁড়াল, দ্বীপ তখন একেবারে তাদের সামনে।

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'সমুদ্র যে এখানে প্রকাণ্ড এক নদীর মতো হয়ে দ্বীপের ভিতর ঢুকে গিয়েছে! এ যে এক অস্বাভাবিক বন্দর!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, আমাদের জাহাজও এই বন্দরে ঢুকছে।'

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, 'জয় মা কালী! আমরা বন্দরে আশ্রয় পেয়েছি!'

মাণিক বললে, 'হ্যাঁ, আরো ভালো করে মা-কালীকে ডাকুন সুন্দরবাবু! কারণ তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবী, আর বোম্বেটেরাও এই বন্দরে আসছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই।'

সুন্দরবাবু দুই হাত জোড় করে মা-কালীর উদ্দেশে চক্ষু মুদে তিনবার প্রণাম করে বললেন, 'মাণিক, এ-সময়ে আর ভয় দেখিও না, মা-জগদম্বাকে একবার প্রাণ ভরে ডাকতে দাও।'

কুমার ফিরে দেখলে, শত্রুরা দ্বীপ লক্ষ্য করে প্রাণপণে জাহাজ চালিয়েছে এবং দূরে তার দিকে বেগে তাড়া করে আসছে সাগরতরঙ্গ তোলপাড় করে মূর্তিমান মহাকালের মতো সুভীষণ ঘূর্ণাবর্ত!

দ্বীপের ভিতরে ঢুকে সমুদ্রের জল আবার মোড় ফিরে গেছে, কাজেই জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে মোড় ফিরলে। তখন দ্বীপের বন জঙ্গল ঠিক যবনিকার মতোই বাহির-সমুদ্র, ঘূর্ণাবর্ত ও বোম্বেটে-জাহাজের সমস্ত দৃশ্য একেবারে ঢেকে দিলে।

এমন সময়ে বিমল দৌড়ে সকলের কাছে এসে বললে 'জয়ন্তবাবু, কাপ্তেন-সাহেব বললেন এখানকার জল গভীর নয়, জাহাজ আর চলবে না। নাবিকরা নৌকোগুলো নামাচ্ছে, আমাদেরও জাহাজ থেকে নামতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন 'কেন?'

—'বোম্বেটেরাও এখানে আসছে, তারা আমাদের চেয়ে দলে ঢের ভারি। আমরা ডাঙায় না নামলে তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারব না।'

সুন্দরবাবু আবার মুষড়ে পড়ে বললেন, 'তা হলে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে?'

—'নিশ্চয়! টাইফুন আর বোম্বেটে—আমাদের এখন যুদ্ধ করতে হবে দুই শত্রুর সঙ্গে! ঐ দেখুন, 'সেলর'রা এরি মধ্যে 'লাইফ-বোট'

ভাসিয়ে ফেলেছে। ঐ শুনুন, 'মেগাফোনে' কাপ্তেন-সাহেবের গলা!' তিনি আমাদের নৌকোয় তাড়াতাড়ি নামতে বলছেন—নইলে ঝোড়ো ঢেউ এখানেও এসে পড়তে পারে! চলুন, আর দেরি নয়। রামহরি তুমি, বাঘাকে সামলাও!'

লাইফ-বোট যেখানে থামল, সেখানে জলের ধার থেকেই একটি ছোট্ট পাহাড় প্রায় একশো ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে।

বিমল বললে, 'এইখানেই বন্দুক নিয়ে আমরা সবাই পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করব। বোম্বেটেরা আমাদের বন্দুক এড়িয়ে নিতান্তই যদি ডাঙায় এসে নামে তা হলে অবস্থা বুঝে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত এই পাহাড়টাই হবে আমাদের দুর্গ। কি বল কুমার, কি বলেন জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত বললে, 'সাধু প্রস্তাব। কিন্তু বিমলবাবু, একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছেন?'

—'হুঁ, ঝোড়ো বাতাসের গোঁ-গোঁ হু-হু সমুদ্রের হুঙ্কার!'

কুমার বললে, 'কেবল তাই নয়—দূর থেকে যেন অনেক মানুষের কোলাহলও ভেসে আসছে!'

রামহরি বললে, 'এতক্ষণ চারিদিক গুমোট করে ছিল, এখন জোর হাওয়ায় এখানকার গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে!' ঝড় বোধহয় এল!'

মাণিক বললে, 'ঝড় এল, কিন্তু বোম্বেটে-জাহাজ কোথায়?'

সুন্দরবাবু বললেন, হুম্!'

বাঘা বললে, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

বিমল বললে, 'তবে কি বোম্বেটেগুলো ঝড়ের খপ্পরেই পড়ল? দাঁড়াও, দেখে আসি'—বলেই সে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

রামহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'ওপরে উঠ না খোকাবাবু, ওপরে উঠ না! !বেশি ঝড় এলে উড়ে যাবে!'

কিন্তু বিমল মানা মানলে না। পাহাড়ের প্রায় মাঝ-বরাবর উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে এক দিকে তাকিয়ে সে চমৎকৃত স্বরে বললে, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য! কুমার, কুমার শীগগির দেখে যাও।'

বিপুল কৌতূহলে সবাই দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল—একমাত্র সুন্দরবাবু ছাড়া। তাঁর বিপুল ভুঁড়ি উর্ধ্বমার্গের উপযোগী নয়।

বাস্তবিকই সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। যে বিষম টাইফুনের ভয়ে তারা সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, সে-ভয়ঙ্কর দ্বীপের দিকে না এসে যেন পাশ কাটিয়েই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে অন্য দিকে হুহু করে! দ্বীপের দিকে এসেছে খানিকটা উদ্দাম হাওয়ার ঝটকা মাত্র, কিন্তু টাইফুন নিজে যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার শূন্যে দুলছে নিরন্ধ্র অন্ধকার—নীচে কেবল অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে রুদ্র সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গদলের হিন্দোলা! আর ভেসে ভেসে আসছে প্রমত্ত ঘূর্ণাবর্তের বিকট চিৎকার, গম্ভীর জল-কল্লোল, বহু মানব-কণ্ঠের আর্তনাদ!

কুমার অভিভূত স্বরে বললে, 'এমন বিচিত্র ঝড় আর কখনো দেখি নি! কিন্তু বোম্বেটেদের জাহাজখানা কোথায় গেল?'

বিমল বললে, 'ওখানকার অন্ধকার ভেদ করে কিছুই দেখবার উপায় নেই! তবে মানুষের গোলমাল শুনে বোধ হচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও কোথায় ছুটে চলেছে, হয়তো সমুদ্র এখনি তাকে গিলে ফেলবে!'

রামহরি সানন্দে বললে, 'জয় বাবা পবনদেব! আজ তুমিই আমাদের সহায়!'

খানিকক্ষণ পরেই চারিদিক আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—শূন্যে নেই অন্ধ মেঘের কালিমা, সমুদ্রে নেই বিভীষণের তাণ্ডবলীলা। একটু আগে কিছুই যেন হয় নি, এমনি ভাবেই মুখর নীলসাগর আবার বোবা নীলাকাশের কাছে আদিম যুগের জীবহীনা ধরিত্রীর পুরাতন গল্প-বলা শুরু করলে।

সূর্য সাগর-স্নানে নেমে অদৃশ্য হল, কিন্তু আকাশ আর পৃথিবীতে এখনো আলো যেন ধরছে না! দূর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি ফিরে আসছে দ্বীপের দিকে।

পাহাড়ের উপরে বসে সবাই বিশ্রাম করছিল। সেখান থেকে দ্বীপটিকে দেখাচ্ছে চমৎকার পরীস্থানের মতো। নানাজাতের গাছেরা সেখানে সঙ্গীতময় সবুজ উৎসবে মেতে আছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাম্-জাতীয় গাছেরাই।

কোথাও পাহাড়ের আনন্দাশ্রুধারার মতো ঝরে পড়ছে ঠিক যেন একটি খেলাঘরের ঝরনা। রূপালী ফিতার মতো শীর্ণ সকৌতুকে পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসেছে নীচেকার সুন্দরশ্যাম জমির উপরে—যেখানে শ্যামলতাকে সচিত্র করে তুলেছে রঙ-বেরঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলের দল। খানিক পরেই রাত হবে, তারার সভায় চাঁদ হাসবে, আর নতুন জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলো মেখে স্বপ্নবালারা আসবে যেন সেই ফুলদার ঘাস-গালিচার উপরে বসে ঝরনার কলগান শুনতে।

বিমল এই সব দেখতে দেখতে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'শহর আর সভ্যতা ছেড়ে পৃথিবীর যেখানেই যাই সেখানেই দেখি, রেখায় রেখায় লেখা আছে সৌন্দর্যের কবিতা। শহরে বসে হাজার টাকা খরচ করে যতই 'ড্রয়িং রুম্' সাজাও, কখনোই জাগবে না সেখানে রূপের এমন ঐশ্বর্য, লাবণ্যের এত ছন্দ! শহরে বসে আমরা যা করি তা হচ্ছে আসল সৌন্দর্যের 'ক্যারিকেচার' মাত্র, কাগজের ফুলের মতোই অসার! তাই তো আমি যখন-তখন কুতসিত শহর আর কপট সভ্যতাকে পিছনে ফেলে ছুটে যেতে চাই সৌন্দর্যময় অজানা বিজনতার ভিতরে। রামহরি জানে, আমরা দুরন্ত ডানপিটে, খুঁজি খালি অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তুমি জানো কুমার, এ কথা সত্য নয়! চোখের সামনে রয়েছে এই যে অপরূপের নাট্যশালা, আমাদের কল্পনা কি এখানে অভিনয় করতে ভালোবাসে না? আমরা কি কেবল

ঘুষোঘুষি করতে আর বন্দুক ছুঁড়তেই জানি, কবিতা পড়তে পারি না ?'

কুমার বললে, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানো বিমল ! ঐ ফুলের বনে, ঐ ঝরনার ধারে একখানি পাতার কুঁড়েঘর গড়ে সত্যিকার কবির জীবন যাপন করি ! চারিদিকে বনের গান, পাখির তান, বাতাসের ঝঙ্কার, মৌমাছির গুঞ্জন, ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির রঙের খেলা, দিনে মাঠে মাঠে রোদের কাঁচা সোনা, রাতে গাছে গাছে চাঁদনীর ঝিলি-মিলি, আর এরি মধ্য থেকে সর্বক্ষণ শোনা যায় অনন্ত সমুদ্রের মুখে মহাকাব্যের আবৃত্তি ! কলকাতার পায়রার খোপে আর আমার ফিরতে ইচ্ছে করে না !'

জয়ন্ত বললে, 'পৃথিবীকে আমার যখন বড় ভালো লাগে তখন আমি চাই বাঁশী বাজাতে ! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমার সঙ্গে আছে বাঁশীর বদলে বন্দুক। বন্দুকের নল থেকে তো গান বেরোয় না, বেরোয় কেবল বিষম ধমক।'

মাণিক বললে, 'কেন জয়ন্ত. খুশি হলেই তো তুমি আর একটি জিনিস ব্যবহার কর ! নস্যির ডিবেটাও কি তুমি সঙ্গে আনো নি ?'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ মাণিক, নস্যির ডিবেটা আমার পকেটেই আছে। কিন্তু কবিতা কোনদিন ডিবের ভেতরে নস্যির সঙ্গে বাস করে না। আজ আমাদের সামনে দেখছি যে মূর্তিমান সঙ্গীতকে, তার নাচের ছন্দ জাগতে পারে কেবল আমার বাঁশীর মধ্যেই।'

সুন্দরবাবু ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে দোদুল্যমান ভুঁড়ির বিদ্রোহিতাকে আমলে না এনেই পাহাড়ের উপরে উঠে এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের কবিত্ব চর্চা আর তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না, বিরক্ত স্বরে বললেন, 'হুম্ ! পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে গাছগুলো নড়ে-চড়ে শব্দ করছে, কতকগুলো পাখি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে, আর মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, এ-সব নিয়ে এত বড় বড় কথার কিচ্ছু মানে হয় না। চল হে রামহরি, আমরা সরে পড়ি !'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু যাবেন কোথায়? জাহাজে?'

—'না। গরমে ছুটোছুটি করে শরীরটা কেমন এলিয়ে পড়েছে, এখানকার পাহাড়ের তলায় সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে বেশি ঢেউ নেই দেখছি। একটু সমুদ্র-স্নান করবার ইচ্ছে হয়েছে। রামহরি কি বল?'

রামহরি বললে, 'বেশ তো, চলুন না! আমিও একবার চান করে নেই-গে। আয় রে বাঘা!'

—'কিন্তু তোমার বাঘাকে আগে আগে যেতে বল রামহরি, নইলে ও আবার হয়তো আমার পা শুঁকতে আসবে।'

রামহরি বললে, 'বাঘা, সাবধান! আবার যেন আমাদের সুন্দরবাবুর সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করতে যেও না। যাও, এগিয়ে যাও।'

বাঘার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল না যে, সুন্দরবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে তার মনে আর কিছুমাত্র বাসনা আছে। কিন্তু সে রামহরির কথা বুঝে ল্যাজ উঁচু করে আগের দিকে দিলে লম্বা এক দৌড়।

রামহরির সঙ্গে সুন্দরবাবু যখন পাহাড় থেকে নেমে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের আলো তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে।

রামহরি বললে, 'শীগগির দুটো ডুব দিয়ে নিন, আলো থাকতে থাকতেই আমাদের আবার জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে।'

—'কিছু ভয় নেই রামহরি, আজ পূর্ণিমা। আজ অন্ধকার জব্দ!'

—'ঐ শুনুন, কু দিয়ে জাহাজ আমাদের ডাকছে! ঐ দেখুন, পাহাড়ের ওপর থেকে ওঁরা সবাই নেমে আসছেন!'

সুন্দরবাবু জলের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, 'বাঃ, তোমাদের বাঘা দেখছি যে দিব্যি সাঁতার কাটছে! আমিও একটু সাঁতার দিয়ে নি! কি চমৎকার ঠাণ্ডা জল! দেহ যেন জুড়িয়ে গেল!'

জল কেবল ঠাণ্ডা নয়, নীলিমা-মাখানো সুন্দর, স্বচ্ছ। তলাকার প্রত্যেক বালু-কণাটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—এখানকার জলের মধ্যে কোনই অজানা রহস্য নেই। কাজেই সুন্দরবাবু মনের সুখে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন।

দূর থেকে মাণিক চিৎকার করে বললে, 'উঠে আসুন সুন্দরবাবু, অত আর সাঁতার কাটতে হবে না! এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে!'

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, 'হুম্, কি বললে? হাঙর? তাই তো হে, এ-কথা তো এতক্ষণ মনে হয় নি! বাব্বাঃ! দরকার নেই আমার সাঁতার কেটে!'—তিনি তীরের দিকে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলেন জলের ভিতর থেকে প্রাণপণে কে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলে!

—'ওরে বাবা রে, হুম্—হুম্। হাঙর, হাঙর। জয়ন্ত, মাণিক, রামহরি! আমাকে হাঙরে ধরেছে—হু-হু-হু-হু-হুম্!'

রামহরি একটু তফাতে ছিল। কিন্তু সেইখান থেকেই সে স্তম্ভিত নেত্রে দেখতে পেলে যে, সুন্দরবাবুর দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, সুদীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি!

সুন্দরবাবু পরিত্রাহি চিৎকার করে বললেন, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! হাঙর নয়, এ যে একটা মানুষ! এ যে মড়া! ওরে বাবা, এ যে ভূত! এ যে আমাকে জলের ভিতরে টানছে—ও জয়ন্ত, ও মাণিক!'

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিক তীরের মতো পাহাড় থেকে নেমে এল। ভূতের নামে রামহরি একবার শিউরে উঠল বটে, কিন্তু তখন সে দুর্বলতা সামলে নিয়ে বেগে সাঁতার কেটে সুন্দরবাবুর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সর্বাগ্রে সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে পড়ল বাঘা—তার দুই চক্ষু জ্বলছে তখন তীব্র উত্তেজনায়!

—'আর পারছি না, একটা জ্যান্তো মড়া আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—বাঁচাও!'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবন্ত মৃতদেহ

—'ডুবে মলুম, ডুবে মলুম, বাঁচাও!'—সুন্দরবাবু আবার একবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

তিনি বেশ অনুভব করলেন, দু-খানা অস্থিচর্মসার, কিন্তু লোহার মতন কঠিন এবং বরফের মতন ঠাণ্ডা-কন্‌কনে বাহু তাঁকে জড়িয়ে ধরে পাতালের দিকে টানছে, ক্রমাগত টানছে!

দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারলেন না বটে, কিন্তু আবছা-আবছা যেটুকু দেখতে পেলেন তাই-ই হল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। সে হচ্ছে একটা মৃত মানুষের—জীবন্ত মূর্তি, আর তার চোখ দুটো হচ্ছে মরা মাছের মতো।

রামহরি দু-হাতে জল কেটে এগুতে এগুতে সভয়ে দেখলে, 'হুম্' বলে বিকট এক চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবু হুস করে ডুবে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে বাঘাও দিলে জলের তলায় ডুব।

ওদিকে বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিকও তত্ক্ষণে জলে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু তাদের আর বেশিদূর এগিয়ে আসতে হল না, হঠাৎ দেখা গেল সুন্দরবাবু আবার ভেসে উঠে প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে আসছেন। বাঘাও আবার ভেসে উঠেছে!

রামহরি খুব কাছে ছিল। সে দেখতে পেলে, জলের উপরে খানিকটা রক্তের দাগ এবং বাঘার মুখও রক্তাক্ত।

ব্যাপারটা বুঝে তারিফ করে সে বললে, 'বাহাদুর বাঘা, বাহাদুর।'

কিন্তু সেই আশ্চর্য ও অসম্ভব মূর্তিটার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সকলে ডাঙার উপরে উঠল। সুন্দরবাবু আর রামহরি ও বাঘা

ছাড়া সে বিকট মূর্তিটাকে আর কেউ দেখে নি সুতরাং আসল ব্যাপারটাও কেউ বুঝতে পারলে না।
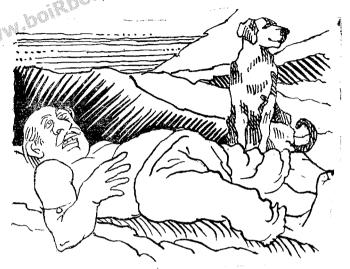
বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সুন্দরবাবু
হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মতো

বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সুন্দরবাবু হাঁপাতে লাগলেন হাপরের মতো।

বিমল জিজ্ঞাসা করলে, 'সুন্দরবাবু, আপনাকে কি হাঙরে ধরেছিল?'

কুমার বললে, 'না বিমল, তা হতে পারে না। হাঙরে ধরলে উনি অমন অক্ষত দেহে ফিরে আসতেন না।'

বিমল বললে, 'হুঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু তবে কে ওঁকে জলের ভেতর আক্রমণ করতে পারে?'

সুন্দরবাবু বেদম হয়ে খালি হাঁপান। এখন তাঁর একটা 'হুম' পর্যন্ত বলবার শক্তি নেই। বাঘা গম্ভীর মুখে এসে সুন্দরবাবুর সর্বাঙ্গ

শুঁকে বোধহয় পরীক্ষা করে দেখলে যে, তাঁর দেহ অটুট আছে কি না! পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হল, কারণ ঘন ঘন ল্যাজ নেড়ে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'এখানে জলের ভেতরে অক্টোপাস থাকে না তো?'

রামহরি বললে, 'কি বললেন?'

—'অক্টোপাস।'

—'তাকে কি মানুষের মতন দেখতে?'

—'মোটেই নয়। তোমাকে কতকটা বোঝাবার জন্যে বরং বলা যায়, তাকে দেখতে অনেকটা বিরাট ও অদ্ভুত মাকড়সার মতো। সমুদ্রের জলে তারা লুকিয়ে থাকে আর আটখানা পা দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধরে মাংস-রক্ত শুষে খায়!'

—'না বাবু, না! আপনি যে কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের কথা বললেন নিশ্চয়ই সেটা ভয়ানক, কিন্তু সুন্দরবাবুকে যে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে দেখতে মানুষের মতো।'

বিমল হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'কি যে বল রামহরি! মানুষ কি জলচর জীব? জলের ভিতর থেকে আক্রমণ করে সে কি এতক্ষণ ধরে জলের তলাতেই ডুব মেরে বসে থাকতে পারে?'

মাণিক মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সেই বিশাল হ্রদের মতো জলরাশি একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। তাদের জাহাজ আর লাইফ বোট ছাড়া তার উপরে আর কোন জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নেই। বিমল ঠিক কথাই বলেছে। সুন্দরবাবুকে যে আক্রমণ করেছিল নিশ্চয় সে মানুষ নয়!

রামহরি দৃঢ়স্বরে বললে, 'না খোকাবাবু, আমি মিছে কথা বলি নি। সে মানুষ কিনা জানি না, কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতোই। সুন্দরবাবুর কোমর সে নীচে থেকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছিল। কাঁচের মতো পরিষ্কার জলে তার হাত, পা, মুখ, দেহ বেশ দেখা যাচ্ছিল।'

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁপ ছাড়া হল সমাপ্ত। দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে তিনি বললেন, 'হুম্'। রামহরি কিচ্ছু ভুল বলছে না। আমাকে ধরেছিল একটা জ্যান্তো মরা-মানুষ।'

—'জ্যান্তো মরা-মানুষ!'

—'হ্যাঁ, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি—একেবারে আসল মড়া! আমি তার হাতের ছোঁয়া পেয়েছি—একেবারে কন্‌কনে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! কিন্তু সে জ্যান্তো, তার হাতের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল! মরা মাছের মতো স্থির দুই চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল—বাপ রে, ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়!'

রামহরি বললে, 'জ্যান্তো মড়া মানেই হচ্ছে, পিশাচ। সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই কোন পিশাচের পাল্লায় পড়েছিলেন! ভাগ্যে আমাদের বাঘা ছিল, তাই এ-যাত্রা কোন-গতিকে বেঁচে গেলেন! বাঘার কাছে পিশাচও জব্দ।'

সুন্দরবাবু কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে বাঘার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুম্। বাঘা, আয় রে, আমার কাছে আয়! তুই যে কি রত্ন, এতদিন আমি চিনতে পারি নি। এবার থেকে আর তোকে আমি কিছু বলব না, তোকে ভালো ভালো খাবার খেতে দেবো। খাসা কুকুর, লক্ষ্মী কুকুর!'

মাণিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি নিশ্চয় মৎস্যনারী আর নাগকন্যার গল্প শুনেছেন?'

সুন্দরবাবু বেশ বুঝলেন মাণিকের মাথায় কোন নতুন দুষ্টুমি বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাঁর পিছনে লাগা হচ্ছে তার চিরকেলে স্বভাব। বললেন, 'হুঁ', শুনেছি। কি হয়েছে তা?'

—'আমার বোধহয় কোন মৎস্যনারী কি নাগকন্যা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল।'

একটু গরম হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সে কি করত?'

—'বিয়ে করত। আপনাকে দেখে তার পছন্দ হয়েছিল কিনা।'

একেবারে মারমুখো হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'চোপরাও মাণিক, চোপরাও! তোমার মতন তঁ্যাদোড় আমি জীবনে আর দেখি নি, আমার হাতে একদিন তুমি মার খাবে জেনো।'

বিমল গম্ভীর মুখে ভাবতে ভাবতে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

—'কিছু না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি, সুন্দরবাবুর চোখের ভ্রম হয়েছে।'

—'সুন্দরবাবুর আর রামহরির—দু-জনেরই একসঙ্গে চোখের ভ্রম হল?'

—'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার ফলেই আজ আমরা এখানে এসেছি। সেই মামলাটার কথা ভেবে দেখুন। লোকের পর লোক দেখতে লাগল, শূন্য-পথে ছায়ামূর্তির মতন কে উড়ে যায়। তারা সকলেই কি ভুল দেখে নি?…হুঃ, জ্যান্তো মড়া। পিশাচ! সে আবার বাস করে জলের তলায়! বলেন কি মশাই, এ-সব কি বিশ্বাস করবার কথা?'

—'বিশ্বাস আপনাকে কিছুই করতে বলছি না জয়ন্তবাবু! কিন্তু আমার মত হচ্ছে, এ ব্যাপারটার মধ্যে কোন অলৌকিক বা অসাধারণ রহস্য থাকলেও থাকতে পারে। জীবনে অনেকবারই আমাকে আর কুমারকে এমন সব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে, যা অলৌকিক ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতে কি, অলৌকিক ব্যাপার দেখে দেখে এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এটাও ভুলবেন না যে, আমরা সকলেই চলেছি কোন এক অজানা দেশে, অলৌকিক দৃশ্য দেখবারই আশায়। এখন আমরা সেই অমৃত-দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছি। আজ হয়তো এইখান থেকেই অলৌকিক রহস্যের আরম্ভ হল! ঐ শুনুন, জাহাজ থেকে আবার আমাদের ডাকছে, সন্ধ্যাও হয়েছে, আর এখানে নয়।'

'পাম' জাতীয় একদল গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদের মুখ উঁকি মারছিল সকৌতুকে। জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্রই জ্যোৎস্নার রূপলেখা পড়েছে ছড়িয়ে এবং দিনের সঙ্গে রাতের ভাব হয়েছে দেখে অন্ধকার আজ যেন ভয়ে নিজ-মূর্তি ধারণ করতে পারছে না।

সকলে একে একে 'লাইফ-বোটে' গিয়ে উঠল। হ্রদের স্বচ্ছ জল ভেদ করে চাঁদের আলো নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেখানে যাকে খুঁজছিল তাকে দেখতে পেলে না। তবু একটা ভয়াবহ অসম্ভবের সম্ভাবনা হ্রদের নীলিমাকে করে রেখেছিল রহস্যময়।

চাঁদের বাতি নিবিয়ে দিয়ে এল অরুণ প্রভাত। মহাসাগরকে আলোময় করে সে পূর্বাকাশে এঁকে দিলে তরুণ সূর্যের রক্ততিলক। জাহাজ বেগে ছুটেছে অমৃত-দ্বীপের উদ্দেশে।

ডেকের উপরে 'মর্ণিং ওয়াক' করতে করতে সুন্দরবাবু জাহাজের রেলিং ধরে একবার দাঁড়ালেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখ দুটো উঠল বেজায় চমকে। উত্তেজিত স্বরে তিনি ডাকলেন,'জয়ন্ত ! মাণিক ! বিমলবাবু ! কুমারবাবু !'

সবাই এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সুন্দরবাবুর জোর-তলবে সেখানে ছুটে এল।

সুন্দরবাবু বিবর্ণমুখে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন। জাহাজের পাশেই নীলজলে ভাসছে মানুষের একটা রক্তহীন সাদা মৃতদেহ। তার ভাবহীন, নিষ্পলক, বিস্ফারিত দুটো চোখ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জাহাজের দিকে। তার আড়ষ্ট দেহে বিন্দুমাত্র জীবনের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু কি আশ্চর্য, স্রোতের বিরুদ্ধে বেগবান জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভেসে চলেছে সোঁ সোঁ করে।

হতভম্ব মুখে জয়ন্ত বললে, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?'

বিমল কিছু বললে না, রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে পড়ে আরো

ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতে লাগল।

সুন্দরবাবু তিক্তস্বরে বললেন, 'ঐ কি তোমার মৎস্যনারী? দেখেছ, ওটা একটা বুড়ো চীনেম্যানের মড়া? ওই-ই কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল!'

মাণিক বললে, 'নিশ্চয় ও বোম্বেটে-জাহাজের যাত্রী ছিল, কালকের 'টাইফুনে' জলে ডুবে মারা পড়েছে।'

—'হুম্, মারা পড়েছেই বটে। তাই স্রোতের উলটোমুখে এগিয়ে চলেছে কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে।'

রামহরি কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'সকলে রাম-নাম কর, রাম-নাম কর—রাম-নাম কর। ও পিশাচ, আমাদের রক্ত খেতে চায়!'

কুমার বললে, 'বিমল, 'তাও'-সাধুদের কথা স্মরণ কর। যারা 'সিয়েন' বা অমর হয়, জলে-স্থলে-শূন্যে তাদের গতি হয় অবাধ! আমরা হয়তো অমৃত-দ্বীপের কোন 'সিয়েন'কেই আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি।'

জয়ন্ত বললে, 'আজকের যুগে ও সব আজগুবি কথা মানি কি করে?'

বিমল বললে, 'না মেনেও তো উপায় নেই জয়ন্তবাবু। ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন মামলার সময়েই আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দিই নি যে, কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী কত শত বৎসর বেঁচেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। সময়ে সময়ে তাঁরও দেহ বৎসরের পর বৎসর ধরে গঙ্গাজলে ভেসে ভেসে বেড়াত। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা তো পৌরাণিক কথা নয়, আধুনিক যুগেরই কথা।'

—'বিমলবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, আর চোখের সামনে যা স্পষ্ট দেখছি তাকে উড়িয়ে দেবার শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেছি! এও কি সম্ভব? বেগবান অথচ আড়ষ্ট নিশ্চেষ্ট মৃতদেহ ছোটে আধুনিক কালের জাহাজের সঙ্গে! এর পরেও আর

অবিশ্বাস করব কিসে? এখন অচল পাহাড়কেও চলতে দেখলে আমি বিস্মিত হবো না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও সব তর্ক থো করুন মশাই, থো করুন। আমার কথা হচ্ছে, 'সিয়েন'রা কি মানুষের মাংস খায়? নইলে ও কাল আমাকে আক্রমণ করেছিল কেন?'

বিমল বললে, 'বোধহয় ও আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরেছে। ও তাই বাধা দিতে চায়, আমাদের আক্রমণ করতে চায়!'

—'তাই নাকি? হুম্!'—বলেই সুন্দরবাবু এক ছুটে নিজের কামরায় গিয়ে একটি বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন।

কুমার বললে, 'আপনি কি করতে চান সুন্দরবাবু!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি দেখতে চাই, অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে তারা কেমন ধারা অমর? আমি দেখতে চাই, ঐ জ্যান্তো মড়াটা বন্দুকের গরমাগরম বুলেট হজম করতে পারে কিনা?'

রামহরি সভয়ে বললে, 'পিশাচকে ঘাঁটাবেন না বাবু, পিশাচকে ঘাঁটাবেন না। কিসে কি হয় বলা তো যায় না!'

—'আরে, রেখে দাও তোমার পিশাচ-ফিশাচ! পুলিশের কাজই হচ্ছে যত নরপিশাচ বধ করা।'—এই বলেই সুন্দরবাবু বন্দুক তুলে সেই ভাসন্ত দেহটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলেন।

ফল কি হয় দেখবার জন্যে সকলে অপেক্ষা করতে লাগল, সাগ্রহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বীপে

সুন্দরবাবু তাঁর 'অটোমেটিক' বন্দুক ছুঁড়লেন—এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই সাংঘাতিক আধুনিক মারণাস্ত্রের গর্ভ থেকে বেরিয়ে হুড়-হুড় করে বয়ে গেল অনেকগুলো গুলির ঝড়।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের বুকে ভাসন্ত সেই আশ্চর্য জীবিত বা মৃত দেহটা জলের তলায় অদৃশ্য হল !

সুন্দরবাবু বন্দুক নামিয়ে বললেন, 'হুম্। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। ব্যাটার গা নিশ্চয় ঝাঁজরা হয়ে গেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার বোধহয় গুলি লাগবার আগেই ও-আপদটা সমুদ্রে ডুব মেরেছে !'

বিমল বললে, 'আমারও সেই বিশ্বাস।'

কুমার বললে, 'মড়াটা খালি জ্যান্তো নয়, বেজায় ধূর্ত !'

মাণিক বললে, 'ও হয়তো এখন ডুব-সাঁতার দিচ্ছে !'

রামহরি বললে, 'রাম, রাম, রাম, রাম। পিশাচকে ঘাঁটিয়ে ভালো কাজ হল না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'অমরই বল, জ্যান্তো মড়াই বল, আর পিশাচই বল, অটোমেটিক বন্দুকের কাছে কোন বাবাজীর কোনই ওস্তাদি খাটবে না। এতক্ষণে ব্যাটার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে অতলে তলিয়ে গেছে।'

কিন্তু সুন্দরবাবুর মুখের কথা ফুরুতে-না-ফুরুতেই সেই রক্ত শূন্য সাদা দেহটা হুস করে আবার ভেসে উঠল। তার মুখে ভয়ের বা রাগের কোন চিহ্নই নেই এবং তার ভাবহীন ও পলকহীন চোখ দুটো আগেকার মতই বিস্ফারিত হয়ে তাকিয়ে আছে জাহাজের দিকে।

রামহরি আর সে দৃশ্য সইতে পারলে না, ওঠে-কি-পড়ে এমনি

বেগে ছুটে আড়ালে পালিয়ে গেল।

বিমল হাসতে হাসতে বললে, 'ও-সুন্দরবাবু, এখন আপনার মত কি? দেখছেন, মড়াটা এখনো অটুট দেহে বেঁচে আছে?'

প্রথমটা সুন্দরবাবু রীতিমত হতভম্ব হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই সে-ভাব সামলে নিয়ে বললেন, 'তবে আমার টিপ ঠিক হয় নি। রোসো, এইবারে দেখাচ্ছি মজাটা!...আরে, আরে, বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই ব্যাটা যে আবার ডুব মারলে হে! এমন ধড়ীবাজ মড়া তো কখনো দেখি নি! হুম্, কিন্তু যাবে কোথায়? এই আমি বন্দুক বাগিয়ে রইলুম, উঠেছে কি গুলি করেছি। আমার সঙ্গে কোন চালাকিই খাটবে না বাবা!'

কিন্তু দেহটা আর ভেসে উঠল না। সুন্দরবাবু তাঁর প্রস্তুত বন্দুক নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললেন, 'নাঃ! হতভাগা গুলি খেতে রাজী নয়, সরে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে!'

জয়ন্তের মুখ গম্ভীর। সে চিন্তিত ভাবে বললে, 'আজ যা দেখলুম, লোকের কাছে বললে আমাদের পাগল বলে ঠাট্টা করবে। বিমলবাবু, জানি না অমৃত-দ্বীপ কেমন ঠাঁই! কিন্তু সেখানে যারা বাস্ করে, তাদের চেহারা কি ঐ ভাসন্ত দেহটার মতো?'

বিমল মাথা নেড়ে বললে, 'আমিও জানি না।'

মাণিক বললে, 'আমার কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে!'

কুমার বললে, 'ভয়! ভয়কে আমরা চিনি না। ভয় আমাদের কাছে আসতে ভয় পায়।'

মাণিক একটু হেসে বললে, 'ভয় নেই কুমারবাবু, আমিও ভীরু নই। এমন আজগুবি ভুতুড়ে দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করছে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মানুষের সংস্কারের দোষ। আমাকে কাপুরুষ ভাববেন না, দরকার হলে আমি ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবেরও সঙ্গে হাতাহাতি করতে রাজী আছি। আমি—'

কুমার বাধা দিয়ে মাণিকের একখানা হাত চেপে ধরে বললে,

'আমি মাপ চাইছি মাণিকবাবু! আমি আপনাকে কাপুরুষ মনে করি না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা কুমারবাবু, আপনি আমাকে ভীতুই ভাবুন আর কাপুরুষই ভাবুন, আমি কিন্তু একটা স্পষ্ট কথা বলতে চাই—হুম্!'

—'বলুন। স্পষ্ট কথা শুনতে আমি ভালোবাসি।'

—'আমি আর অমৃত-দ্বীপে গিয়ে অমর-লতার খোঁজ-টোজ করব না।'

—'করবেন না?'

—'না, না, না, নিশ্চয়ই না। আমি অমর হতে চাই না। অমর লতার খোঁজ করা তো দূরের কথা, আপনাদের দ্বীপের মাটি পর্যন্ত মাড়াতে রাজী নই।'

—'কেন?'

—'জয়ন্তের কথাটা আমারও মনে লাগছে। অমৃত-দ্বীপে যারা থাকে নিশ্চয় তারাও হচ্ছে জ্যান্তো মড়া! মড়া যেখানে জ্যান্তো হয়, সে দেশকে আমি ঘেন্না করি। থুঃ থুঃ—হুম্! আমি জাহাজ থেকে নামব না।'

—'কিন্তু তারা যদি জাহাজে উঠে আপনার সঙ্গে ভাব করতে আসে?'

—'কী! আমার সঙ্গে ভাব করতে আসবে? ইস, তা আসতে হয় না, আমার হাতে বন্দুক আছে কি জন্যে......কিন্তু যেতে দিন ও সব ছাই কথা, এখন কেবিনের ভেতরে চলুন, ক্ষিধের চোটে আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।'

মাণিক বললে, 'এইটুকুই হচ্ছে আমাদের সুন্দরবাবুর মস্ত বিশেষত্ব। হাজার ভয় পেলেও উনি ক্ষিধে ভোলেন না! হয়তো মৃত্যুকালেও উনি অন্তত এক ডজন লুচি আর একটা গোটা ফাউল রোস্ট খেতে চাইবেন!'

সুন্দরবাবু খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বলে উঠলেন, 'মাণিক, ফের তুমি

ফ্যাচফ্যাচ করছ! ফাজিল ছোকরা কোথাকার!'

'লিটল ম্যাজেস্টিক' জল কেটে সমুদ্রের নীল বুকে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মেঘশূন্য নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে পরিপূর্ণ রৌদ্র।

ক্রমে রোদের আঁচ কমে এল, সূর্যের রাঙা মুখ পশ্চিম আকাশ দিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে।

কুমার ডেকের উপরে এসে দেখলে, পূর্বদিকে তাকিয়ে বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বললে, 'কি শুনছ বিমল? মহাসাগরের চিরন্তন সঙ্গীত?'

—'আমি কিছুই শুনছি না ভাই! আমি এখন পূর্বদিকে একটা দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করছি।'

—'সূর্যাস্তের দেরি নেই। এখন তো রঙিন দৃশ্যপট খুলবে পশ্চিম আকাশে। আজ প্রতিপদ, চাঁদও আসবে খানিক পরে। তবে পূর্বদিকে এখন তুমি কি দেখবার আশা কর?'

—'যে আশায় এতদূর এসেছি!'

—মানে?'

—'কুমার, এইমাত্র দূরবীণে দেখলুম পূর্বদিকে একটি পাহাড়ে-ঘেরা দ্বীপকে—তার একদিকে রয়েছে পাশাপাশি পাঁচটি শিখর! আমি সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। খালিচোখেও ওকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি ভালো করে দেখতে চাও তো এই নাও দূরবীণ।'

কুমার বিপুল আগ্রহে দূরবীণটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখে তুলে অবাক হয়ে দেখলে, বিমলের কথা সত্য!

ছোট্ট একটি দ্বীপ। তার পায়ে উছলে পড়ে নমস্কার করে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের চঞ্চল ঢেউ এবং তার মাথার উপরে উড়ছে আকাশের পটে চলচ্চিত্রের মতো সাগর-কপোতরা। পশ্চিম আকাশের রক্তসূর্য যেন নিজের পুঁজি নিঃশেষ করে সমস্ত কিরণ-মালা জড়িয়ে দিয়েছে ঐ

দ্বীপবাসী শ্যামল শৈলশ্রেণীর শিখরে! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ও যেন মায়াদ্বীপ, চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও যেন এখনি ডুব মারতে পারে অতল নীলসাগরে!

ততক্ষণে জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও জাহাজের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং রামহরিরও সঙ্গে এসেছে বাঘা। দ্বীপটিকে খালিচোখেও দেখা যাচ্ছিল, সকলে কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কুমার বললে, 'ওহে বিমল, দ্বীপটি তো দেখছি এক রকম পাহাড়ে মোড়া বললেই হয়! পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে উপর দিকে অনেকখানি। ও দ্বীপ যেন পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল তুলে সমস্ত বাইরের জগৎকে আলাদা করে দিয়েছে, ওর ভিতরে যেন বাইরের মানুষর প্রবেশ নিষেধ! ও দ্বীপে ঢোকবার পথ কোন দিকে?'

বিমল পকেট থেকে অমৃত-দ্বীপের নকশা বার করে বললে, 'এই দেখ। দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচ-পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরওয়ালা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখ। দ্বীপের ভিতর থেকে একটি নদী পাহাড় ভেদ করে সমুদ্রের উপর এসে পড়েছে। আমাদের দ্বীপে ঢুকতে হবে ঐ নদীতেই নৌকো বেয়ে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখছি, আমায় যেন জাহাজ থেকে নামতে বলা না হয়!······কেমন রামহরি, তুমিও তো আমার দলেই?'

রামহরি প্রথমটা চুপ করে রইল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'তা হয় না মশাই! খোকাবাবুরা যদি নামেন, আমাকেও নামতে হবে।'

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'সে কি হে রামহরি, ও দ্বীপ যে পিশাচদের দ্বীপ! ওখানে যারা মরে যায় তারাও চলে বেড়ায়!'

রামহরি বললে, 'খোকাবাবুদের জন্যে আমি প্রাণও দিতে পারি।'

সূর্য অস্ত গেল। জাহাজ তখন দ্বীপের খুব কাছে। ঘনিয়ে উঠল সন্ধ্যার অন্ধকার। জাহাজ শৈল-দ্বীপের পঞ্চশিখরের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

সমুদ্রের পাখিরা তখন নীরব। আকাশ-আসরেও লক্ষ লক্ষ তারা প্রতিপদের চন্দ্রের জন্যে রয়েছে মৌন অপেক্ষায়। দ্বীপের ভিতর থেকেও কোনরকম জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সমুদ্র কিন্তু সেখানেও বোবা নয়, তার কল্লোলকে শোনাচ্ছে স্তব্ধতার বীণায় অপূর্ব এক গীতিধ্বনির মতো।

তারপর ধীরে ধীরে উঠল চাঁদ, অন্ধকারের কালো নিকষে রূপোলী আলোর ঢেউ খেলিয়ে।

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, দ্বীপে ঢোকবার নদীর মুখেই আমাদের জাহাজ নোঙর করেছে। এখন যদি বোটে করে আমরা একবার দ্বীপের ভিতরটা ঘুরে আসি?'

মাণিক বললে, 'কি সর্বনাশ, এই রাত্রে?'

জয়ন্ত বললে, 'লুকিয়ে খবরাখবর নেবার পক্ষে রাত্রিই তো ভালো সময়, মাণিক! চাঁদের ধবধবে আলো রয়েছে, আমাদের কোনই অসুবিধা হবে না।'

বিমল বললে, 'আজ আমরা দ্বীপের খানিকটা দেখেই ফিরে আসব। আমি, কুমার আর জয়ন্তবাবু ছাড়া আজ আর কারুর যাবার দরকার নেই। ফিরে আসবার পর কাল সকালে আমাদের আসল অভিযান শুরু হবে।

মাণিক নারাজের মতন মুখের ভাব করে বললে, 'কিন্তু যদি আপনারা কোন বিপদে পড়েন?'

—'বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সরে পড়ব। নয়তো একসঙ্গে তিনজনেই বন্দুক ছুঁড়ে সঙ্কেত করব। উত্তরে আপনারাও বন্দুক

ছুঁড়ে আমাদের জানিয়ে জাহাজের নাবিকদের নিয়ে সদলবলে দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করবেন।'

চন্দ্রালোকের স্বপ্নজাল ভেদ করে তাদের নৌকো ভেসে চলল দ্বীপের নদীতে নাচতে নাচতে। নৌকোর দাঁড় টানছে বিমল ও জয়ন্ত, হাল ধরেছে কুমার। চুপিচুপি কাজ সারবে বলে তারা নাবিকদেরও সাহায্য নেয় নি।

খানিকক্ষণ নদীর দুই তীরেই দেখা গেল, পাহাড়রা দাঁড়িয়ে আছে চিরস্তব্ধ প্রহরীর মতো। ঘণ্টাখানেক পরে তারা পাহাড়ের এলাকা পার হয়ে গেল।

দুই তীরে তখন চোখে পড়ল মাঝে মাঝে খোলা জায়গা, মাঝে মাঝে ছোট-বড় জঙ্গল ও অরণ্য। চাঁদের আলো দিকে দিকে নানা রূপের কত মাধুরীর ছবি এঁকে রেখেছে, কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হল না তখন তাদের দৃষ্টি।

দ্বীপের কোথাও যে কোন মানুষের চোখ এই সৌন্দর্য উপভোগ করছে, এমন প্রমাণও তারা পেলে না। এ দ্বীপ যেন একেবারে জনহীন—এ যেন সবুজ ক্ষেত্র, বৃহৎ বনস্পতি ও আকাশ ছোঁয়া পাহাড়দের নিজস্ব রাজত্ব।

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, এই যদি আপনার অমৃত-দ্বীপ হয়, তা হলে বলতে হবে যে এখানকার অমররা হচ্ছে অশরীরী!'

বিমল হঠাৎ বললে, 'কুমার, নৌকোর মুখ তীরের দিকে ফেরাও।'

জয়ন্ত বললে, 'কেন?'

—'ডাঙায় নেমে দ্বীপের ভিতরটা ভালো করে দেখতে চাই।'

—'কিন্তু নৌকো থেকে বেশি দূরে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

বিমল কি জবাব দিতে গিয়েই চমকে থেমে পড়ল। আচম্বিতে অনেক দূর থেকে জেগে উঠল বহুকণ্ঠে এক আশ্চর্য সঙ্গীত! সে গানে

পুরুষের গলাও আছে, মেয়ের গলাও আছে! গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বিচিত্র তার সুর—অপূর্ব মিষ্টতায় মধুময়।

কুমার চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, 'ও কারা গান গাইছে? ও গান আসছে কোথা থেকে?'

বিমল নদীর বাম তীরের দিকে চেয়ে দেখলে। প্রথমটা খোলা জমি, তারপর অরণ্য। সে বললে, 'মনে হচ্ছে গান আসছে ঐ বনের ভিতর থেকে। নৌকো তীরের দিকে নিয়ে চল কুমার! কারা ও গান গাইছে সেটা না জেনে ফেরা হবে না।'

খানিক পরেই নৌকো তীরে গিয়ে লাগল। বিমল, কুমার ও জয়ন্ত নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে ডাঙায় নেমে পড়ল। বিমল বললে, 'খুব সাবধানে, চারিদিকে নজর রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হল নরম ঘাসে ঢাকা এক মাঠের উপর দিয়ে। সেই অদ্ভুত সম্মিলিত সঙ্গীতের স্বর স্তরে স্তরে উপরে—আরো উপরে উঠছে এবং তার ধ্বনি জাগিয়ে দিচ্ছে বহুদূরের প্রতিধ্বনিকে! সে যেন এক অপার্থিব সঙ্গীত, ভেসে আসছে নিশীথ-রাতের রহস্যময় বুকের ভিতর থেকে!

যখন তারা বনের কাছে এসে পড়েছে, কুমার হঠাৎ পিছনে ফিরে তাকিয়ে চকিত স্বরে বললে, 'বিমল, বিমল! পিছনে কারা আসছে দেখ!'

বিমল ও জয়ন্ত একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে নদীর দিক থেকে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে বহু—বহু মূর্তি! সংখ্যায় তারা পাঁচ-ছয়শোর কম হবে না!

বিমল মহাবিস্ময়ে বললে, 'নদীর ধারে তো জনপ্রাণী ছিল না! কোত্থেকে ওরা আবির্ভূত হল?'

যেন আকাশ থেকে সদ্য-পতিত এই জনতার দিকে তারা তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট নেত্রে। চাঁদের আলোয় দূর থেকে মূর্তিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের মনে হল মূর্তিগুলো মানুষের মূর্তি হলেও, প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি হচ্ছে অত্যন্ত অমানুষিক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

যে দল এগিয়ে আসছে তার ভিতরকার প্রত্যেক মূর্তিটাই যেন মানুষের মতন—দেখতে কলের পুতুলের মতন। কেবল চলছে তাদের পাগুলো, কিন্তু উপর-দেহের অংশ একেবারেই কাঠের মতো আড়ষ্ট! তাদের হাত দুলছে না, মাথাগুলোও এদিকে-ওদিকে কোনদিকেই ফিরছে না! আশ্চর্য!

দূর থেকে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল, আর দেখা গেল খালি শত শত চোখে স্থির আগুনের মতন উজ্জ্বল দৃষ্টি!

কিন্তু অগ্নি-উজ্জ্বল এই সব দৃষ্টি এবং এই সব আড়ষ্ট দেহের চলন্ত পদের চেয়েও অস্বাভাবিক কেমন একটা অজানা-অজানা ভাব মূর্তিগুলোর চারিদিকে কি যেন এক ভুতুড়ে রহস্য সৃষ্টি করেছে!

কুমার শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের বন্দুক তুললে।

বিমল বললে, 'বন্ধু, অকারণ নরহত্যা করে লাভ নেই।'

কুমার বললে, 'নরহত্যা নয় বিমল, আমি প্রেতহত্যা করব। রামহরি ঠিক বলেছে, এ হচ্ছে পিশাচের দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না।'

—'কুমার, পাগলামি কোরো না।'

—'পাগলামি? ওরা কারা? এইমাত্র দেখে এলুম নদীর ধারে জনপ্রাণী নেই, তবু ওরা কোত্থেকে আবির্ভূত হল? ওরা মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল, না আকাশ থেকে খসে পড়ল? ওদের আর কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, বন্দুক ছোঁড়ো বিমল, বন্দুক ছোঁড়ো।

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'কি হবে বন্দুক ছুঁড়ে?' ওরা যদি এক সঙ্গে আক্রমণ করে তা হলে বন্দুক ছুঁড়েও আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব না, উলটে বন্দুকের শব্দে সজাগ হয়ে দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা এদিকে ছুটে আসতে পারে!'

জয়ন্ত চমৎকৃত স্বরে বললে, 'বিমলবাবু এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! প্রায় পাঁচশো লোক মাটির উপরে একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, তবু কোনরকম পায়ের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না? এও কি সম্ভব? না, আমরা কি কালা হয়ে গেছি?'

কুমার বললে, 'বিমল, বিমল! তবে কি বিনা বাধায় আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে? না বন্ধু, এতে রাজী নই।'

বিমল বললে, 'না, আত্মসমর্পণ করব কেন? আমরা ছুটে ঐ বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকব।'

—'তবে ছোটো! ওরা যে এসে পড়ল!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু যারা গান গাইছে তারা ঐ বনের ভিতরেই আছে। শেষ-কালে যদি আমরা দু-দিক থেকে আক্রান্ত হই?'

বিমল চটপট চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'মূর্তিগুলো আসছে পশ্চিম দিক থেকে, আর গানের আওয়াজ আসছে পূর্ব দিক থেকে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণেও রয়েছে বন। চলুন, আমরা ঐ দিকেই দৌড় দি।'

পূর্ব-দক্ষিণ কোণ লক্ষ্য করে তিনজনেই বেগে দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বন ও মাঠের সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা আর একবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

সেই বিচিত্র মূর্তির বৃহৎ দল দ্রুতবেগে তাদের অনুসরণ করে নি, তাদের গতি একটুও বাড়ে নি! তারা যেমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এখনো ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে আসছে—যেন তাদের কোনই তাড়া নেই! তফাতের মধ্যে খালি এই, এখন তারাও আসছে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে।

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওরা যে আমাদের পিছনে পিছনে আসছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখি কুমার? ওরা তো একটুও তাড়াহুড়ো করছে না,—রাহু যেমন নিশ্চয় চাঁদকে গ্রাস করতে পারবে জেনে এগুতে থাকে ধীরে ধীরে,

ওরাও অগ্রসর হচ্ছে সেই ভাবেই! যেন ওরা জানে, যত জোরেই পা চালাই ওদের কবল থেকে কিছুতেই আমরা পালাতে পারব না।'

কুমার বললে, 'ওদের ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দল মূর্তি ধারণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!'

জয়ন্ত বললে, 'ওরা কারা তা জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।'

বিমল বললে, 'এখন দেখছি সঙ্গীদের জাহাজে রেখে এসে ভালো কাজ করি নি। এই রহস্যময় দ্বীপে অদৃষ্টে কি আছে জানি না, কিন্তু চলুন, আমরা বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি।'

আর এক দৌড়ে তারা মাঠ ছেড়ে বনের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

বন সেখানে খুব ঘন নয়,গাছগুলোর তলায় তলায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে খানিক কালো আর খানিক আলোর খেলা। ঝোপ-ঝাপের মাঝখান দিয়েও ফুটে উঠেছে আলো-কালো মাখা পথের রেখা। এবং দূর থেকে তখনো ভেসে আসছিল সেই বিচিত্র সঙ্গীতের তান।

কুমার বললে, 'এখন আমরা কোন দিকে যাব?'

বিমল বললে, 'পূর্ব-দক্ষিণ দিকে আরো খানিক এগিয়ে তারপর আবার আমরা নদীর দিকে ফেরবার চেষ্টা করব।'

বিমলের মুখের কথা শেষ হতেই সারা অরণ্য যেন চমকে উঠল কি এক পৈশাচিক হো-হো অট্টহাস্যে! তাদের আশপাশ, সুমুখ পিছন থেকে ছুটল হাসির হর্‌রার পর হাসির হর্‌রা! সে বিকট হাসির স্রোত বইছে যেন পায়ের তলা দিয়ে, সে হাসি যেন ঝরে ঝরে পড়ছে শূন্যতল থেকে, সে হাসির ধাক্কায় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল বনব্যাপী আলোর লেখা, কালোর রেখা!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত বিভ্রান্তের মতো চতুর্দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাতে লাগল কিন্তু কোনদিকেই দেখা গেল না জনপ্রাণীকে।

জয়ন্ত বললে, 'কারা হাসে? কোথা থেকে হাসে? কেন হাসে?'

কুমার ও বিমল কখনো পাগলের মতো এ-গাছের ও-গাছের দিকে ছুটে যায়—কখনো ডাইনের কখনো বাঁয়ের ঝোপ-ঝাপের উপরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বারবার আঘাত করে, কিন্তু কোথাও কেউ নেই—অথচ অট্টহাসির তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে প্রতি ঝোপের ভিতর থেকে, প্রতি গাছের আড়াল থেকে। এ অদ্ভুত হাসির জন্ম যেন সর্বত্রই।

যেমন আচম্বিতে জেগেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে গেল হাসির হুল্লোড়! কেবল শোনা যেতে লাগল সুদূরের সঙ্গীতলহরী।

বিমল কান পেতে শুনে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এবারে কেবল গান নয়, আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ। বনময় ছড়ানো শুকনো পাতার উপরে পড়ছে যেন তালে তালে শত শত পা! বোধহয় মাঠের বন্ধুরা বনে ঢুকছে, কিন্তু এবারে তারা আর নিঃশব্দে আসছে না।'

বিমল বললে, 'ছোটো কুমার, যত জোরে পারো ছোটো।'

আবার জাগ্রত হল বহুকণ্ঠে সেই ভীষণ অট্টহাস্য!

কুমার বললে, 'কিন্তু কোন্ দিকে ছুটব বিমল? দূরে শত্রুদের পদশব্দ, আশেপাশে শত্রুদের পাগলা হাসির ধূম। চারিদিকে অদৃশ্য শত্রু, কোন্ দিকে যাব ভাই?'

—'সামনের দিকে—সামনের দিকে। শত্রুরা দৃশ্যমান হলেই বন্দুক ছুঁড়বে।'

তিনজনে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে লাগল যেন সেই বেয়াড়া হাসির আওয়াজ! এইটুকুই কেবল বোঝা গেল যে, তাদের এপাশে ওপাশে পিছনে জাগ্রত অট্টহাসি থাকলেও সামনের দিকে হাসি এখন একেবারেই নীরব। যেন সেই অপার্থিব হাসি তাদের সুমুখের পথ রোধ করতে চায় না! যেন কারা তাদের ঐদিকেই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়!

প্রায় বারো-তেরো মিনিট ধরে তারা ছুটে চলল এইভাবেই এবং

এর মধ্যে সেই হাসির স্রোত বন্ধ হল না একবারও।

তারপরেই থেমে গেল হাসি, শেষ হয়ে গেল বনের পথ এবং সামনেই দেখা গেল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু একটা প্রাচীর।

কুমার হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে,'সামনের পথ বন্ধ ! এখন আমরা কি করব ?'

বিমল ও জয়ন্ত উপায়হীনের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ বনের ভিতরে জাগল আবার শত শত পায়ের আঘাতে শুকনো পাতার আর্তনাদ !

জয়ন্ত বললে, 'এবারে পায়ের শব্দ আসছে আমাদের দু-পাশ আর পিছন থেকে। আমাদের সুমুখে রয়েছে খাড়া দেওয়াল। আর আমাদের পালাবার উপায় নেই।'

বিমল ম্লান হাসি হেসে বললে, 'আমরা পালাচ্ছি না—রিট্রিট করছি।'

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'বেশ, মানলুম এ-সব হচ্ছে আমাদের ট্যাক্‌টিক্যাল মুভমেন্টস ; কিন্তু এবার আমরা কোন্ দিকে যাত্রা করব ?

বিমল বললে, 'সামনের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন, আমাদের সুমুখের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা ছোট দরজা ! ওর পাল্লাও বন্ধ নেই।'

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে ভালো করে দেখে বুঝলে, বিমলের কথা সত্য ! তারপর বললে, 'দেখছি, অন্ধকারে আপনার চোখ আমাদের চেয়ে ভালো চলে ! কিন্তু ওর ভিতরে ঢুকলে কি আর আমরা বেরিয়ে আসতে পারব ? বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুই পাশের আর পিছনের অদৃশ্য শত্রুরা অট্টহাস্য আর পায়ের শব্দ করে আমাদের এই দিকে তাড়িয়ে আনতে চায়। শিকারীরা বাঘ-সিংহকে যেমন ভাবে নির্দিষ্ট পথে চালনা করে ফাঁদে ফেলে, শত্রুরাও সেই কৌশল অবলম্বন করেছে।'

বিমল বললে, 'ঠিক। তাদের উদ্দেশ্য আমিও বুঝতে পেরেছি। আর আমাদের ঢোকবার সুবিধা হবে বলে দয়া করে তারা দরজার পাল্লা দু-খানাও খুলে রেখেছে! অতএব তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের দরজার ফাঁকেই মাথা গলাতে হবে, কারণ পায়ের শব্দ আর দূরে নেই।'

কুমার বললে, 'দরজার ওপাশে যদি নতুন বিপদ থাকে?'

—'অকুতোভয়ে সেই বিপদকে আমরা বরণ করব—বলেই বিমল বন্দুক উদ্যত করে সর্বাগ্রে দরজার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পিছনে পিছনে গেল কুমার ও জয়ন্ত!

ভিতরে ঢুকে তারা অবাক হয়ে দেখলে, একটা বৃক্ষহীন তৃণহীন ছোটখাটো ময়দানের মতন জায়গা এবং তার চারিদিকেই প্রায় চারতলার সমান উঁচু-প্রাচীর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন সর্বহারা মরুভূমির খাঁ-খাঁ-করা ভয়াল স্তব্ধতাকে সেখানে কেউ প্রাচীর তুলে কয়েদ করে রেখেছে!

জয়ন্ত বললে, 'এর মানে কি? একটা মাঠকে এমন উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন?'

বিমল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'অনেকদিন আগে আমরা গিয়েছিলুম ময়নামতীর মায়াকাননে। কুমার, আজকের এই গর্জন শুনে কি সেখানকার কোন কোন জীবের কথা মনে পড়ে না?'

কুমার বললে, 'এরা কি এখানে আমাদের বন্দী করে রাখতে চায়?'

যেন তার জিজ্ঞাসার উত্তরেই তাদের পিছনকার দরজার পাল্লা দু-খানা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিমল দৌড়ে গিয়ে দরজা ধরে টানাটানি করে বললে, 'হ্যাঁ কুমার, অমৃত-দ্বীপে এসে আমাদের ভাগ্যে উঠবে বোধহয় নিছক গরলই। এ দরজা এমন মজবুত যে মত্ত হস্তীও এর কিছুই করতে পারবে না! এতক্ষণ লক্ষ্য করে দেখি নি, কিন্তু এ হচ্ছে পুরু লোহার দরজা; আর এই পাঁচিল হচ্ছে পাথরের। এই দরজা আর পাঁচিল ভাঙতে হলে কামানের দরকার!'

অকস্মাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল ভয়াবহ গর্জনের পর গর্জনে! সে কি বিকট, কি বীভৎস, কি ভৈরব হুঙ্কার, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃথিবীর মাটি, আকাশের চাঁদতারা, নিশীথ-রাতের বুক সে হুঙ্কার শুনে যেন কেঁপে কেঁপে উঠল! যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে বহুদিনের উপবাসী কোন অতিকায় দানব হিংস্র, বিষাক্ত চিৎকারের পর চিৎকার করে হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল!

বিমল, কুমার ও জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে জয়ন্ত ; কম্পিতস্বরে সে বললে, 'এ কোন জীবের গর্জন বিমলবাবু? চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিংহও যে একসঙ্গে এত জোরে গর্জন করতে পারে না! এ-রকম ভয়ানক গর্জন করবার শক্তি কি পৃথিবীর কোন জীবের আছে?'

কুমার বললে, 'মনে মনে আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম!'

বিমল বললে, 'কিন্তু আন্দাজ করতে পারছ কি এ-জীবটা কোত্থেকে গর্জন করছে? মনে হচ্ছে যেন সে আছে আমাদের খুব কাছেই। অথচ এই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার মধ্যে চাঁদের আলোয় কোন জীবের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু পূর্ব দিকে খানিক দূরে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে চাঁদের আলোয় জলের মতন কি চক্‌চক্‌ করছে না?'

বিমল খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্ত-বাবু, ওখানে একটা জলাশয়ের মতন কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে!'

কুমার বললে, 'একটু এগিয়ে দেখব নাকি?'

বিমল খপ করে কুমারের হাত চেপে ধরে বললে, 'খবর্দার কুমার, ওদিকে যাবার নামও কোরো না।'

—'কেন বিমল, ওদিকে তো কেউ নেই।'

—'হ্যাঁ, চোখে কারুকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আগে এখানকার

ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে দেখ। প্রথমে ধর, রীতিমত মাঠের মতন এমন একটা জায়গা অকারণে কেউ এত উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখে না। এখানটা ঘিরে রাখবার কারণ কি? দ্বিতীয়ত, পাঁচিলের ঐ দরজা পুরু লোহা দিয়ে তৈরি কেন? এই ফর্দা জায়গায় এমন কি বিভীষিকা আছে যাকে এখানে ধরে রাখবার জন্যে অমন মজবুৎ দরজার দরকার হয়? তৃতীয়ত, পাঁচিল-ঘেরা এতখানি জায়গার ভিতর দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই—না গাছপালা, না ঘর-বাড়ি, না জীবনের চিহ্ন! আছে কেবল একটা জলাশয়! কেন ওখানে জলাশয় খোঁড়া হয়েছে, ওর ভিতরে কি আছে? আমাদের খুব কাছে এখনি যে দানব-জানোয়ারটা বিষম গর্জন করলে, কে বলতে পারে সে ঐ জলাশয়ে বাস করে কিনা? হয়তো সে উভচর—জলে স্থলে তার অবাধ গতি! ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয় কুমার, ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।'

জয়ন্ত শিউরে বললে, 'তবে কি ঐ দানবের খোরাক হবার জন্যেই আমাদের তাড়িয়ে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে?'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

কুমার বললে, 'ঐ বিভীষিকা যদি স্থলচর হয়, তা হলে আমরা তো এখানে থেকেও বাঁচতে পারব না! সে তো আমাদের দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে! তখন কি হবে?'

—'তখন ভরসা আমাদের এই তিনটে অটোমেটিক বন্দুক! কিন্তু এই বন্দুক তিনটে যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে এ-কথা জোর করে বলা যায় না! ময়নামতীর মায়াকাননে আমরা এমন সব জীবও স্বচক্ষে দেখেছি যাদের কাছে বন্দুকও হচ্ছে তুচ্ছ অস্ত্র।'

জয়ন্ত কিছু না বলে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রাচীরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, 'দেখছি পাঁচিলের গা তেলা নয়, রীতিমত এবড়ো-খেবড়ো। ভালো লক্ষণ।'

বিমল বললে 'পাঁচিলের গা অসমতল হলে আমাদের কি সুবিধা হবে জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, 'বিমলবাবু, যদি এক-গাছা হাত-চল্লিশ-পঞ্চাশ লম্বা দড়ি পেতুম, তা হলে আমাদের আর কোনই ভাবনা ছিল না।'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'দড়ি? দড়ি নিয়ে কি করবেন? দড়ি তো আমার কাছেই আছে! জয়ন্তবাবু, আমি আর কুমার হচ্ছি পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, পথে পা বাড়ালেই সব-কিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। আমাদের দু-জনের পাশে ঝুলছে এই যে দুটো ব্যাগ, এর মধ্যে আছে দস্তুরমত সংসারের এক-একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার ব্যাগে আছে ষাট হাত ম্যানিলা দড়ি। জানেন তো, দেখতে সরু হলেও ম্যানিলা দড়ি দিয়ে সিংহকেও বেঁধে রাখা যায়?'

জয়ন্ত বললে, 'উত্তম। আর চাই একটা হাতুড়ি আর একগাছা হুক।'

—'ও দুটি জিনিস আছে কুমারের ব্যাগে।'

—'চমৎকার! তা হলে আমার সঙ্গে আসুন। আমি চাই চার পাঁচিলের একটা কোণ বেছে নিতে, সেখানে গেলে হাত বাড়িয়ে পাবো দু-দিকের দেওয়াল।'

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগুলো। কিছুই বুঝতে না পেরে বিমল আর কুমারও চলল তার পিছনে পিছনে।

প্রাচীরের পূর্ব-উত্তর কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, 'এই-বারে দড়ি আর হুক আর হাতুড়ি নিয়ে আমি উঠব পাঁচিলের ওপরে। তারপর টঙে গিয়ে দু-খানা পাথরের জোড়ের মুখে হুক বসিয়ে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেব। তারপর আপনারা দু-জনেও একে একে দড়ি ধরে ওপরে গিয়ে উঠবেন। তারপর সেই দড়ি বেয়েই পাঁচিলের ওপারে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

বিমল খিল্-খিল্ করে হেসে উঠে বললে, 'বাঃ, সবই তো জলের মতন বেশ বোঝা গেল ! কিন্তু জয়ন্তবাবু, প্রথমেই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ? অর্থাৎ পাঁচিলের টঙে গিয়ে চড়বে কে ? আপনি, না আমি, না কুমার ? দুঃখের বিষয় আমরা কেউই টিকটিকির মূর্তি ধারণ করতে পারি না !'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, আমি ঠাট্টা বা আকাশ-কুসুম চয়ন করছি না। কিছুকাল আগে 'নিউইয়র্ক টাইম্‌সে' আমি কারাগার থেকে পলায়নের এক আশ্চর্য খবর পড়েছিলুম। কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ সত্য-কাহিনী। আমেরিকার এক নামজাদা খুনে ডাকাতকে সেখানকার সবচেয়ে সুরক্ষিত জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়। সে জেল ভেঙ্গে কোন বন্দী কখনো পালাতে পারে নি, তার চারিদিকে ছিল অত্যন্ত উঁচু পাঁচিল। কিন্তু ঐ ডাকাতটা এক অদ্ভুত উপায়ে সেই পাঁচিলও পার হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপায়টা যে কি, মুখে বললে আপনারা তা অসম্ভব বলে মনে করবেন—আর খবরটা প্রথমে পড়ে আমিও অসম্ভব বলেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন ধরে অভ্যাস করবার পর আমিও দেখলুম, উপায়টা দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ উপায়টা চিরদিনই অসম্ভব হয়ে থাকবে বটে, কারণ এ উপায় যে অবলম্বন করবে তার পক্ষে দরকার কেবল হাত-পায়ের কৌশল নয়—অসাধারণ দেহের শক্তিও।'

বিমল কৌতূহলে প্রদীপ্ত হয়ে বললে, 'জয়ন্তবাবু, শীগগির বলুন, সে উপায়টা কি ?'

জয়ন্ত বললে, 'উপায়টা এমন ধারণাতীত যে মুখে বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। তার চেয়ে এই দেখুন, আপনাদের চোখের সুমুখে আমি নিজেই সেই উপায়টা অবলম্বন করছি'—বলেই সে দুই দিকের প্রাচীর যেখানে মিলেছে সেই কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর বিমল ও কুমার যে অবাক-করা ব্যাপারটা দেখলে কোনদিনই সেটা তারা সম্ভবপর বলে মনে করে নি ! জয়ন্ত কোণে

গিয়ে দুই দিকের প্রাচীরে দুই হাত ও দুই পা রেখে কেবল হাত ও পায়ের উপরে প্রবল চাপ দিয়ে উপর দিকে উঠে যেতে লাগল, প্রায় অনায়াসেই! বিপুল বিস্ময়ে নির্বাক ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে তারা বিস্ফারিত চোখে উপর-পানে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্ত যখন প্রাচীরের উপর পর্যন্ত পৌঁছলো, বিমল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারিফ করে বললে, 'সাধু! জয়ন্তবাবু সাধু! আপনি আজ সত্য করে তুললেন ধারণাতীত স্বপ্নকে!'

ঠিক সেই সময়েই জাগল আবার চারিদিক কাঁপিয়ে ও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে কোন অজ্ঞাত দানবের ভীষণ হুঙ্কার। সে যেন সমস্ত জীবজগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ—সে যেন বিরাট বিশ্বের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত যুদ্ধ ঘোষণা!

জয়ন্ত তখন প্রাচীরের উপরে উঠে বসে হাঁপ নিচ্ছে, কিন্তু এমন ভয়ানক সেই চিৎকার যে, চমকে উঠে সে আর একটু হলেই টলে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি দুই হাতে প্রাচীর চেপে ধরে সরোবরের দিকে তাকিয়ে দেখলে।...হ্যাঁ, বিমলের অনুমানই ঠিক। একটু আগে যারা আজগুবি হাসি হাসছিল তারা দেখা দেয় নি বটে কিন্তু এখন যে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার ছাড়ছে সে আর অদৃশ্য হয়ে নেই!

চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে। এবং পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীরের কালো ছায়া এসে পড়ে সরোবরের আধাআধি অংশ করে তুলেছে অন্ধকারময়। এবং সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারেরই একটা জীবন্ত অংশের মতো কী যে সে কিম্ভুতকিমাকার বিপুল মূর্তির খানিকটা আত্মপ্রকাশ করেছে, দূর হতে স্পষ্ট করে তা বোঝা গেল না। কিন্তু তার প্রকাণ্ড দেহটা সরোবরের জ্যোৎস্না উজ্জ্বল অংশের উপর ক্রমেই আরো প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে লাগল!... তবে কি সে তাদের দেখতে পেয়েছে? সে কি এগিয়ে আসছে জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠবার জন্যে?

জয়ন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে প্রাচীরের পাথরের ফাঁকে হুক বসিয়ে

ঠকাঠক হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল।

নীচে থেকে বিমল অধীর স্বরে চিৎকার করে বলল, 'ও আমাদের দেখতে পেয়েছে—ও আমাদের দেখতে পেয়েছে! জয়ন্তবাবু, দড়ি—দড়ি!'
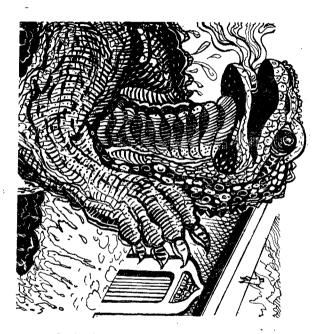
বিরাট কালি-কালো দেহ মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো

কুমার ফিরে সচকিত চোখে দেখলে, প্রায় আশী ফুট লম্বা ও পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু একটা বিরাট কালি-কালো দেহ মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো সরোবরের তীরে উঠে বসে সশব্দে প্রচণ্ড গা-ঝাড়া দিচ্ছে!

উপর থেকে ঝপাং করে একগাছা দড়ি নীচে এসে পড়ল।

কুমার ত্রস্ত স্বরে বললে, 'লাউ-ৎজুর ভক্তরা কি একেই ড্রাগন বলে ডাকে ?'

বিমল দড়ি চেপে ধরে বললে, 'চুলোয় যাক লাউ-ৎজুর ভক্তরা ! এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গেই দড়ি ধরে ওপরে উঠে এস।'

তারা একে একে প্রাচীরের ওপারে মাটির উপরে গিয়ে নেমে আড়ষ্ট ভাবে শুনলে, ওধার থেকে ঘন ঘন জাগছে মহাক্রুদ্ধ দানবের হতাশ হুঙ্কার ! সে নিশ্চয়ই চারিদিকে মুখের গ্রাস খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেননা তার বিপুল দেহের বিষম দাপাদাপির চোটে প্রাচীরের এ-পাশের মাটিও কেঁপে উঠছে থরথর করে।

কুমার শ্রান্তের মতন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে 'উঃ, দানবটা আর এক মিনিট আগে আমাদের দেখতে পেলে আর আমরা বাঁচতুম না !'

বিমল গম্ভীর স্বরে বললে, 'এখনও আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা নেই কুমার ! ডাইনে বাঁয়ে সামনের দিকে চেয়ে দেখ !'

সর্বনাশ ! আবার সেই অপার্থিব দৃশ্য। তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তরের মতন একটা স্থানে এবং সেই প্রান্তরের যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই চোখে পড়ে, কলে-চলা পুতুলের মতন দলে দলে মানুষ-মূর্তি অর্ধচন্দ্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, এগিয়ে আসছে ! নীরব, নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সব মূর্তি !

পিছনে প্রাচীর এবং সামনে ও দুই পাশে রয়েছে এই অমানুষিক মানুষের দল। এবারে আর পালাবার কোন পথই খোলা নেই।

জয়ন্ত অবসন্নের মতো বসে পড়ে বললে, 'আর কোন চেষ্টা করা বৃথা।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বীপের নিরুদ্দেশ যাত্রা

সেই ভয়ানক অর্ধচন্দ্র ব্যূহ এমন ভাবে তিন দিক আগলে এগিয়ে আসছে যে, মুক্তি লাভের কোন পথই আর খোলা রইল না।

ব্যূহ যারা গঠন করেছে তাদের দিকে তাকালেও বুক করতে থাকে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ! তারা মানুষ, না অমানুষ? তারা যখন মাটির উপরে পদ সঞ্চালন করে অগ্রসর হচ্ছে তখন তাদের জ্যান্তো মানুষ বলেই না মেনে উপায় নেই, কিন্তু দেখলে মনে হয়, যেন দলে দলে কবরের মড়া হঠাৎ কোন মোহিনী-মন্ত্রে পদচালনা করবার শক্তি অর্জন করেছে। এবং এবারেও সবাই লক্ষ্য করলে যে, কেবল দুই পা ছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক যেন মৃত্যু-আড়ষ্ট হয়ে আছে!

অর্ধচন্দ্র-ব্যূহের দুই প্রান্ত বিমলদের পিছনকার প্রাচীরের দুই দিকে সংলগ্ন হল, মাঝে থাকল একটুখানি মাত্র ফাঁক, যেখানে অবাক ও অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা তিনজনে।

এদের উদ্দেশ্য কি? এরা তাদের বন্দী করতে, না বধ করতে চায়? ওদের মুখ দেখে কিছু বোঝা অসম্ভব, কারণ মড়ার মুখের মতন কোন মুখই কোন ভাব প্রকাশ করছে না—কেবল তাদের অপলক চোখে চোখে জ্বলছে যেন নিষ্কম্প অগ্নিশিখা যা দেখলে হয় হৃৎকম্প!

কুমার মরিয়ার মতন চিৎকার করে বললে, 'কপালে যা আছে বুঝতেই পারছি, আমি কিন্তু পোকার মতন ওদের পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ দিতে রাজি নই—যতক্ষণ শক্তি আছে বিমল, বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো!'

সঙ্গে সঙ্গে শত শত কণ্ঠে আবার জাগল অট্টহাস্যের পর অট্টহাস্যের উচ্ছ্বাস!

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের ওপার থেকেও ভীষণ হুঙ্কার করে সাড়া দিতে লাগল সেই শিকার-বঞ্চিত হতাশ দানব-জন্তুটা!

সেই সমান-ভয়াবহ হাস্য ও গর্জনের প্রচণ্ডতায় চতুর্দিক হয়ে উঠল যেন বিষাক্ত!

ও-দানবটা যেন চ্যাঁচাচ্ছে পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে, কিন্তু এই মূর্তিমান প্রেতগুলো এত হাসে কেন?

বিমল বললে, 'জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে যে মূর্তিটা ভেসে আসছিল তাকেও দেখতে ঠিক এদের মতো। সেও হয়তো এই দলেই আছে।'

কুমার তখন তার বন্দুক তুলে ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে বন্দুক নামিয়ে বললে, 'বিমল, বিমল, একটা কথা মনে হচ্ছে!'

—'কি কথা?'

—'লাউ-ৎজুর মূর্তিটা আমার সঙ্গেই আছে। জানো তো, 'তাও-সাধুরা বলে সে মূর্তি মন্ত্রপুত আর তাকে সঙ্গে না আনলে এ দ্বীপে আসা যায় না?'

বিমল কতকটা আশ্বস্ত স্বরে বললে, ঠিক বলেছ কুমার, এতক্ষণ ও কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম! ঐ মূর্তির লোভেই কলকাতায় মানুষের পর মানুষ খুন হয়েছে! তার এত মহিমা কিসের, এইবারে হয়তো বুঝতে পারা যাবে! বার কর তো একবার মূর্তিটাকে, দেখি সেটা দেখে এই ভূতগুলো কি করে?'

কুমার তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর থেকে জেড-পাথরে গড়া, রামছাগলে চড়া সাধক লাউ-ৎজুর সেই অর্দ্ধ-তপ্ত অর্দ্ধ-শীতল মূর্তিটা বার করে ফেললে এবং ডানহাতে করে এমন ভাবে তাকে মাথার উপরে তুলে ধরলে যে, সকলেই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

ফল হল কল্পনাতীত!

মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল অট্টহাস্য এবং আচম্বিতে যেন কোন অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা খেয়ে সেই শত শত আড়ষ্টমূর্তি অত্যন্ত

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে যেতে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জয়ন্ত, বিমল ও কুমার—তিনজনেই অত্যন্ত বিস্মিতের মতো একবার এ-ওর মুখের দিকে এবং একবার সেই পশ্চাৎপদ বীভৎস মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল বারংবার।

অবশেষে হাঁপ ছেড়ে জয়ন্ত বললে, 'এতটুকু মূর্তির এত বড় গুণ, এ-কথা যে বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না!'

বিমল বললে, 'এতক্ষণে বোঝা গেল, এই দ্বীপে ঐ পবিত্র মূর্তিই হবে আমাদের রক্ষাকবচের মতো। ওকে সঙ্গে করে এখন আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'না বিমলবাবু, না! এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপ আমাদের মতন মানুষের জন্য তৈরি হয় নি! এখানে পদে পদে যত সব অস্বাভাবিক বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, এর পর হয়তো লাউ-ৎজুর মূর্তিও আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না! আমি চাই নদীর ধারে যেতে, যেখানে বাঁধা আছে আমাদের নৌকো!'

কুমার বললে'আপাতত আমিও জয়ন্তবাবুর কথায় সায় দি। আবার যদি এখানে আসি, দলে ভারি হয়েই আসবো। কিন্তু নদী কোন্ দিকে?'

বিমল বললে, 'নিশ্চয়ই পশ্চিম দিকে! ঐ দেখ চাঁদের আলো নিবে আসছে, পূর্বের আকাশ ফর্সা হচ্ছে!'

যেন সমুজ্জ্বল স্বপ্নের মতো স্নিগ্ধতার মধ্যে দেখা গেল, প্রান্তরের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তালজাতীয় তরুকুঞ্জ ও ছোট ছোট বন। এতক্ষণ যারা এসে এখানে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল সেই অপার্থিব মূর্তিগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে চোখের আড়ালে, কোথায়!

বিমল সব দিকে চোখ বুলিয়ে বললে, 'আর বোধহয় ওরা আমাদের ভয় দেখাতে আসবে না। চল কুমার, আমরা ঐ বনের দিকে যাই। খুব সম্ভব, ঐ বনের পরেই পাব নদী।'

তারা বন লক্ষ্য করে অগ্রসর হল এবং চলতে চলতে বার বার

শুনতে লাগল, সেই অজানা অতিকায় জানোয়ারটা তখনো আকাশ কাঁপিয়ে দারুণ ক্রোধে চিৎকার করছে ক্রমাগত !

প্রায় সিকি মাইল পথ চলবার পর বনের কাছে এসে তারা শুনতে পেলে, গাছে গাছে জেগে উঠে ভোরের পাখিরা গাইছে নূতন উষার প্রথম জয়গীতি। আঁধার তখন নিঃশেষে পালিয়ে গেছে কোথায় কোন্ দুঃস্বপ্নলোকের অন্তঃপুরে।

দানবের চিৎকারও থেমে গেল। হয়তো সেও ফিরে গেল হতাশ হয়ে তার পাতালপুরে। হয়তো রাত্রির জীব সে, সূর্যালোক তার চোখের বালি।

বাতাসও এতক্ষণ ছিল যেন শ্বাসরোধ করে, এখন ফিরে এল নিয়ে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ, বনে বনে সবুজ গাছের পাতায় পাতায় জাগল নির্ভীক আনন্দের বিচিত্র শিহরণ !

জয়ন্ত বললে, 'এই তো আমার চির-পরিচিত প্রিয় পৃথিবী ! জানি এর আলো-ছায়ার মিলন-লীলাকে, এর শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মাধুর্যকে, এর ফুল-ফোটানো শ্যামলতাকে, আমি বাঁচতে চাই এদেরই মাঝখানে ! কালকের মতো যুক্তিহীন আজগুবি রাত আর আমার জীবনে কখনো যেন না আসে ! এ রাতের কাহিনী কারুর কাছে মুখ ফুটে বললেও সে আমাকে পাগল বলে মনে করবে !'

ঠিক সেই সময়ে কী এক অভাবনীয় ভাবে সকলের মন অভিভূত হয়ে গেল !

প্রথমটা সবিস্ময়ে কারণ বোঝবার চেষ্টা করেও কেউ কিছুই বুঝতে পারলে না।

তারপরেই কুমার বললে, 'একি বিমল, একি। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি ?'

চারিদিকে একবার চেয়ে বিমল বললে, 'এ তো ঠিক ভূমিকম্পের মতন মনে হচ্ছে না কুমার ! মনে হচ্ছে, আমরা আছি টল্‌মলে জলে নৌকোর ওপরে ! একি আশ্চর্য !'

জয়ন্ত বললে, 'দেখুন দেখুন, ঐ দিকে তাকিয়ে দেখুন! যে-মাঠ দিয়ে আমরা এসেছি, সেখানে হঠাৎ এক নদীর সৃষ্টি হয়েছে! অ্যাঃ এও কি সম্ভব?'

বিপরীত দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, 'ওদিকেও যে ঐ ব্যাপার! আমরা যে জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছি তার দুই দিকেই নদীর আবির্ভাব হয়েছে!'

দুই হাতে চোখ কচলে চমৎকৃত কণ্ঠে বিমল বললে, 'এ তো দৃষ্টি-বিভ্রম নয়! কুমার, আমাদের সামনের দিকেও খানিক তফাতে চেয়ে দেখ। ওখানেও জল! পিছন দিকে বন ভেদ করে চোখ চলছে না, খুব সম্ভব ওদিকেও আছে জল! কারণ এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি এখন দ্বীপের মতন একটা জমির উপরে, আর এই দ্বীপটা ভেসে যাচ্ছে ঠিক নৌকোর মতোই! না, এইবারে আমি হার মানলুম! দ্বীপ হল নৌকো! না এটাকে বলব ভাসন্ত দ্বীপ?'

সত্য! জলের ওপরে প্রান্তরের বনজঙ্গল দেখতে দেখতে পিছনে সরে যাচ্ছে—যেমন সরে যেতে দেখা যায় রেলগাড়ির ভিতরে বা নৌকো-জাহাজের উপরে গিয়ে বসলে! গঙ্গা সাঁতার কাটছে জলে!

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি হ্যামার্টনের 'ইউনিভার্সেল হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্লড' পড়েছেন?'

—'রেখে দিন মশাই, হিস্ট্রি-ফিস্ট্রি! আমার মাথা এমন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! নিজেকে আর জয়ন্ত বলেই মনে হচ্ছে না!'

—'শুনুন। ঐ হিস্ট্রির ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৫২২ পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখবেন! চার-পাঁচ শো বছর আগে চীনদেশে সিং-রাজবংশের সময়ে একজন চীনা পটুয়া অমৃত-দ্বীপের যে চিত্র এঁকেছিলেন, ওখানি হচ্ছে তারই প্রতিলিপি। তাতে দেখা যায়, জন-কয় তাও-ধর্মাবলম্বী লোক একটি ভাসন্ত দ্বীপে বসে পান-ভোজন আমোদ-আহ্লাদ করছে, আর একটি মেয়ে হাল ধরে দ্বীপটিকে করছে নির্দিষ্ট পথে চালনা!'

—'আরে মশাই, কবি আর চিত্রকররা উদ্ভট কল্পনায় যা দেখে,

তাই কি আমাদেরও বিশ্বাস করতে হবে ?'

—'জয়ন্তবাবু, সময়-বিশেষে কল্পনাও যে হয় সত্যের মতো, আর সত্যও হয় কল্পনার মতো, আজ স্বচক্ষেও তা দেখে আপনি তাকে স্বীকার করবেন না ?'

—'পাগলের কাছে সবই সত্য হতে পারে। আমাদের সকলেরই মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।'

—'না জয়ন্তবাবু, শিশুরও কাছে সবই সত্য হতে পারে। এই লক্ষ-কোটি বৎসরের অতি-বৃদ্ধ পৃথিবীর কোলে ক্ষুদ্র মানুষ হচ্ছে শিশুর চেয়েও শিশু। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও যে অসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থাকতে পারে, ভালো করে তা জানতে পারবার আগেই ক্ষণজীবী মানুষের মৃত্যু হয়। আজ লোহা জলে ভাসে, ধাতু আকাশে ওড়ে, বন্দী বিদ্যুৎ গোলামী করে, শূন্য দিয়ে সাত সাগর পেরিয়ে বেতারে মানুষের চেহারা আর কণ্ঠস্বর ছোটোছুটি করে, ছবি জ্যান্তো হয়ে কথা কয়, রসায়নাগারে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, কিছুকাল আগেও এ-সব ছিল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, আজগুবি কল্পনার মতো। তবু আমরা কতটুকুই বা দেখতে কি জানতে পেরেছি? পৃথিবীতে যা-কিছু আমরা দেখি নি, শুনি নি, তা-ই অসম্ভব না হতেও পারে!'

—'আপনার বক্তৃতাটি যে খুবই শিক্ষাপ্রদ, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপাতত বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমার নেই। এখন আমরা কি করব সেইটেই ভাবা উচিত, এ দ্বীপ আমাদের নিয়ে জলপথে হয়তো নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে চায়, এখন আমাদের কি করা উচিত ?'

কুমার বললে, 'আমাদের উচিত, জলে ঝাঁপ দেওয়া।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তরল জল আবার কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তা হলেও আমি আর অবাক হবো না!'

বিমল বললে, 'কিংবা জলের ভিতরে আবার দেখা দিতে পারে দলে দলে জ্যান্তো মড়া।'

কুমার শিউরে উঠে ব্যাগটা টিপে-টুপে অনুভব করে দেখলে, লাউ-ৎজুর মূর্তিটা যথাস্থানে আছে কি না।

তারপর এগিয়ে ধারে গিয়ে তারা দেখলে, দ্বীপ তখন ছুটে চলেছে রীতিমত বেগে এবং তটের তলায় উচ্ছল স্রোত ডাকছে কল-কল করে। নদীর আকার তখন চওড়া হয়ে উঠেছে এবং খণ্ডদ্বীপের দুই তীর সরে গেছে অনেক দূরে।

জয়ন্ত আবার বললে, 'এখন উপায় কি বিমলবাবু, আমরা কী করব ?'

বিমল বললে, 'এখানে জল-স্থল দুই-ই বিপদজ্জনক। বাকি আছে শূন্যপথ, কিন্তু আমাদের ডানা নেই।'

কুমার বললে, 'নদীর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। হয়তো অমৃত-দ্বীপের বাসিন্দারা আমাদের মতো অনাহুত অতিথিদের বাহির-সমুদ্রে তাড়িয়ে দিতে চায়।'

জয়ন্ত আশান্বিত হয়ে বললে, 'তা হলে তো সেটা হবে আমাদের পক্ষে শাপে বর। নদীর মুখেই আছে আমাদের জাহাজ।'

বিমল বললে, 'কিন্তু জাহাজ-সুদ্ধ লোক আমাদের এই অতুলনীয় দ্বীপ-নৌকো দেখে কি মনে করবে, সেটা ভেবে এখন থেকেই আমার হাসি পাচ্ছে।'

কিন্তু বিমলের মুখে হাসির আভাস ফোটার আগেই হাসি ফুটল আর এক নতুন কণ্ঠে। দস্তুরমত কৌতুক-হাসি।

সকলে চমকে পিছন ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, একটু তফাতে বনের সামনে গাছতলায় বসে আছে আবার এক অমানুষিক মূর্তি! কিন্তু এবারে তার মুখ আর ভাবহীন নয়, কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জ্বল।

জয়ন্ত বললে, 'এ মূর্তি আবার কোথা থেকে এল ?'

বিমল বললে, 'যেখান থেকেই আসুক, এর চোখে-মুখে বিভীষিকার চিহ্ন নেই, এ হয়তো আমাদের ভয় দেখাতে আসে নি।'

মূর্তি পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় বললে, 'কে তোমরা ? পরেছ

ইংরেজী পোশাক, কিন্তু দেখছি তোমরা ইংরেজ নও!'

বিমল দুই পা এগিয়ে বললে, 'তুমি যেমন চীনা হয়েও ইংরেজী বলছ, আমরাও তেমনি ইংরেজী পোশাক পরেও জাতে ভারতীয়।'

—ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউ-ৎজুর দেশে এসেছ কেন?

—'ঋষি বুদ্ধদেবের দেশ থেকে তোমরা প্রভু লাউ-ৎজুর দেশে এসেছ কেন? তোমরা কি জানো না, এ দেশ হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ, এখানে বাস করে আমার মতন অমরেরা—জলে-স্থলে-শূন্যে যাদের অবাধ গতি? এখানে নশ্বর মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ!'

বিমল হেসে বললে, 'অমর হবার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই!'

মূর্তি উপেক্ষার হাসি হেসে বললে, 'মূর্খ! আমাদের দেহের মর্যাদা তোমরা বুঝবে না। দেহ তো একটা তুচ্ছ খোলস মাত্র, মানুষ বলতে আসলে বোঝায় মানুষের মনকে! আমাদের দেহ নামে মাত্র আছে, কিন্তু আমরা করি কেবল মনের সাধনা, আমাদের আড়ষ্ট দেহে কর্মশীল কেবল আমাদের মন। কিন্তু থাক ও-সব কথা। কে তোমরা? কেন এখানে এসেছ? 'সিয়েন্' হতে?'

—'না তোমাদের দেখবার পর আর অমর হবার সাধ নেই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।'

—'বেড়াতে! এটা নশ্বর মানুষের বেড়াবার জায়গা নয়! জানো তোমাদের মতো আরো কত কৌতূহলী এখানে বেড়াতে এসে মারা পড়েছে আমাদের হাতে?'

—'সেটা তোমাদের অভ্যর্থনার পদ্ধতি দেখেই বুঝতে পেরেছি। কেবল আমাদের মারতে পারো নি, কারণ সে শক্তি তোমাদের নেই!'

—'মূর্খ! তোমাদের বধ করতে পারি এই মুহূর্তেই! কেবল প্রভু লাউ-ৎজুর পবিত্র মূর্তি তোমাদের সঙ্গে আছে বলেই এখনো তোমরা বেঁচে আছ। ও-মূর্তি কোথায় পেলে?'

—'সে খবর তোমাকে দেব না।'

—'তোমরা কি তাও-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছ?'

—'না। আমরা হিন্দু। তবে সাধক বলে লাউ-ৎজুকে আমরা শ্রদ্ধা করি।'

—'কেবল মুখের শ্রদ্ধা ব্যর্থ, তোমাদের মন অপবিত্র। প্রভু লাউ-ৎজুর মূর্তির মহিমায় তোমাদের প্রাণরক্ষা হল বটে, কিন্তু এখানে আর তোমাদের ঠাঁই নেই। শীঘ্র চলে যাও এখান থেকে!'

—'খুব লম্বা হুকুম তো দিলে, এই জ্যান্তো মড়ার মুল্লুক থেকে চলেও তো যেতে চাই, কিন্তু যাই কেমন করে?'

—'কেন?'

—'আগে ছিলুম মাঠে। তারপর মাঠ হল জলে-ঘেরা দ্বীপ।

তারপর দ্বীপ হল আশ্চর্য এক নৌকো। খুব মজার ম্যাজিক দেখিয়ে আরব্য উপন্যাসকেও তো লজ্জা দিলে বাবা। এখন দয়া করে দ্বীপে-নৌকোকে আবার স্থলের সঙ্গে জুড়ে দাও দেখি, আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

—'তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুশি হলুম। দ্বীপের পূর্ব দিকে চেয়ে দেখ।'

সকলে বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখলে, ইতিমধ্যে কখন যে দ্বীপের পূর্ব-প্রান্ত আবার মাঠের সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে গেছে তারা কেউ জানতেও পারে নি। স্থির মাটি, পায়ের তলায় আর টলমল করছে না।

এতক্ষণ পরে বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণস্বরে বললে, 'তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।'

—'এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে গেলেই দেখবে, নদীর ধারে তোমাদের নৌকো বাঁধা আছে। যাও!'

পর মুহূর্তেই আর এক অদ্ভুত দৃশ্য! সেই উপবিষ্ট মূর্তি আচম্বিতে বিনা অবলম্বনেই শূন্যে উর্ধ দিকে উঠল এবং তারপর ধনুক-থেকে ছোঁড়া তীরের মতন বেগে বনের উপর দিয়ে কোথায় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

কুমার হতভম্বের মতন বললে, 'এ কি দেখলুম বিমল, এ কি দেখলুম!'

বিমল বললে, 'আমি কিন্তু এই শেষ ম্যাজিকটা দেখে আশ্চর্য বলে মনে করছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'বিমলবাবু, তা হলে আপনার কাছে আশ্চর্য বলে কোন কিছু নেই!'

—'জয়ন্তবাবু, আপনি কি সেই অদ্ভুত ইংরেজের কথা শোনেন নি—টলস্টয়, থ্যাকারের সঙ্গে আরো অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোক স্বচক্ষে দেখে যাঁর বর্ণনা করে গেছেন? তিনি সাধকও নন, যাদুকরও নন,

আমাদের মতন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর দেহ শূন্যে উঠে এক জানলা দিয়ে শূন্য-পথেই আবার ঘরের ভিতরে ফিরে আসত।'

—'দোহাই মশাই, দোহাই! আর নতুন নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে অসম্ভবের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করবেন না! আপনাদের 'অ্যাডভেঞ্চার' আমার ধারণার বাইরে। এখানকার মাটিতে আর পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেও আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাঠ আবার দ্বীপ হবার আগেই ছুটে চলুন নৌকোর খোঁজে।'

সকলে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল। পূর্বাকাশের রংমহলে প্রবেশ করেছে তখন নবীন সূর্য। নদীর জল যেন গলানো সোনার ধারা। নৌকো যথাস্থানেই বাঁধা আছে।

অমৃত-দ্বীপের আরো কত রহস্য অমৃত-দ্বীপের ভিতরেই রেখে তারা খুলে দিলে নৌকোর বাঁধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আঁধার আঁধার ! অসীম আঁধার !
আঁখি হয়ে যায় অন্ধ !
জাগো শিশু-রবি, আনো আলো-সোনা
আনো প্রভাতের ছন্দ !

হ্যাঁ, ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতের কথা বলব। প্রাগৈতিহাসিক কালে আর্যাবর্তে বিচরণ করতেন রঘু, কুরু, পাণ্ডব, যদু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি বংশের মহা মহা বীররা। তাঁদের কেউ কেউ অবতার রূপে আজও পূজিত হন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের জগতে ভারতে প্রথম প্রভাত এনেছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতবিজয়ী আলেকজাণ্ডার এবং গ্রীক-বিজয়ী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

রাম-রাবণ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনীর মধ্যে অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক সত্য থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে-সম্বন্ধে তর্ক না তুলে আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পুরাণ-বিখ্যাত সেই-সব

যুদ্ধের পরেও ভারতে এসেছিল দীর্ঘকাল ব্যাপী এক তমিস্রযুগ। তারই মধ্যে কেবল সত্যের সন্ধান দেয় নিষ্কম্প দীপশিখার মতো বুদ্ধদেবের বিস্ময়কর অপূর্ব মূর্তি। আজ ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি, তখনো তার অস্তিত্ব ছিল না বটে, কিন্তু কি এদেশী, কি বিদেশী কোন ঐতিহাসিকেরই এমন সাহস হয় নি যে, বুদ্ধদেবকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেন। সেই খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব না-হওয়া পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বলতে বুঝি, বুদ্ধদেবের জীবনচরিত।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং শিলালিপি প্রভৃতির দৌলতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী যুগের ভারতের কতকগুলি প্রামাণিক ছবি আমরা পেয়েছি। যদিও সে-যুগের বৌদ্ধ চিত্রশালা সম্পূর্ণ নয়, তবু আলো আঁধারের ভিতর থেকে ভারতের যে-মূর্তিখানি আমরা দেখতে পাই, বিচিত্র তা—মোহনীয়!

তারপরই সেই ছায়ামায়াময় প্রাচীন আর্যাবর্তে সমুজ্জ্বল মশাল হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। যে-শ্রেণীর কাহিনীকে আজ আমরা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য করি, তার জন্ম হয়েছিল সর্বপ্রথমে সেকালকার গ্রীক দেশেই। কাজেই আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান স্থানলাভ করল গ্রীক ইতিহাসেও এবং আলেকজাণ্ডা-রের পরেও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে গ্রীসের আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিলুপ্ত হয় নি। তাই সে-যুগের ভারতবর্ষের অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি গ্রীক লেখকদের প্রসাদে। সেলিউকস প্রেরিত গ্রীক দূত মেগাস্থেনিস লিপিবদ্ধ করে না রাখলে, আমরা মৌর্য চন্দ্র-গুপ্তের যুগে মগধ-সাম্রাজ্য তথা ভারতবর্ষের রাজপ্রাসাদ, রাজসভা, রাজধানী, সমাজ-নীতি, শাসন-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অনেক কথাই জানতে পারতুম না। এজন্যে গ্রীসের কাছে ভারতবর্ষ হয়ে থাকবে চিরকৃতজ্ঞ।

প্রাকৃতিক জগতে যেমন কখনো মেঘ কখনো রোদের খেলা,

কখনো আলো কখনো ছায়ার মেলা, প্রত্যেক দেশের সভ্যতার ইতিহাসেও তেমনি পরিবর্তনের লীলা দেখা যায়। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের বা ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৩ কি আরো দুই-এক বছর আগে। তার কিছু-কম দেড় শতাব্দী পরে মৌর্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি সুঙ্গ, কান্ব ও অন্ধ্র প্রভৃতি বংশের কম-বেশি প্রভুত্ব। ইতিমধ্যে গ্রীকরাও বারকয়েক ভারতের মাটিতে আসন পাতবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি।

কেবল গ্রীকরা নয়, মধ্য-এশিয়ার ভবঘুরে মোগল জাতি তখন থেকেই ভারতবর্ষে হানা দেবার চেষ্টা করছিল। মোগল বলতে তখন মুসলমান বোঝাতো না (নিজ-মঙ্গোলিয়ায় আজও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী মোগলরা আছে) এবং মোগল বলতে আসলে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধেও সকলের খুব পরিষ্কার ধারণা নেই। যুগে যুগে নানা, জাতি মোগলদের নানা নামে ডেকেছে। এদের বাহন ছিল ঘোড়া, খাদ্য ছিল মাংস, পানীয় ছিল দুগ্ধ। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস এদের ডেকেছেন 'সিথিয়ান্' বলে, পরবর্তী যুগের রোমানরা এদের 'হুন' নামে ডাকতেন, প্রাচীন ভারতে এদের নাম ছিল 'শক', এবং চীনারা এদের নাম দিয়েছিল Hiungnu। আসলে মোগল, শক, হুন, তাতার ও তুর্কীরা একরকম এক জাতেরই লোক, কারণ তাদের সকলেরই উৎপত্তি মধ্য-এশিয়ায় বা মঙ্গোলিয়ায়। এই আশ্চর্য জাতি ধরতে গেলে এক সময়ে প্রাচীন পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশকেই দখল করেছিল এবং ভারতবর্ষ তাদের অধিকারে এসেছিল দুইবার। প্রথম বারে তাদের বংশ কুষাণ বংশ বলে পরিচিত হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিখ্যাত সম্রাট কনিষ্ক এই বংশেরই ছেলে। দ্বিতীয় বারে তারা মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে।

মোগল বা শকরা ভারতে এসে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে নিজেদের সমস্ত বিশেষত্ব—এমন কি ধর্ম পর্যন্ত হারিয়ে একেবারে

এদেশের মানুষ হয়ে পড়েছিল। কনিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ, তবু তাঁর নামে বিদেশী গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কুষাণ বংশের শেষ সম্রাট বাসুদেবের নামই কেবল ভারতীয় নয়, ধর্মেও তিনি ছিলেন শৈব মতাবলম্বী হিন্দু। কারণ তাঁর নামাঙ্কিত প্রায় প্রত্যেক মুদ্রায় দেখা যায় শিব এবং শিবের ষাঁড়ের প্রতিমূর্তি!

আনুমানিক ২২০ খ্রীষ্টাব্দে বাসুদেবের মৃত্যু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতন। যদিও তারপরেও কিছুকাল পর্যন্ত ভারতের এখানে-ওখানে কুষাণদের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু কুষাণদের কেউ আর সম্রাট নামে পরিচিত হতে পারেন নি।

মোগল বা শকদের রাজত্বের সময়েই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে গোধূলির ম্লান আলো। প্রাচীনতর হলেও মৌর্য-যুগের ভারতবর্ষ যেন স্পষ্ট রূপে ও রেখায় আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, শক-ভারতবর্ষে তেমন ভাবে নজর চলে না—সেটা ছিল যেন আলো-মাখানো ছায়ার যুগ, তার খানিকটা স্পষ্ট আর খানিকটা অস্পষ্ট।

কিন্তু কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে এল সত্যিকার তমিস্র-যুগ। যেন এক অমাবস্যার মহানিশা এসে সমগ্র আর্যাবর্তকে তার বিপুল আঁধার-আঁচলে ঢেকে দিলে। অবশ্য, এ-সময়টায় হিন্দুস্থানে কোন সাম্রাজ্য ও সম্রাট না থাকলেও ছোট ছোট রাজ্যের ক্ষুদে ক্ষুদে রাজার যে অভাব ছিল না, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। নানা পুরাণে এ-সময়কার যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাও ভাসা ভাসা, রহস্যময়। ঐ-ক্ষুদে রাজাদের কারুর ভিতরে এমন শক্তি ও প্রতিভা ছিল না যে, সমগ্র ভারতের উপরে বিপুল একছত্র তুলে ধরেন। এক এক দেশের সিংহাসন পেয়ে—এবং বড়-জোর প্রতিবেশী ছোট ছোট রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ বা ঝগড়া করেই তাঁরা তুষ্ট ছিলেন। এই গভীর অন্ধকার জগতে মাঝে মাঝে যেন, বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে দেখা যায় আভিরাস, যবন, শক, বহ্লীক ও গর্দবিবলাস প্রভৃতি অদ্ভুত বা বিদেশী বংশকে!

বৃহৎ ভারতের আত্মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনুমানে বোঝা যায়, তখন ক্রমেই বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন হচ্ছিল এবং হিন্দুধর্মের হচ্ছিল ক্রমোন্নতি। কিন্তু তখনকার দেশাচার, কলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা, রাষ্ট্রিয় বা সামাজিক ইতিহাস জানবার কোন উপায়ই এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র মৌর্য বংশ লোপ পাবার পরেও এবং সেই অন্ধকার যুগেও যে একটি প্রসিদ্ধ নগর বলে গণ্য হ'ত, এ কথা জানা যায়। কিন্তু পাটলিপুত্রের রাজার নাম পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে ও কাবুলে ছিলেন শকবংশীয় কোন কোন রাজা। এ কথাও জানা গিয়েছে যে, কাবুলের ভারতীয় শক রাজারা ছিলেন বিলক্ষণ ক্ষমতাবান। (৩৬০ খ্রীষ্টাব্দেও কাবুলের শক রাজার দ্বারা প্রেরিত ভারতীয় যুদ্ধহস্তী ও সৈন্যের সাহায্যে পারস্যের অধিপতি দ্বিতীয় সাপর প্রাচ্য রোম-সৈন্যদের পরাজিত করেন।)

প্রায় এক শতাব্দী এই অন্ধকার রহস্যের মধ্য দিয়ে অতীত হয়ে যায়। এই হারানো ভারতকে আর অতীতের গর্ভ থেকে উদ্ধার করা যাবে না। বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসে কেবল অন্ধকারের আর্তনাদ!

য়ুরোপের অবস্থাও তখন ভালো নয়। গ্রীস তখন গৌরবহীন এবং পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য হয়েছে বর্বর, অন্ধকার যুগের মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কন্স্তান্তাইন্ দি গ্রেটের মৃত্যুর পর য়ুরোপীয় রোম-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল নামে মাত্র।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা যখন মৃত্যুন্মুখ, মহাভারতে জাগলো তখন নবজীবনের কলধ্বনি!

প্রায় শতাব্দী কাল পরে ঐতিহাসিক ভারতে এল আবার দ্বিতীয় প্রভাত। আমরা আজ সেই নবপ্রভাতের জয়গান গাইবার জন্যেই আয়োজন করছি।

দীর্ঘরাত্রি শেষে প্রাতঃসন্ধ্যা এসে অন্ধকারের যবনিকা যখন সরিয়ে দিলে, তখন দেখলুম পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বিরাজ করছেন যে রাজা,

ইতিহাসে তিনি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত (আনুমানিক ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁর বাপের নাম ঘটোৎকচ এবং ঠাকুরদাদা ছিলেন শুধু গুপ্ত নামেই পরিচিত।

গুপ্তবংশের উৎপত্তি নিয়ে গোলমাল আছে। কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন নীচ জাতের লোক ; কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন অহিন্দু।

লিচ্ছবি জাতি বুদ্ধদেবের সময়েই বিখ্যাত হয়েছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরে ছিল লিচ্ছবিদের রাজ্য। লিচ্ছবিরা আর্য না হলেও সম্ভ্রান্ত ছিল অত্যন্ত এবং তাদের শক্তিও ছিল যথেষ্ট।

এই বংশের রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিয়ে করে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মানমর্যাদা এত বেড়ে গেল যে, তুচ্ছ 'রাজা' উপাধি আর তাঁর ভালো লাগল না ; তিনি গ্রহণ করলেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি এবং স্বাধীন নরপতির মতো নিজের ও রানী কুমারদেবীর নামাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চলল রাজ্য বাড়াবার চেষ্টা। এ চেষ্টাও বিফল হল না। দেখতে দেখতে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরহুত ও অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ হস্তগত করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রমাণিত করলেন যে, সত্য সত্যই তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি লাভের যোগ্য। ওদিকে তাঁর রাজ্যসীমা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল (আজ যেখানে এলাহাবাদের অবস্থান) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যাভিষেকের পরে নিজের নামে তিনি এক নূতন অব্দও চালালেন—তা গুপ্তাব্দ বলে পরিচিত।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বেশিদিন রাজ্যসুখ ভোগ করতে পারেন নি। কিন্তু ছোট্ট একটি খণ্ড রাজ্যের মালিক হয়েও তিনি যখন মাত্র দশ-পনেরো বছরের ভিতরেই নিজের রাজ্যকে প্রায় সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন তাঁর যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ বীরত্ব ও যথেষ্ট যুদ্ধ-কৌশলের অভাব ছিল না, এ সত্য বোঝা যায় সহজেই। ম্যাসিদনের অধিপতি ফিলিপ তাঁর সমধিক বিখ্যাত পুত্র আলেকজাণ্ডারের জন্যে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপরে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন যে, বিশেষজ্ঞদের

মতে ফিলিপের মতন রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধ-কৌশলী পিতা না পেলে আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয়ী হতে পারতেন কিনা, সন্দেহ! গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তও আর এক অতি-বিখ্যাত পুত্রের পিতা। অতি অল্পদিনে খণ্ড-বিখণ্ড ভারতবর্ষে তিনি এমন এক অখণ্ড ও বিপুল রাজ্য স্থাপন করে গেলেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই আকারে ও বল-বিক্রমে তা প্রায় সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য সাম্রাজ্যের সমান হয়ে উঠেছিল এবং তার স্থায়িত্ব হয়েছিল কিছু-কম দুইশত বৎসর! ব্যাপক ভাবে ধরলে বলতে হয়, ভারতবর্ষের উপরে গুপ্ত-যুগের অস্তিত্ব ছিল তিনশত পঞ্চাশ বৎসর।

বলেছি, গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব নিশান্তকালে প্রাতঃসন্ধ্যায়। কিন্তু ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতের গৌরবময় অপূর্ব সূর্যোদয় তখনও হয়নি। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তরুণ সূর্যের জন্যে অরুণ আসর সাজিয়ে রাখলেন। তারপরই হল গৌরবময় সূর্যোদয়। আর্যাবর্ত তারপরে আর কখনো দেখেনি তেমন আশ্চর্য সূর্যকে। তারই বিচিত্র কিরণে সৃষ্ট হয়েছিল ভারতের যে সব নিজস্ব বা বিশেষত্ব, আজও বিশ্ব-সভায় তাই নিয়ে আমরা গর্ব করে থাকি। ভারতের অমর কালিদাস গুপ্ত-যুগেরই মানুষ। কেবল কি কালিদাসের কাব্য? 'মৃচ্ছকটিক,' 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি অতুলনীয় সাহিত্য-রত্নের সৃষ্টি গুপ্ত-যুগেই। প্রাচীনতম পুরাণ 'বায়ু-পুরাণ' এবং 'মনু-সংহিতা'ও তাই। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষজ্ঞ হিসাবে গুপ্তযুগের বরাহমিহির ও আর্যভট্টের নাম বিশ্ববিখ্যাত। স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় গুপ্ত যুগের প্রতিভাকে প্রমাণিত করবার জন্য আজও বিদ্যমান আছে অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, সারনাথ, ভরহুত, অমরাবতী ও শিগিরি প্রভৃতি। দিল্লীর বিস্ময়কর লৌহ-স্তম্ভের জন্ম গুপ্তযুগেই। সঙ্গীতকলাও হয়ে উঠেছিল সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ। কত আর নাম করব?

এতক্ষণ গেল ইতিহাসের কথা। পরের পরিচ্ছেদেই আমাদের গল্প শুরু হবে এবং দেখা দেবেন আমাদের কাহিনীর নায়ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন ছুটেছে সুদূর, সুদূর, সুদূর পারে—
সূর্যালোকে, চন্দ্রকরে, অন্ধকারে !
ইচ্ছা যে তার বিশ্ববাটে ঝোড়ো-হাওয়ার সঙ্গে হাঁটে
বন্দী দেহ উঠছে কেঁদে বন্ধ-দ্বারে !

পাটলিপুত্র ! সমগ্র ভারতবর্ষে এ-নামের তুলনা নেই এবং গৌরবে এই নগর দিল্লীর চেয়েও বড় !

ঐতিহাসিক যুগে দিল্লীর মর্যাদা বেড়েছে মুসলমান সম্রাটদের দৌলতেই, কিন্তু পাটলিপুত্রের কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছেন ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাটরাই।

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যখন পাটলিপুত্রকে দেখেন, তখন তার মতন বৃহৎ নগর আর্যাবর্তে আর দ্বিতীয় ছিল না।

গ্রীক বর্ণনা থেকে পাটলিপুত্র সম্বন্ধে আরো অনেক কথা জানা যায়। গঙ্গানদী যেখানে শোন্ নদের সঙ্গে এসে মিলেছে, পাটলিপুত্রের অবস্থান সেইখানেই। আজ পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আছে পাটনা শহর।

সেকালে যে সব নগর থাকত সমুদ্র বা নদীর তীরে, সাধারণত তাদের ঘর-বাড়ি তৈরি করবার সময়ে ইটের বদলে কাঠের ব্যবহারই হোত বেশি। কাঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়, তাই তখনকার স্থাপত্য-শিল্পের কোন নিদর্শন আজ আর দেখবার উপায় নেই।

প্রকাণ্ড পাটলিপুত্র নগর, তার ভিতরে বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। খ্রীষ্ট জন্মাবার পাঁচশত বৎসর আগে তার প্রতিষ্ঠা হয়। দৈর্ঘ্যে সে ছিল নয় মাইল এবং প্রস্থে দেড় মাইল। তার চারিদিক উঁচু ও

পুরু কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বহিঃশত্রুকে বাধা দেবার জন্যে প্রাচীর-গাত্রের সর্বত্রই ছিদ্র ছিল, ভিতর থেকে তীর-নিক্ষেপের সুবিধা হবে বলে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছিল বুরুজ, তাদের সংখ্যা ৬৭০। প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্যে নগর-দ্বার ছিল ৬৪টি। প্রাচীরের পরেই যে পরিখাটি নগরকে বেষ্টন করে থাকত সেটি চওড়ায় ছয়শো ফুট এবং গভীরতায় ত্রিশ হাত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাটলিপুত্র তার কোলের উপরে দেখেছিল রাজবংশের পর রাজবংশের উত্থান ও পতন।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠার আগে ভারতবর্ষে এসেছিল যখন অন্ধ যুগ, তখনও পাটলিপুত্র ছিল একটি বিখ্যাত ও বৃহৎ নগর এবং তখনও যিনি পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন, লোকচক্ষে তিনি হতেন পৃথিবীরই অধিকারী।

গুপ্তযুগে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান স্বচক্ষে পাটলিপুত্রকে দেখে যে উজ্জ্বল বর্ণনা করে গেছেন তা পড়লেই বোঝা যায়, মৌর্য বংশের পতনের পরেও সে ছিল গৌরবের উচ্চ-চূড়ায়।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দেও রাজধানী পাটলিপুত্রের বুকে দাঁড়িয়ে মৌর্য সম্রাট অশোকের প্রস্তরনির্মিত অপূর্ব প্রাসাদ করত পথিকের বিস্মিত দৃষ্টিকে আকর্ষণ! সাধারণের বিশ্বাস ছিল, এ প্রাসাদ মানুষের হাতে গড়া নয়!

কেবল কাঠের বাড়ি নয়, পাটলিপুত্র তখন বহু ইঁট-পাথরের বাড়ির জন্যেও গর্ব করতে পারত, কারণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প তখন যথেষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে।

পথে পথে ছুটছে আরোহীদের নিয়ে উট, অশ্ব ও রথ! মাঝে মাঝে দেখা যায় রাজহস্তীর শ্রেণী!

রাজপথের এক জায়গায় রয়েছে প্রকাণ্ড একটি হাসপাতাল। তার দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে একজন ঘোষণা করছে ঃ

"গরীব, অসহায়, পঙ্গু রোগীরা এখানে আগমন করুক। এখানে

তাদের যত্ন-পরিচর্যা করা, চিকিৎসককে দেখানো আর ঔষধ-পথ্য দেওয়া হবে। তারা সম্পূর্ণ আরামে বাস করতে পারবে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত!”

বলা বাহুল্য, সারা পৃথিবীর কোন দেশেই তখন এমন হাসপাতাল ছিল না।

পৃথিবীতে প্রথম সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন বৌদ্ধ সম্রাট অশোক। পাটলিপুত্রের রাজা এখন হিন্দু হলে কি হয়, অশোকের মানবতার প্রভাব তাঁকেও অভিভূত করে। কেবল হাসপাতাল নয়, নগরের নানা স্থানে আরো অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে এবং রাজধানীতে যে বৌদ্ধ প্রভাবও সামান্য নয়, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বড় বড় বৌদ্ধ মঠগুলিকে দেখলে। কোন মঠে থাকেন মহাযান এবং কোন মঠে হীনযান সম্প্রদায়-ভুক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। সেই সব মঠে বাস করে শত শত শিক্ষার্থীও। সন্ন্যাসীদের পাণ্ডিত্য ছিল এমন অসাধারণ যে, ভারতের দূর-দূরান্তর থেকে—এমন কি ভারতের বাহির থেকেও ছাত্ররা আসত বিদ্যালাভ করতে। পাটলিপুত্রের এমনি একটি মঠে থেকে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান সংস্কৃত শেখবার জন্যে পুরো তিনটি বৎসর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

পাটলিপুত্রের প্রজারা পরম সুখে কালযাপন করত। ফা-হিয়ানের বিবরণ পড়লে মনে হয়, পুরাকালের কল্পিত রাম-রাজত্বেও প্রজারা এর চেয়ে সুখে বাস করত না। গৃহস্থরা রাত্রে বাড়ির সদর-দরজা খোলা রেখেও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারত—সভ্যতা-গর্বিত ইংরেজ রাজত্বেও আজ যা অসম্ভব। গুরুতর অপরাধের সংখ্যা ছিল এত কম যে, প্রাণদণ্ডের কথা লোকে জানতই না। বারংবার ডাকাতি করলে বড় জোর অপরাধীর ডান হাত কেটে নেওয়া হোত। কিন্তু এই চরম দণ্ড দেবার দরকার হোত না প্রায়ই। অধিকাংশ অপরাধেরই শাস্তি ছিল জরিমানা মাত্র!

নগরের মাঝখানে গুপ্ত-রাজপ্রাসাদ। এটিও পাথরের তৈরি।

তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় গুপ্ত-সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগে ভারতের যে নিজস্ব শিল্প-রীতি অপূর্বতা সৃষ্টি করেছিল পূর্ণ মহিমায়, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের আগেই তার প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। এইটেই স্বাভাবিক। ফুল আগে কুঁড়ির আকারে দেখা না দিয়ে একেবারে ফোটে না। মৌর্য সম্রাট অশোকের যুগেও ভারত-শিল্পের নিজস্ব রীতি আত্মপ্রকাশ করে নি এবং মৌর্য রাজপ্রাসাদ ও ভাস্কর্যের উপরে পারসী প্রভাব ছিল অল্পবিস্তর। তারপর উত্তর ভারতের শিল্পের উপরে পড়ে গ্রীক প্রভাব,—তার প্রমাণ গান্ধার-ভাস্কর্য। কিন্তু তারপর থেকেই ভারত-শিল্পীর দৃষ্টি ফিরে আসতে শুরু করে ঘরের দিকে। সেই দৃষ্টি-পরিবর্তনের সুফল দেখি অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, সারনাথ, ভরহুত্, অমরাবতী ও শিগিরি প্রভৃতি স্থানে।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে একটি তপোবনের মতন মনোরম জায়গা। সেখানে নানাজাতের শত শত তরুলতা করেছে স্নিগ্ধ শ্যামলতা সৃষ্টি, সেখানে ঘাসের নরম গালিচার উপরে খেলা করছে আলো আর ছায়া, সেখানে উপরে বসে গান গায় স্বাধীন বনের পাখি, নীচে নেচে নেচে বেড়িয়ে বেড়ায় ময়ূর ও হরিণের দল, সরোবরে জললীলায় মাতে মরাল-মরালীরা। সরোবরের ধারে একখানি কাঠের বাড়ি, তার সর্বত্র শিল্পীর হাতের কারুকার্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, সে সব কারুকার্য দেখতে কেমন? তাহলে তাঁকে বলব, আজও ভারতে যে-সব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান আছে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে। কারণ সে-সব স্থাপত্য পাথরে গড়া হলেও তাদের শিল্পীরা অনুকরণ করেছে পূর্ববর্তী যুগের কাঠের শিল্পকেই।

সরোবরের জলে মিষ্টি হাওয়ায় আবেশে কেঁপে কেঁপে উঠছে ফোটা-অফোটা কমলেরা এবং তাদের উপরে ঝরে পড়ছে নরম রোদের সোনালী স্নেহ। ঘাটের সিঁড়ির উপরে বসে একটি তরুণী আনমনে দেখছিল, পদ্ম-ফোটার খবর পেয়ে কোথা থেকে উড়ে আসছে মধুলোভী ভ্রমররা।
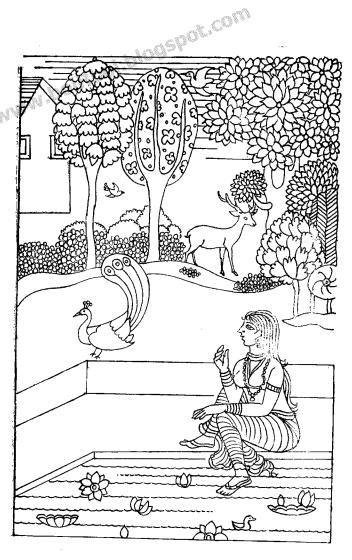
তরুণী হাসিমুখে কান পেতে শুনলে যে, এই সুন্দর প্রভাতে…

এমন সময়ে বাড়ির ভিতরে কার হাতে জেগে উঠলএক মধুর বীণা!

তরুণী হাসিমুখে কান পেতে শুনলে যে, এই সুন্দর প্রভাতে আনন্দময়ী ভৈরবী রাগিণীর মধ্যেও যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে বীণকারের মন। হাসতে হাসতে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাড়ির ভিতরে গেল।

বাগানের ধারে একখানি ঘরে উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসে একটি যুবক আপন মনে বীণার তারে তারে করে যাচ্ছে অঙ্গুলিচালনা।

যুবকের বর্ণ শ্যাম, মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম, উন্নত কপাল, ডাগর চোখ, টিকালো নাক, ওষ্ঠাধরের উপরে নূতন গোঁফের রেখা। তার কানে দুলছে হীরক-খচিত সুবর্ণ কুণ্ডল, গলায় দুলছে রত্নহার, পরনে দামী রেশমী সাজ। তার সুদীর্ঘ দেহের ভিতর থেকে বলিষ্ঠ যৌবনের উদ্দাম শক্তি যেন মাংস-পেশীগুলোকে ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার দিকে তাকালেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, সে হচ্ছে অসাধারণ যুবক, তার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন মানুষ দুর্লভ।

যুবক দুই চোখ মুদে এমন একমনে বীণা বাজাচ্ছিল যে জানতেও পারলে না, তরুণী ঘরে ঢুকে একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

তরুণী হাসিমুখে ডাকলে "চন্দ্রপ্রকাশ!"

যুবক চমকে উঠে চোখ খুলে তরুণীর দিকে তাকালে,—কিন্তু সে দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, তার স্বপ্নমাখা চোখ যেন তরুণীকে ছাড়িয়ে, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে চলে গিয়েছে দূরে, বহুদূরে!

—"চন্দ্রপ্রকাশ!"

—"পদ্মাবতী!" একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে যুবক বীণার তার থেকে হাত তুললে।

—"চন্দ্রপ্রকাশ, তুমি আমার বাবার যোগ্য ছাত্রই বটে! ভোর-বেলার শাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ে বীণা বাজিয়ে কান্না শুরু করেছ!"

—"তাহলে আমার কান্না তুমি শুনতে পেয়েছ?"

—"কান্না তো তোমার নিত্যই শুনি, দিনে দিনে তুমি যেন হাসিকে ভুলে যেতে বসেছ!"

—"না পদ্মা, এ আমার মনের কান্না নয়, এ হচ্ছে আমার দেহের কান্না !"

—"দেহের কান্না ?"

—"হ্যাঁ, বন্দী দেহের কান্না। আমার যৌবনের কান্না !"

—"যৌবন তো হাসে চন্দ্রপ্রকাশ, যৌবন তো কাঁদে না ?"

—"হাসতে পারে কেবল স্বাধীন যৌবন। দেহের সঙ্গে আমার যৌবনও অলস হয়ে গণ্ডীর ভিতরে বন্দী হয়ে আছে। এ গণ্ডী আমি ভাঙতে চাই, কিন্তু পারছি না।"

—"তাই এমন সুন্দর প্রভাতটিকে তোমার কান্নার সুরে ভরিয়ে তুলতে চাও ?"

—"তা ছাড়া আর কি করতে পারি পদ্মা ? মহারাজা চান আমি তোমার পিতার শিষ্য হই। তোমার পিতা চান শাস্ত্রালোচনা করে আমি ধার্মিক হই। কিন্তু আমি চাই বিশ্বের রাজপথে মহাপ্রস্থান করতে।"

—"মহাপ্রস্থান করতে ? তুমি আর ফিরতে চাও না ?"

—"ঠিক তা নয় পদ্মা ! ফিরতে পারি, সফল যদি হই—স্বপ্ন যদি সত্য হয়।"

—"যুবরাজ—"

—"আবার তুমি আমার নাম না ধরে আমাকে যুবরাজ বলে ডাকছ ? কে যুবরাজ ? জানো আমার বৈমাত্রেয় ভাই কচ আছেন ?"

—"কিন্তু প্রজারা তাঁকে চায় না।"

—"থাক্, ও-সব কথা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। তার চেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপটি করে ঐখানে গিয়ে বোসো। আমার স্বপ্নকাহিনী শোনো। বিচিত্র এই স্বপ্ন—এর মধ্যে আছে মহাভারতের কণ্ঠস্বর !"

এই চন্দ্রপ্রকাশ কে ? মগধের রাজপুত্র। পাটলিপুত্র এঁকে আরো দুই নামে জানে—বালাদিত্য, পরাদিত্য।

পদ্মাবতী হচ্ছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রকার ও চন্দ্রপ্রকাশের শিক্ষাগুরু বসুবন্ধুর পালিতা কন্যা, রাজপুত্রের বান্ধবী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীর্ণ-জরার নাট্যশালায় জাগ্রত হও রুদ্র !
ভারত ভরে অগ্নি কর বৃষ্টি !
উড়ুক হাতে মৃত্যু-নিশান, মরুক যত ক্ষুদ্র,—
তবেই হবে নতুন প্রাণের সৃষ্টি।

পদ্মাবতী একখানি আসন গ্রহণ করে বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ, প্রভাত হচ্ছে জাগরণের কাল। স্বপ্নের কথা এখন ভুলে যাও।"

চন্দ্রপ্রকাশ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, "না পদ্মা, এখন প্রভাত এলেও বিশাল ভারত আর জাগে না। এমন গভীর তার ঘুম যে স্বপ্ন দেখবার শক্তিও তার নেই। এই ঘুমন্ত আর্যাবর্তে আজ স্বপ্ন দেখছে কেবল তুজন লোক।"

পদ্মাবতী হেসে বললে, "বুঝতে পারছি, তুজনের একজন হচ্ছ তুমি। আর একজন কে ?"

—"আমাদের পিতৃদেব, মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।"

—"তিনিও স্বপ্ন দেখেন নাকি ?"

চন্দ্রপ্রকাশ পরিপূর্ণ স্বরে বললেন, "নিশ্চয় ! নইলে মগধ-সাম্রাজ্য আজ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারত না। এই সাম্রাজ্য-বিস্তার সম্ভব হয়েছে স্বপ্নাদেশের ফলেই।"

পদ্মাবতী কৌতূহলী স্বরে বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ, তোমাদের স্বপ্নের কথা শোনবার জন্তে আমার আগ্রহ হচ্ছে। কি স্বপ্ন তুমি দেখ ?"

—"আমি সেই স্বপ্ন দেখি পদ্মা, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত যা দেখেছিলেন।"

—"আমাকে একটু বুঝিয়ে বল।"

—"কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ভারতের ক্ষাত্রধর্ম বহু যুগ পর্যন্ত তুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর সেই তুর্বলতার সুযোগে পঙ্গপালের

মতো যবন-সৈন্যের পর যবন-সৈন্য এসে ছেয়ে ফেলেছিল আর্যাবর্তের বুক। চারিদিকে তুচ্ছ যত খণ্ডরাজ্য—তারা কেউ কারুকে মানে না, তাদের কেউ জানে না একতার মাহাত্ম্য! পরস্পরের কাছ থেকে দু-চারটে গ্রাম বা নগর কেড়ে নিয়েই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করত। মাথার উপরে ঝুলত যখন যবন-দিগ্বিজয়ীর তরবারি, তখনো হোত না তাদের চেতনা! নির্লজ্জের মতো যবনের আনুগত্য স্বীকার করে রাজারা যদি নিজেদের মুকুট বাঁচাতে পারতেন, তাহলেই হতেন পরম পরিতৃপ্ত। সাড়ে ছয়শো বৎসর আগে এই অধমদের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত—চক্ষে ছিল তাঁর অখণ্ড মহাভারতের স্বপ্ন। নিজের জীবনেই তিনি সফল করেছিলেন তাঁর সেই অপূর্ব স্বপ্নকে! আমি তাঁকে ভীমার্জুনের চেয়ে মহাবীর বলে মনে করি।"

পদ্মাবতী বিস্মিত স্বরে বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ, তুমিও কি আবার সেই অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে চাও?"

—"যা একবার সম্ভবপর হয়েছে, তাকে অসম্ভব বলছ কেন পদ্মা? মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও এই মগধের সন্তান। আর সেই স্বপ্নকে আবার সত্যে পরিণত করতে চান বলেই হয়তো আমার পিতৃদেবও চন্দ্রগুপ্ত নাম ধারণ করেছেন।"

পদ্মাবতী বললে, "কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কি আর পূর্ণ হবে? মহারাজা একে বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর উপরে কঠিন ব্যাধির আক্রমণে শয্যাগত। ভগবান বুদ্ধদেবের কৃপায় তিনি রোগ-মুক্ত হলেও এই বয়সে আর কি সারা ভারতের উপরে এক ছত্র তুলে ধরতে পারবেন?"

চন্দ্রপ্রকাশ দৃপ্ত স্বরে বললেন, "পিতার পুনর্জন্ম হয় পুত্রের মধ্যেই। মহারাজ যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, তা উদ্‌যাপন করব আমিই। ভারতের দিকে দিকে আজ দুর্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করে আছে শত শত নগণ্য রাজা। তাদের মন সংকীর্ণ, চোখ অন্ধ, চরণ গণ্ডীর ভিতরে বন্দী। তাদের কেউ হচ্ছে শক, কেউ হচ্ছে যবন, কেউ হচ্ছে দ্রাবিড়ী। তাদের অবহেলায় ভারতের ক্ষত্রিয়-ধর্ম, প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন,

বিজ্ঞান একেবারে অধঃপাতে যেতে বসেছে। সম্রাট অশোকের যুগে আর্যাবর্তের নামে সারা পৃথিবীর মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ত, কিন্তু আজ ভারতকে কেউ চেনে না। আর্যাবর্তেই আর্য আদর্শ নেই! দীর্ঘকাল অনার্য শকদের কবলে পড়ে ভারতের অমর আত্মাও আজ মরো-মরো, অচেতন! ভারতব্যাপী এই ক্ষুদ্রতার উপর দিয়ে আমি জ্বলন্ত উল্কার মতন ছুটে যেতে চাই, চারিদিকে আগুন ছড়াতে ছড়াতে! আমি নিষ্ঠুর হবো, ভয়ানক হবো, আগে করব ধ্বংস—কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস আর ধ্বংস! তারপর সেই সমস্ত জড়তা, দীনতা হীনতা আর ক্ষুদ্রতার রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আবার আমি গড়ে তুলব আমার স্বপ্নে-দেখা সত্যিকার ভারতকে!"

হঠাৎ চলন্ত কাষ্ঠপাদুকার শব্দ উঠল। চন্দ্রপ্রকাশ ভাবের আবেগে প্রায় বাহ্য-জ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছিলেন, সে শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না। কিন্তু পদ্মাবতী খড়মের আওয়াজ পেয়েই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "চুপ কর চন্দ্রপ্রকাশ, চুপ কর! বাবা আসছেন!"

পীতবস্ত্র ও উত্তরীয়ধারী বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ এবং বিখ্যাত গ্রন্থকার বসুবন্ধু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথার চুল ও দাড়ি-গোঁফ কামানো, বয়স ষাটের কম নয়। মুখখানি প্রশান্ত—যদিও সেখানে এখন ফুটে উঠেছে বেদনার আভাস!

ঘরে ঢুকে বসুবন্ধু একবার চন্দ্রপ্রকাশের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একটু নীরব থেকে বললেন, "বৎস, আসতে আসতে আমি তোমার কথা শুনতে পেয়েছি। আমার এই আশ্রমে বসে তুমি ধ্বংসের মন্ত্র উচ্চারণ করছ!"

চন্দ্রপ্রকাশ মুখ নামিয়ে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব! আমি ধ্বংস করতে চাই ভারতব্যাপী দীনতা আর জড়তাকে!"

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বসুবন্ধু বললেন, "আমারও সেই কর্তব্য। জ্ঞানের আলো দেখিয়ে আমি হীনকে করে তুলতে চাই মহৎ। কিন্তু

তুমি কিসের সাহায্যে দীনতা আর জড়তাকে ধ্বংস করবে?"

—"গুরুদেব, আমি রাজপুত্র। আমার অবলম্বন তরবারি।"

দুঃখিত স্বরে বসুবন্ধু বললেন, "আমি তোমাকে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি বৎস, অস্ত্রশিক্ষা দিই নি। আমার শাস্ত্র রচনা করেছেন ভগবান বুদ্ধদেব, সর্বজীবে অহিংসাই ছিল যাঁর বাণী।"

—"আবার বলি গুরুদেব, আমি রাজপুত্র। রাজধর্ম হচ্ছে রাজ্যবিস্তার করা। তরবারি কোষবদ্ধ থাকলে রাজধর্ম পালন করা হয় না।"

—"বৎস, তুমি ভুল বলছ। সম্রাট অশোক কি রাজধর্ম পালন করেন নি? তাঁর অধীনে কি বিরাট ভারত-সাম্রাজ্য পৃথিবীতে অতুলনীয় হয়ে ওঠে নি? তিনি কি অস্ত্র ত্যাগ করে অহিংসার আশ্রয় নেন নি?"

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সম্রাট অশোককে আর রাজ্যবিস্তার করতে হয় নি, সে কর্তব্য প্রায় শেষ করে গিয়েছিলেন তাঁর পিতামহ চন্দ্রগুপ্তই। কিন্তু সম্রাট অশোক তরবারি ত্যাগ করেছিলেন বলেই তাঁর মৃত্যুর পরেই হয়েছিল মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন।"

বসুবন্ধু বললেন, "আমার কাছে সাম্রাজ্যের পতন খুব বড় কথা নয় রাজকুমার! আমি চাই কেবল আত্মাকে পতন থেকে রক্ষা করতে। রক্তসাগরে সাঁতার দেয় পশুর আত্মাই, সেখানে ঠাঁই নেই মনুষ্যত্বের! বৎস, তোমাকে এই শিক্ষাই আমি বার বার দিয়েছি, আমার শিক্ষা কি তবে ব্যর্থ হবে?"

চন্দ্রপ্রকাশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "গুরুদেব, সিংহের শিশু কি নিরামিষের ভক্ত হতে পারে? অস্ত্রহীন ক্ষত্রিয়-সন্তান, এ-কথা কি কোনদিন কল্পনাতেও আসে? প্রেমের মন্ত্রে বিশ্বের হৃদয় জয় করা যায়, ভগবান বুদ্ধদেব যা করে গেছেন। কিন্তু ভারতব্যাপী হিংস্র পশুত্বকে দমন করতে পারে কেবল শক্তির মন্ত্র। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যদি অস্ত্রত্যাগ করতেন, তাহলে কে করত

এখানে ধর্মরাজ্য স্থাপন? চন্দ্রগুপ্তের তরবারি যদি হিন্দুস্থানের সমস্ত দীনতাকে হত্যা না করত, তবে কি করে প্রতিষ্ঠিত হোত অশোকের প্রেমধর্ম? গুরুদেব, গুরুদেব, আগে আমাকে আগাছা কেটে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে দিন, তারপর সেখানে ছড়াবেন আপনার প্রেমের বীজ।"

ঘরের বাইরে হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ উঠল। তারপরেই দরজার কাছে এসে অভিবাদন করলে এক রাজভৃত্য। তার মুখে-চোখে দারুণ দুর্ভাবনার চিহ্ন!

চন্দ্রপ্রকাশ উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে? তুমি এখানে কেন?"

—"মহারাজের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত। মহারাজা আপনাকে স্মরণ করেছেন!"

চন্দ্রপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বসুবন্ধুর চরণে প্রণাম করে বললেন, "গুরুদেব, গুরুদেব! আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার! মগধের মঙ্গলের জন্যে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করুন!" তারপরে উঠেই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন।

বসুবন্ধু চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, "পদ্মা, সত্যই আজ মগধের অতি দুর্দিন! মহারাজের যদি মৃত্যু হয়, তবে সিংহাসনে বসবে কে? চন্দ্রপ্রকাশ, না তার বৈমাত্রেয় বড় ভাই কচ?"

পদ্মাবতী বললেন, "প্রজারা চন্দ্রপ্রকাশকেই যুবরাজ বলে জানে, আর মহারাজের উপরে চন্দ্রপ্রকাশের মা কুমার দেবীর প্রভাব কত বেশি, সে কথা তো আপনিও জানেন বাবা!"

বসুবন্ধু বললেন, "কিন্তু রাজকুমার কচ তো শান্ত মানুষ নন, নিজের দাবি তিনি ছাড়বেন বলে মনে হয় না! পদ্মা, মগধ রাজ্যে শীঘ্রই মহা অশান্তির সম্ভাবনা—ভ্রাতৃবিরোধ, ঘরোয়া যুদ্ধ, রক্তপাত!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র কাজে মরতে যে চায়
হয় সে পশু, নয় সে দানব !
বৃহৎ ব্রত-উদ্‌যাপনে
মরতে পারে কেবল মানব !

পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ ঘিরে রয়েছে আজ বিরাট জনতা। উৎসব করে জনতা সৃষ্টি, কিন্তু এ উৎসবের জনতা নয়। কারণ জনতার প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে রয়েছে আসন্ন বিপদের আভাস।

রাজবাড়ির সিংহদ্বারের পিছনে ও প্রাঙ্গণের উপরে দেখা যাচ্ছে সজ্জিত ও সশস্ত্র সৈন্যের জনতা, সেখানে অসংখ্য শূল ও নগ্ন তরবারির উপরে প্রভাত-সূর্য জ্বেলে দিয়েছে যেন অসংখ্য বিদ্যুৎ-দীপের চঞ্চল শিখা !

রাজবাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার নাগরিক এবং দেখলেই বোঝা যায় শোক ও দুশ্চিন্তায় তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে।

কাতর হবারই কথা। কেবল মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের অন্তিম কাল উপস্থিত হয়েছে বলেই প্রজারা ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি। এই প্রজাবৎসল মহারাজাকে তারা সবাই ভালোবাসত বটে, কিন্তু এ-কথাও সকলে জানত যে, কালপূর্ণ হলে পৃথিবীতে কেউ বর্তমান থাকতে পারে না। তাদের দুর্ভাবনার অন্য কারণ আছে।

আমরা যে-যুগের কথা বলতে বসেছি তখন পৃথিবীর সব দেশেই রাজার মৃত্যু হলে প্রজার আতঙ্কের সীমা থাকত না। কারণ প্রায়ই মৃত রাজার সিংহাসন লাভের জন্যে রাজপুত্রদের ও রাজবংশীয় অন্যান্য লোকদের মধ্যে ঘরোয়া যুদ্ধের অবতারণা হোত এবং সেই যুদ্ধ ক্রমে

ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত রাজ্যের মধ্যে। নূতন রাজাকে সিংহাসনে বসতে হোত মানুষের রক্ত-সমুদ্রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে।

তাই এই সঙ্কট-মুহূর্তে সমগ্র পাটলিপুত্রের প্রজারা আজ রাজ-বাড়ির কাছে ছুটে এসেছে এবং উত্তেজিত ভাবে অদূর-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে করছে নানান্ রকম জল্পনা-কল্পনা।

এমন সময়ে অদূরে দেখা গেল, বিবর্ণ মুখে দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন রাজকুমার চন্দ্রপ্রকাশ।

সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দূরে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে চীৎকার উঠল—"জয়, যুবরাজের জয়!"

চন্দ্রপ্রকাশ সিংহদ্বারের সামনে গিয়ে বিস্মিত নেত্রে দেখলেন, তাঁর পথ জুড়ে অটল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে একদল সশস্ত্র প্রহরী।

তিনি অধীর স্বরে বললেন, "তোমরা মূর্খের মতন পথ বন্ধ করে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

প্রহরীদের দলপতি এক পা না সরেই বললে, "রাজবাড়ির ভিতরে এখন আর কারুর ঢুকবার আদেশ নেই।"

ক্রুদ্ধস্বরে চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "আদেশ নেই! কে দিলে এই আদেশ?"

—"মগধ-রাজ্যের যুবরাজ!"

জনতার ভিতর থেকে চীৎকার করে কে বললে, "মূর্খ দৌবারিক! পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও। মগধের যুবরাজকে সামনে দেখেও চিনতে পারছ না?"

প্রহরী নির্ভীক কণ্ঠে বললে, "মগধের যুবরাজ হচ্ছেন কচগুপ্ত। আমরা তাঁরই আদেশ মানব।"

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "মহারাজা আমাকে আহ্বান করেছেন। তোমরা যদি পথ না ছাড়ো, আমি কোষ থেকে তরবারি খুলতে বাধ্য হবো।"

প্রহরী দৃঢ় স্বরে বললে, "আমরাও তাহলে রাজকুমারকে বাধা দিতে বাধ্য হবো।"

চন্দ্রপ্রকাশ কিছু বলবার আগেই জনতার ভিতর থেকে জেগে উঠল বহু কণ্ঠে ক্রুদ্ধ গর্জন-ধ্বনি। তুচ্ছ এক প্রহরী মগধের রাজকুমারের মুখের উপরে স্পর্ধার কথা বলতে সাহসী হয়েছে দেখে অনেকে তাকে আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে এল। প্রহরীরাও আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

তখন কি রক্তাক্ত দৃশ্যের সূচনা হত বলা যায় না, কিন্তু সেই মুহূর্তেই রাজবাড়ির ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন এক প্রাচীন পুরুষ—তাঁর মাথায় শুভ্র কেশ, মুখে শুভ্র শ্মশ্রু, পরনে বহুমূল্য শুভ্র পোশাক। সকলেই চিনলে, তিনি হচ্ছেন মগধের প্রধান মন্ত্রী।

প্রহরীরা সসম্মানে তাঁকে অভিবাদন করলে।

মন্ত্রী বললেন, "এ কি বীভৎস ব্যাপার! উপরে মুমূর্ষু মহারাজ, আর এখানে এই অশান্তি!"

দৌবারিকদের নেতা বললে, "আমরা কি করব প্রভু? যুবরাজের আদেশেই আমরা দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে আছি!"

মন্ত্রী-মহাশয় দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে বললেন, "মহারাজা জীবিত থাকতে এ-রাজ্যে তাঁর উপরে আর কারুর কথা বলবার অধিকার নেই। মহারাজ স্বয়ং রাজকুমার চন্দ্রপ্রকাশকে স্মরণ করেছেন। যদি মঙ্গল চাও, তাহলে এখনি তোমরা রাজকুমারের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!"

প্রহরীরা একবার পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে। তারপর পথ ছেড়ে দিলে বিনাবাক্যব্যয়ে।

চন্দ্রপ্রকাশ কোনদিকে না তাকিয়েই ছুটে চললেন রাজবাড়ির দিকে এবং যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন, মহারাজা এখনো পৃথিবীতে বর্তমান, কিন্তু এরি-মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কত বড় একটা ষড়যন্ত্রের আয়োজন হয়েছে!

মহারাজের শয়ন-আগারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সুবর্ণ-খচিত ও হস্তীদন্তে অলঙ্কৃত প্রশস্ত পালঙ্কের উপরে দুই চোখ মুদে শুয়ে আছেন মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত—তাঁর মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। মহারাজের শিয়রের কাছে পাখা হাতে করে সাশ্রু-নেত্রে বসে আছেন পাটরানী ও চন্দ্রপ্রকাশের মা কুমার দেবী এবং তাঁর পাশে অন্যান্য রানী ও
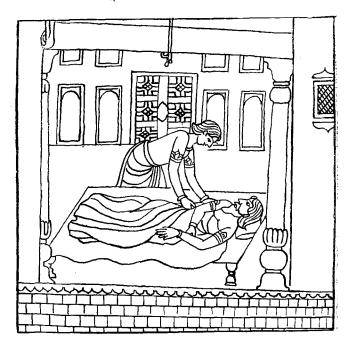
'চন্দ্রপ্রকাশ, এতক্ষণ আমি তোমারি অপেক্ষায় ছিলুম।'

পুরমহিলারা। পালঙ্কের একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাজপুত্র কচ এবং ঘরের ভিতরেই খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন অমাত্য ও বড় বড় রাজকর্মচারী।

চন্দ্রপ্রকাশ ছুটে গিয়ে একেবারে খাটের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ে অশ্রুজলে গাঢ় স্বরে ডাকলেন, "মহারাজ, মহারাজ !"

চন্দ্রগুপ্ত সচমকে চোখ খুললেন, তাঁর মৃত্যুকাতর মুখও হাস্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন, "চন্দ্রপ্রকাশ, এতক্ষণ আমি তোমারি অপেক্ষায় ছিলুম !"

—"মহারাজ !"

—"পৃথিবীর রাজ্য আমি পৃথিবীতেই রেখে যাচ্ছি বৎস, এখন আমাকে আর মহারাজ বলে ডেকো না। বল, বাবা !"

—"বাবা, বাবা !"

—"হ্যাঁ, ঐ নামই বড় মিষ্টি।......মন্ত্রীমশাই, আমার হাতে আর বেশি সময় নেই, যা বলি মন দিয়ে শুনুন। আপনারা সবাই এখানে জানতে এসেছেন, আমার অবর্তমানে মগধের সিংহাসনের অধিকারী হবেন কে ? তাহলে চেয়ে দেখুন এই চন্দ্রপ্রকাশের—এই মহৎ যুবকের দিকে। বিদ্যা, বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, বীরত্বে আর চরিত্রবলে অসাধারণ চন্দ্রপ্রকাশকে আপনারা সকলেই জানেন। এখন বলুন, চন্দ্রপ্রকাশ কি অযোগ্য ব্যক্তি ?"

মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য সভাসদদের ভিতর থেকে নানা কণ্ঠে শোনা গেল—"নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয় !"—"মহারাজের জয় হোক !"—"আমরা ওঁকেই চাই !" প্রভৃতি।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "এটাও কারুর অবিদিত নেই যে পবিত্র আর মহা-সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করেই আজ আমার এত মান-মর্যাদা। মগধের রাজধানী এই পাটলিপুত্রও আমি যৌতুকরূপে পেয়েছি সেই বিবাহের ফলে। সুতরাং কুমার দেবীর পুত্রেরও পাটলিপুত্রের সিংহাসনের উপরে একটা যুক্তিসঙ্গত দাবি আছে। নয় কি মন্ত্রীমশাই ?"

প্রধান মন্ত্রী উৎসাহিত স্বরে বললেন, "মহারাজ, আপনার আদেশ এ-রাজ্যের সবাই সানন্দে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। সমস্ত মগধ-

রাজ্যে রাজকুমার চন্দ্রপ্রকাশের চেয়ে যোগ্য লোক আর দ্বিতীয় নেই।”

চন্দ্রগুপ্ত সস্নেহে চন্দ্রপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,“বাছা, শেষ-নিশ্বাস ফেলবার আগে আমি তোমাকে একবার আলিঙ্গন করতে চাই।”

চন্দ্রপ্রকাশ কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়িয়ে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চন্দ্রগুপ্তের চোখও অশ্রুসজল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ থেকে চন্দ্রগুপ্ত হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, “চন্দ্রপ্রকাশ, উঠে দাঁড়াও!”

পিতার কণ্ঠস্বর পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে চন্দ্রপ্রকাশ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, “পিতা?”

—“প্রতিজ্ঞা কর!”

—“কি প্রতিজ্ঞা, পিতা?”

চন্দ্রগুপ্ত নিজের সব শক্তি একত্র করে পরিপূর্ণ স্বরে বললেন, “কঠোর প্রতিজ্ঞা! জানো চন্দ্রপ্রকাশ, আমার জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, বিপুল আর্যাবর্ত জুড়ে করব একছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার, কাপুরুষ সংহার, যবন দমন! মহাভারতে আবার ফিরিয়ে আনব সেই কতকাল আগে হারানো ক্ষাত্র যুগকে! কিন্তু কি সংক্ষিপ্ত এই মানুষ-জীবন! যে ব্রত গ্রহণ করেছিলুম তা সাঙ্গ করে যাবার সময় পেলুম না, তাই আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে চাই আমারই প্রতিনিধি রূপে। পাটলিপুত্রের সিংহাসন পেয়ে তোমার প্রথম কর্তব্য হবে, দিগ্বিজয়ীর ধর্ম পালন করা, স্বাধীন ভারতে আবার আর্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। পারবে?”

চন্দ্রগুপ্তের দুই চরণ স্পর্শ করে চন্দ্রপ্রকাশ সতেজে বললেন, “পারব পিতা, পারব! আপনার আশীর্বাদে ক্ষুদ্র ভারতকে আবার আমি মহাভারত করে তুলতে পারব! যতদিন না আর্যাবর্ত জুড়ে স্বাধীন ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারি, ততদিন পাটলিপুত্রে আর ফিরে আসব না—এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি!”

আনন্দে বিগলিত স্বরে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, “আশীর্বাদ করি পুত্র, তুমি

সক্ষম হও—ভারত আবার ভারত হোক!"—বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ মুদে এল, উপাধানের একপাশে তাঁর মাথাটি নেতিয়ে পড়ল। গুপ্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ঘরের ভিতরে পুরললনা ও রানীদের কণ্ঠে জাগল উচ্চ হাহাকার! কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেই শোকার্তনাদকে ডুবিয়ে বাহির থেকে ছুটে এল বিপুল জনকোলাহল এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-ঝঞ্চনা। প্রধান মন্ত্রী দৌড়ে গবাক্ষের ধারে গিয়ে দেখে বললেন, "একি প্রজা-বিদ্রোহ?"

অতি দ্রুতপদে বাহির থেকে একজন প্রাসাদ-প্রহরী ভয়বিহ্বল মুখে এসে খবর দিলে, "শত শত সৈন্য নিয়ে রাজপুত্র কচ প্রাসাদের ভিতরে ছুটে আসছেন।"

চন্দ্রপ্রকাশ সচকিত নেত্রে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলেন, ইতিমধ্যে সকলের অগোচরে কচ কখন ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছেন।

পালঙ্কের উপর থেকে নেমে এসে কুমার দেবী বললেন, "চন্দ্র-প্রকাশ, কচ আসছে তোমাকেই বন্দী বা বধ করতে। কিন্তু কচকে আমি চিনি, এর জন্যেও আমি প্রস্তুত ছিলুম। শীঘ্র তুমি রাজবাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। সেখানে আমার পিত্রালয়ের লিচ্ছবি সৈন্যরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে গঙ্গা পার হয়ে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হও।"

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "তা হয় না মা। আমি কাপুরুষ নই, সিংহাসন পেয়ে প্রথমেই পলায়ন করা আমার শোভা পায় না।"

কুমার দেবী বিরক্ত স্বরে বললেন, "আমি তোমার মা, আমার আদেশ পালন কর। মহারাজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আগে, তাঁর মৃত-দেহের পাশে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি আমি সহ্য করব না। তার উপরে এইমাত্র মহারাজের পা ছুঁয়ে তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছ মনে রেখ। নির্বোধের মতো তুচ্ছ ঘরোয়া যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে তোমার পক্ষে একই কথা। নিজের প্রাণকে রক্ষা কর উচ্চতর কর্তব্যপালনের জন্যে। যাও, যাও চন্দ্রপ্রকাশ! ওরা যে এসে পড়ল!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বীরের বাহু ধরায় অতুল,
নয় সে কোথাও নিঃস্ব,
মরুভূমেও সৃষ্টি করে
নতুন কত বিশ্ব !

চন্দ্রপ্রকাশের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই ঘরের বাইরে শোনা গেল বহুকণ্ঠে কোলাহল ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি—'জয়, মহারাজা কচগুপ্তের জয় !"

কুমার দেবী নিজের মনেই অভিভূত স্বরে বললেন, "এখনো অভিষেক হয় নি। এখনো মহারাজের মৃতদেহ শীতল হয় নি, এরি মধ্যে কচ হয়েছে মহারাজা ! কী সুপুত্র !"

ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কয়েক জন সশস্ত্র সৈন্য। কিন্তু তারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবার আগেই, কুমার দেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও তোমরা ?"

মহারানীকে দেখে সৈনিকরা থতমত খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। কেবল তাদের একজন বললে, "আমরা এসেছি কুমার চন্দ্রপ্রকাশের—"

বাধা দিয়ে কুমার দেবী বললেন, "না, কুমার নয়—বল যুবরাজ চন্দ্রপ্রকাশ !"

পিছন থেকে ক্রুদ্ধ স্বরে শোনা গেল—"আমি হচ্ছি জ্যেষ্ঠ পুত্র। এ-রাজ্যের যুবরাজ হচ্ছি আমি।'

কুমার দেবী বললেন, "কে, কচ ? কিন্তু কে বললে তুমি যুবরাজ ? শুনছি তো এরি মধ্যে তুমি নাকি মহারাজা উপাধি পেয়েছ !"

কচ এগিয়ে এসে বললেন, "সিংহাসন শূন্য হলে তা প্রাপ্য হয় যুবরাজেরই। সেইজন্যেই আমার সৈনিকরা আমাকে 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করছে।"

প্রধান মন্ত্রী এতক্ষণ পরে কথা কইলেন। হতভম্ব ভাবটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "রাজকুমার, স্বর্গীয় মহারাজের আদেশে এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন চন্দ্রপ্রকাশ। সুতরাং 'মহারাজা' উপাধির উপরে আপনার আর কোনই দাবি নেই।"

কচ কর্কশ স্বরে বললেন, "বৃদ্ধ, আমার মুখের উপরে কথা কইতে তুমি সাহস কর! স্বর্গীয় মহারাজের আদেশ? কে শুনেছে তাঁর আদেশ?"

ঘরের ভিতর থেকে মন্ত্রীরা সমস্বরে বললেন, "আমরা সবাই শুনেছি!"

প্রচণ্ড ক্রোধে প্রায়-আত্মহারা হয়ে কচ চীৎকার করে বললেন, "ষড়যন্ত্র! রাজভৃত্যদের এত বড় স্পর্ধা! সৈন্যগণ ওদের বন্দী কর। আর, সব ষড়যন্ত্রের মূল চন্দ্রপ্রকাশ কাপুরুষের মতো ঘরের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে দেখ।"

কুমার দেবীর দুই চক্ষে জ্বলে উঠল আগুনের ফিনিক। দরজার দিকে দুই বাহু বিস্তার করে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, "স্বর্গীয় মহারাজা শুয়ে আছেন এখানে শেষ-শয়নে। সাধারণ সৈনিক এসে এ ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করবে? আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না! কচ—কচ, তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর।"

কচ অধীর স্বরে বললেন, "সৈন্যগণ, এখন নারীর মিনতি শোনবার সময় নেই, যাও—আমার আদেশ পালন কর!"

কুমার দেবী বললেন, "কচ, আমি নারী হতে পারি, কিন্তু আমি তোমার মাতা!"

কচ উপহাসের হাসি হেসে বললেন, "ভুলে যাবেন না, আপনি আমার বিমাতা।"

কুমার দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "উত্তম। কিন্তু

জেনে রাখো কচ, তোমার সৈন্যদের এ ঘরে ঢুকতে হবে আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে !”

কচ বললেন, “শুনুন মহারানী, আমি এই শেষ-বার অনুরোধ করছি, হয় পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান, নয় চন্দ্রপ্রকাশকে আমাদের হাতে এখনি সমর্পণ করুন।”

—“চন্দ্রপ্রকাশ এ ঘরে নেই।”

—“মিথ্যাকথা !”

তীব্র স্বরে কুমার দেবী বললেন, “কী ! কার সঙ্গে কথা কইছ সে কথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ ? হতভাগ্য পুত্র, তুমি কি জানো না পবিত্র লিচ্ছবি রাজবংশে আমার জন্ম, স্বর্গীয় মহারাজা পর্যন্ত চিরদিন আমার বংশ-মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন ? এত স্পর্ধা তোমার, আমায় বল মিথ্যাবাদী ? তুমি কি ভাবছ, চন্দ্রপ্রকাশ এখানে থাকলে আমার এই অপমান সে সহ্য করত ?”

হা হা করে হেসে উঠে কচ বললেন, “অপমান সহ্য করা ছাড়া তার আর উপায় কি—আমার সৈন্যদের হাতে হাতে জ্বলছে শাণিত তরবারি ! ...নারী, নারী, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও, আমার ধৈর্যের উপরে আর অত্যাচার কোরো না !”

প্রধান মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে বললেন, “মহারানী, আপনি সরে আসুন, ওরা এসে দেখে যাক রাজকুমার ঘরের ভিতরে আছেন কিনা !”

গর্বিত, দৃঢ় স্বরে কুমার দেবী বললেন, “না, না মন্ত্রীমশাই, মহারাজের পবিত্র দেহ যেখানে আছে, এই হিংস্র পশুদের সেখানে আমি কিছুতেই পদার্পণ করতে দেব না। আমার স্বামীর, আমার দেবতার গায়ে পড়বে কুকুরের ছায়া ? অসম্ভব !”

কচ কঠোর স্বরে বললেন, “সৈন্যগণ, এই নারীকে তোমরা বন্দী কর !”

পিছন থেকে সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর জাগল, “দাদা, কাকে তুমি বন্দী করবে ?”

সচমকে ফিরে কচ সবিস্ময়ে দেখলেন, বিস্তৃত অলিন্দের উপরে এসে আবির্ভূত হয়েছেন চন্দ্রপ্রকাশ এবং তাঁর পিছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একদল লিচ্ছবি সৈন্য! প্রত্যেক সৈন্যের মস্তকে ও দেহে শিরস্ত্রাণ বর্ম, হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি।

কুমার দেবী সভয়ে বলে উঠলেন, "চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ। তুমিও আমার কথার অবাধ্য? হা অদৃষ্ট, মহারাজের শেষ নিঃশ্বাস-বায়ু হয়তো এখনো এখান থেকে লুপ্ত হয়নি, এর মধ্যেই রাজবাড়ির সমস্ত রীতি-নীতি বদলে গেল? বেশ, তাহলে তোমরা দুই ভাই মিলে যত-খুশি হানাহানি রক্তারক্তি কর, সে-দৃশ্য আমি আর স্বচক্ষে দেখব না। কিন্তু দয়া করে একদিন তোমরা অপেক্ষা কর, ভ্রাতৃবিরোধ দেখবার আগেই মহারাজের সঙ্গে আমি সহগমন করতে চাই!"

চন্দ্রপ্রকাশ ব্যথিত স্বরে বললেন, "মা, মা, তুমিও আমাকে ভুল বুঝো না মা! আমি তোমার অবাধ্য ছেলে নই!"

—"অবাধ্য ছেলে নও? তবে কেন তুমি আবার এখানে ফিরে এলে?"

—"মা, বাধ্যতারও কি একটা সীমা নেই? লিচ্ছবি সৈন্যদের সঙ্গে আমি তো গঙ্গাপার হয়ে বৈশালী রাজ্যের দিকে যাত্রা করে-ছিলুম; কিন্তু যেতে যেতে হঠাৎ আমার ভয় হল, মগধের রাজবাড়িতে হয়তো তোমার জীবনও আর নিরাপদ নয়। লিচ্ছবি সেনাপতিও সেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাই আমি ফিরে এসেছি আর দেখছি যে, আমার ভয় অমূলক নয়।"

—"অন্যায় করেছ চন্দ্রপ্রকাশ, অন্যায় করেছ। আমার মতো তুচ্ছ এক নারীর জন্যে তুমি কি স্বদেশের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করবে না, নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? শ্রীরামচন্দ্র যেদিন পিতার কাছে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে অরণ্যে যাত্রা করেন, সেদিন কি মা কৌশল্যার দুই চোখ শুকনো ছিল? কিন্তু মায়ের চোখে অশ্রু দেখে শ্রীরামচন্দ্র কি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন?"

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "প্রতিজ্ঞা আমি ভুলিনি মা, আমি কেবল তোমাকে রক্ষা করতে এসেছি।"

—"আমাকে রক্ষা করতে এসে যদি তোমার প্রাণ যায়, তাহলে কে সফল করবে আমার স্বামীর সারা জীবনের সাধনা, কে প্রতিষ্ঠিত করবে একছত্র স্বাধীন ভারতে সনাতন আর্য আদর্শ?"

—"মা, আর তুমি আমার বিপদের কথা ভেবে ভয় পেও না। ফেরবার পথে স্বচক্ষে দেখেছি, সমস্ত পাটলিপুত্রের প্রজারা দলে দলে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে—সকলেই করছে আমার নামে জয়ধ্বনি! দাদার পক্ষে আছে প্রাসাদের কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক রক্ষী-সৈন্য মাত্র! এখানে দাঁড়িয়ে সেই হতভাগ্যরা তোমাকে কেবল ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু সারা পাটলিপুত্রের সামনে তারা ভেসে যাবে বন্যার তোড়ে খড়-কুটোর মতো!"

কচ এতক্ষণ অবাক হয়ে সব শুনছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি আবার চীৎকার করে বললেন, "আক্রমণ কর, আক্রমণ কর! সৈন্যগণ, চন্দ্রপ্রকাশকে বন্দী কর—বধ কর! একমাত্র চন্দ্রপ্রকাশই হচ্ছে আমাদের পথে কণ্টকের মতো, ও কাঁটা তুলে ফেললেই সমস্ত পাটলিপুত্র আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে!" এই বলেই তিনি নিজের খাপ থেকে তরবারি খুলে ফেললেন!

চন্দ্রপ্রকাশও নিজের অসিকে কোষমুক্ত করে বললেন, "দাদা, তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখন আমি আর একলা নই! আমি যখন প্রাসাদে ফিরে আসি, তখনও তোমার অনুচররা অস্ত্র নিয়ে আমাকে বাধা দিতে এসেছিল। কিন্তু তারা এখন রক্তাক্ত মাটির উপরে শুয়ে চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছে!"

কচ তরবারি তুলে এগুতে এগুতে আবার বললেন, "আক্রমণ কর! হত্যা কর!"

কুমার দেবী ছুটে গিয়ে দুই দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "ক্ষান্ত হও, তোমরা ক্ষান্ত হও!"

আচম্বিতে প্রাসাদের বাইরে জাগল সমুদ্র-নির্ঘোষের মতন এমন গম্ভীর কোলাহল যে, সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে! তারপরেই শোনা গেল অসংখ্য অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, ভয়াবহ গর্জন, প্রচণ্ড চীৎকার, বিষম আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কণ্ঠে জয়-নিনাদ!

প্রধান মন্ত্রী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, "পাটলিপুত্রের প্রজারা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে, তারা সিংহদ্বার ভেঙে আঙিনায় ঢুকেছে, যুবরাজ চন্দ্রপ্রকাশের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, প্রাসাদের অনেক প্রহরীর প্রাণ গিয়েছে, অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে!"

কুমার দেবী কঠিন স্বরে বললেন, "অপূর্ব! ঘরের ভিতরে মগধের মহারাজার মৃতদেহ, ঘরের বাইরে মগধের রাজপুত্ররা পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করতে উদ্যত, প্রাসাদের বাইরে মগধের প্রজারা বিদ্রোহী, প্রাসাদের ভিতরে মগধের সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতক! অপূর্ব!! মগধের ভবিষ্যৎ কি উজ্জ্বল! কচ, চন্দ্রপ্রকাশ, এখনো কি তোমাদের রক্ত-তৃষা শান্ত হয় নি?"

চন্দ্রপ্রকাশ তরবারি নামিয়ে বললেন, "মা, আমি তো কারুকে আক্রমণ করতে চাই না।"

—"তাহলে শীঘ্র প্রাসাদের বাইরে গিয়ে প্রজাদের শান্ত করে এস।"

—"তোমাকে এইখানে একলা রেখে?"

—"হ্যাঁ, শীঘ্র যাও! এখনো ইতস্তত করছ? যাও!"

চন্দ্রপ্রকাশ দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

কুমার দেবী ফিরে শান্ত স্বরে বললেন, "বৎস কচ, দেখছ, রাজ্যলোভে তুমি কি সর্বনাশের আয়োজন করেছ?"

কচ নীরবে মাথা নত করলেন।

—"শোনো কচ। মহারাজের নিজের হাতে গড়া এত বড় রাজ্য

যদি ভ্রাতৃবিরোধের ফলে ছারখার হয়ে যায়, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আমার কল্পনায় আসে না। তুমি পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসতে চাও? বেশ, তোমার বাসনাই পূর্ণ হোক। আমাদের কেবল কিছুদিন সময় দাও, মহারাজের অন্ত্যেষ্টি আর পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হোক—তারপর তুমি করবে রাজ্যশাসন, আর আমরা যাব নির্বাসনে!"

কচ সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "নির্বাসনে?"

—"হ্যাঁ, আমি যাব আমার পিতৃরাজ্যে ফিরে, আর চন্দ্রপ্রকাশ যাবে তার প্রতিজ্ঞা-পালনের পথে। পাটলিপুত্র ছাড়া পৃথিবীতে আরো অনেক রাজ্যের—আরো অনেক সিংহাসনের অভাব নেই। এ বসুন্ধরা হচ্ছে বীরের ভোগ্য, আমার পুত্র বীর!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহু কারুর শক্ত হলেই
বীর-বাহু তো বলব না।
বীরত্ব দেয় আত্মা কেবল ;—
এ নয় আমার কল্পনা !

মহারানী কুমার দেবী ফিরে গেলেন তাঁর পিতৃরাজ্য বৈশালীতে।

চন্দ্রপ্রকাশ ধরলেন অযোধ্যার পথ। সঙ্গে তাঁর এক হাজার লিচ্ছবি সৈন্য।

পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা দলে দলে এসে তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়াল। সাশ্রুনেত্রে তারা আবেদন জানালে—যুবরাজ, আমাদের ত্যাগ করে কোথায় চললে তুমি ? সিংহাসন গ্রহণ না কর, আমাদেরও তোমার নির্বাসনের সঙ্গী করে নাও !

জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন বসুবন্ধু—তাঁর প্রশান্ত মুখ স্নিগ্ধ হাসির আভায় সুমধুর। তাঁকে দেখেই চন্দ্রপ্রকাশ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

বসুবন্ধু দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, "বৎস, মগধের সিংহাসনকে রাজ্যলোভে তুমি যে রক্তাক্ত করে তুললে না, এজন্যে আমার আনন্দের সীমা নেই। মানুষের তরবারি বড় নয়, বড় হচ্ছে মানুষের আত্মাই ! আসল যোদ্ধা বলি আমি তাঁকেই, আত্মার শক্তিতে যিনি দিগ্বিজয় করতে পারেন।"

চন্দ্রপ্রকাশ বিনীত ভাবে বললেন, "গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করবেন। বুদ্ধদেব আত্মার শক্তিতেই দিগ্বিজয় করেছিলেন, তাঁর হাতে ছিল না বটে তরবারি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, আত্মার শক্তি না থাকলে কেউ তরবারি ধারণ করতে পারে ? অর্জুন যখন সশস্ত্র

হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন তখন কি তাঁর আত্মা ছিল দুর্বল? বাহু তো বীরেরও আছে, ভীরুরও আছে—কিন্তু সত্যিকার তরবারি চালনা করে কে? বাহু, না আত্মা?······না গুরুদেব, আমি সিংহাসন ত্যাগ করলুম বটে, কিন্তু তরবারি ত্যাগ করি নি! এখন এই তরবারিই আমার একমাত্র সম্বল! এই তরবারি হাতে করেই এখন আমি জীবনের গহনবনে নিজের পথ কেটে নিতে চাই।"

বসুবন্ধু বিস্মিত স্বরে বললেন, "বৎস, তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না!"

চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "প্রভু, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পিতা আমাকে আদেশ দিয়ে গেছেন—'পাটলিপুত্রের সিংহাসন পেয়ে তোমার প্রথম কর্তব্য হবে, দিগ্বিজয়ীর ধর্ম পালন করা, স্বাধীন ভারতে আবার আর্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা'!"

—"কিন্তু চন্দ্রপ্রকাশ, পাটলিপুত্রের সিংহাসন তো তুমি গ্রহণ কর নি?"

—"গ্রহণ করিনি মায়ের আদেশে, গুরুদেব! কিন্তু পিতা বলেছেন আমাকে কাপুরুষ সংহার, যবন দমন করতে, ফিরিয়ে আনতে স্বাধীন ভারতে আবার ক্ষাত্র যুগকে! তাই আমি চলেছি আজ পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করতে!"

হঠাৎ পিছন থেকে নারী-কণ্ঠে শোনা গেল, "চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ! তোমার পিতা শক্তিমান মহারাজা হয়েও যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করতে পারেন নি, রাজ্যহারা সহায়হীন তুমি কেমন করে তা সফল করবে?"

চন্দ্রপ্রকাশ পিছন ফিরে দেখলেন, ইতিমধ্যে পদ্মাবতী কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু হেসে বললেন, "পদ্মা, এইমাত্র গুরুদেব বলছিলেন আত্মার শক্তিতে দিগ্বিজয় করবার জন্যে। সেই আত্মার শক্তি আমার আছে বলেই মনে করি। হতে পারি আমি সহায়-সম্পদহীন—"

চন্দ্রপ্রকাশকে বাধা দিয়ে জনতার বহু কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল—"না, না, যুবরাজ! আমরা আপনার সহায় হবো—আমরা সঙ্গে যাব!"

চন্দ্রপ্রকাশ উচ্চৈস্বরে বললেন, "বন্ধুগণ, একি তোমাদের মনের কথা?"

—"মনের কথা যুবরাজ, মনের কথা! আমরা আপনি ছাড়া আর কারুকে মানব না! আপনার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে পারি।"

চন্দ্রপ্রকাশ মাথা নেড়ে বললেন, "কেবল প্রাণ নয় বন্ধুগণ, কেবল প্রাণ নয়! প্রাণের চেয়ে বড় হচ্ছে মানুষের আত্মা—দেশের কাজে, জাতির কাজে সেই আত্মাকে তোমরা দান করতে পারবে?"

—"যুবরাজ, আমাদের আত্মা, আমাদের ইহকাল, আমাদের পরকাল সমস্তই আমরা দান করব!"

গম্ভীর স্বরে চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "তাহলে সমুজ্জ্বল এই ভারতের ভবিষ্যৎ! বন্ধুগণ, বুঝতে পারছি আমাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, পাটলিপুত্রের ক্ষুদ্র সিংহাসন তা ধারণ করতে পারবে না—এর জন্যে দরকার মহাভারতের মহা সিংহাসন! গুরুদেব, তাহলে এখন আমাকে বিদায় দিন!"

বসুবন্ধু উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, "চন্দ্রপ্রকাশ, কোন কাজ করবার আগে ভেবে দেখা উচিত!"

চন্দ্রপ্রকাশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "আর আমি ভাবনার ধার ধারি না গুরুদেব! বাড়িতে যখন আগুন লাগে তখন কেউ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে না—তখন চাই, কাজ! ভারত জুড়ে আজ আগুন লেগেছে—যবনের অত্যাচারের আগুনে ভারতের মন্দির, মঠ, তপোবন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, শত শত কাপুরুষ রাজা অধর্মের আগুন জ্বেলে ভারতের নিজস্ব সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে, এখন নেবাতে হবে সেই প্রচণ্ড আগুন! কিন্তু নদীর জলে নয়—চোখের জলেও নয়, সে ভারতব্যাপী আগুন নিববে কেবল রক্তসাগরের ভীষণ বন্যায়!"

বসুবন্ধু আহত কণ্ঠে বললেন, "রক্তসাগরের বন্যায়? আমার

প্রেমের শিক্ষা সব ভুলে গেলে চন্দ্রপ্রকাশ ?"

—"ভুলি নি গুরুদেব, ভুলি নি! যে-আকাশে থাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, সেখানেই দেখা দেয় উল্কা আর ধূমকেতু! কিন্তু উল্কাকে পেয়ে আকাশ কি চাঁদের মুখ ভুলে যেতে পারে? ভারতব্যাপী রক্ত-সাগরে মরব বলে আমরা ডুব দেব না, সাঁতার কেটে উঠব আবার শ্যামল তীরে!......বন্ধুগণ!"

হাজার হাজার কণ্ঠ সাড়া দিলে—"যুবরাজ!"

—"এখন কিন্তু রক্ত চাই, কেবল রক্ত! কেবল অত্যাচারী, কাপুরুষের, যবনের রক্ত নয়—আমাদেরও বুকের রক্ত! তবেই আমরা পাব পুরানো প্রাণের বদলে নূতন প্রাণ—তবেই আমরা দেখব জীর্ণতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নূতন সৃষ্টি! ধর তরবারি, গাও মৃত্যু-গান, ডাকো কল্কী-অবতারকে—যুগে যুগে যিনি অধর্মের কবল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।"

জনতার ভিতর থেকে কোষমুক্ত হয়ে হাজার হাজার তরবারি শূন্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলে তীব্র বিদ্যুৎ-মালা! হাজার হাজার কণ্ঠ বলে উঠল—"আমরা মারব—আমরা মরব—জয়, যুবরাজ চন্দ্রপ্রকাশের জয়!"

দৃপ্ত কণ্ঠে চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, "না—না বন্ধু, আজ থেকে আমি আর চন্দ্রপ্রকাশ নই। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে আমার স্বর্গীয় পিতার নাম নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভারতের পূর্ব-সমুদ্র থেকে পশ্চিম-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত নূতন এক স্বাধীন আর্যাবর্ত গড়ে তুলব! এ প্রতিজ্ঞা যাতে সর্বক্ষণ মনে থাকে, সেইজন্যে আমি নাম গ্রহণ করলুম—সমুদ্রগুপ্ত!"

জনতা বিপুল উৎসাহে বলে উঠল—"জয়, সমুদ্রগুপ্তের জয়!"

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, "শোনো বন্ধুগণ! আপাতত তোমরা নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাও, আমিও যাত্রা করি পবিত্র অযোধ্যা-ধামে! একদিন এই অযোধ্যা ছিল মহাক্ষত্রিয় সূর্যবংশধর রাজা

শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী। বহুযুগ পরে আবার অযোধ্যার গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে যথাসময়ে আমি তোমাদের আহ্বান করব।... প্রণাম গুরুদেব! বিদায় পদ্মা!"

সমুদ্রগুপ্ত তাঁর ঘোড়ার উপর চড়ে বসলেন। পদ্মাবতী ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল—তার দুই চোখ করছে ছলছল।

সমুদ্রগুপ্ত একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কি পদ্মা, তোমার মুখ অমন ম্লান কেন? চলেছি পিতৃব্রত উদ্‌যাপন করতে, তুমি কি হাসি মুখে আমাকে বিদায় দেবে না?"

ভাঙা ভাঙা গলায় পদ্মাবতী বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ—"

—"আর চন্দ্রপ্রকাশ নই পদ্মা, সমুদ্রগুপ্ত!"

—"না চন্দ্রপ্রকাশ, না! যে-নাম ধরে তুমি রক্ত-সাগরে সাঁতার কাটতে চাও, সে-নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারব না। আমার কাছে চিরদিন তুমি চন্দ্রপ্রকাশই থাকবে!"

—"বেশ, তাই ভালো পদ্মা! এখন পথ আমাকে ডাক দিয়েছে, আর সময় নেই। তুমি কি বলতে চাও, বল।"

"চন্দ্রপ্রকাশ, এতদিন তোমার সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি, গল্প খেলা করেছি, গান গেয়েছি, বাঁশী বাজিয়েছি। আর আজ তুমি একেবারেই আমাকে ফেলে চলে যাবে?"

—"ভয় নেই পদ্মা, ভয় নেই! কর্তব্য শেষ করে আবার আমি ফিরে আসব, আবার বাঁশী বাজাব, আবার গান শুনব। বিদায়—" সমুদ্রগুপ্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন—তাঁর পিছনে পিছনে ছুটল এক হাজার লিচ্ছবি সওয়ার!

ঘোড়াদের পায়ের ধুলো যখন দূরে মিলিয়ে গেল, পদ্মাবতী তখনো শূন্য-দৃষ্টিতে পথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে তার দুই চোখ উপছে অশ্রু ঝরতে লাগল।

বসুবন্ধু এগিয়ে এসে মমতা-ভরে মেয়ের মাথার উপরে হাত রেখে ধীরে ধীরে বললেন, "মিছেই তুই কাঁদছিস পদ্মা! সিংহের শাবক

শুনেছে বনের ডাক, ঘরোয়া স্নেহ দিয়ে আর ওকে ধরে রাখতে পারবি না!"

পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পদ্মাবতী বললে, "বাবা, পাটলিপুত্রে আর আমি থাকতে পারব না!"

—"আমিও পারব না মা, আমিও পারব না! কচের রাজ্যে বাস করার চেয়ে অরণ্যে বাস করা ভালো!"

—"তবে আমরাও অযোধ্যায় যাই চল।"

—"অযোধ্যায়? কেন, সেখানে চন্দ্রপ্রকাশ আছে বলে? কিন্তু শুনলি তো, দু'দিন পরে অযোধ্যা ছেড়ে সে দিগ্বিজয়ে বেরুবে?"

—"তবু অযোধ্যাই ভালো, বাবা! আরো দু'দিন তো চন্দ্রপ্রকাশের সঙ্গে থাকতে পারব?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নরম বটে নারীর বাহু;
সেই বাহুতেই বন্দী রাহু!

—"সৈন্যগণ! আজ তোমরা যে পবিত্র পুরীর আশ্রয়গ্রহণ করেছ, এর চেয়ে স্মরণীয় নগর ভারতে আর দ্বিতীয় নেই! এ হচ্ছে অযোধ্যাধাম—মহারাজা দিলীপ, রঘু, ভগীরথ, রামচন্দ্রের লীলাভূমি! এরই কীর্তিগাথা উচ্চারণ করে মহাকবি বাল্মীকি আজ অমর হয়েছেন। আমি পাটলিপুত্রের ছেলে, আমার সামনে জাগছে বটে মগধের দিগ্বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের আদর্শ, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সামনে ছিল পৃথিবীজয়ী রঘুরই আদর্শ, তিনি একদিন এই অযোধ্যারই সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়েছিলেন বিশ্বজয় করতে। তাঁর অপূর্ব তরবারির অগ্নিজ্বালা দেখে কেবল সমগ্র ভারতই তাঁকে প্রণাম জানায় নি, তাঁর পায়ের তলায় লক্ষ লক্ষ মাথা নত করেছিল অভারতীয় যবনরা পর্যন্ত। তাঁরই পৌত্র শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব-কাহিনী তোমাদের কাছে আর নূতন করে বলবার দরকার নাই। একদিন এই অযোধ্যা ছিল আসমুদ্র হিমাচলের অধিশ্বরী, আজ আমরাও আবার তার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে চাই! সম্রাট রঘুর পদচিহ্নই হবে আমাদের অগ্রগতির সহায় —উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্রই পড়বে আমাদের তরবারির ছায়া! অযোধ্যার রঘু করেছিলেন পৃথিবী-বিজয়, অযোধ্যার রামচন্দ্র করেছিলেন ভারত ও লঙ্কা জয়, আর আজ অযোধ্যার সমুদ্রগুপ্তও করতে চায় সমগ্র আর্যাবর্ত জয়! আমরা আদর্শচ্যুত হিন্দু কাপুরুষ বধ করব, স্বদেশের শত্রু যবন বধ করব, অত্যাচারী শক বধ করব,— উত্তপ্ত রক্তবাদলের ধারায় আর্যাবর্তের আহত আত্মার উপর থেকে বহুযুগের সঞ্চিত কলঙ্কের চিহ্ন মুছিয়ে দেব! কিন্তু মনে রেখো

ভারতের সন্তানগণ! এ হচ্ছে অতি কঠোর ব্রত! এ ব্রত উদ্‌যাপন করতে গেলে তোমাদের সকলকেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে—শত্রুর রক্তের সঙ্গে মেশাতে হবে তোমাদের নিজেদের দেহের রক্ত। আমি মৃত্যুপণ করেছি, তোমাদেরও করতে হবে মৃত্যুপণ। তোমাদের অনেকেই আর দেশে ফিরে আসতে পারবে না, এটা জেনেও তোমরা কি আমার সঙ্গে যাত্রা করতে রাজী আছ?"

আকাশ কাঁপিয়ে বিরাট জনতার মধ্যে দৃপ্ত স্বর জাগল—"মৃত্যুপণ, মৃত্যুপণ! আমরা মৃত্যুপণ করলুম! জয়, মহাবীর সমুদ্রগুপ্তের জয়!"

প্রকাণ্ড প্রাসাদ। প্রভাত-সূর্যের প্রখর কিরণে প্রাসাদের অমল শুভ্রতা জ্বলছে যেন জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে। অলিন্দের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সমুদ্রগুপ্ত—পরণে তাঁর যোদ্ধার বেশ, হস্তে তাঁর মুক্ত কৃপাণ!

প্রাসাদের সামনেই মস্ত একটি ফর্দা জায়গা পরিপূর্ণ করে যে বিপুল জনতার সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে কত হাজার লোক আছে আন্দাজে তা বলা অসম্ভব। তার মধ্যে অশ্বারোহী আছে, গজারোহী আছে, রথারোহী আছে, পদাতিক আছে, সে জনতার মধ্যে সুসজ্জিত সৈনিক ছাড়া আর কারুর স্থান হয়নি।

তিনমাস ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় সমুদ্রগুপ্ত এই বৃহৎ বাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং আজ তাঁর সৈন্য-পরিদর্শনের দিন।

এতক্ষণ ধরে তিনি জ্বলন্ত ভাষায় সৈন্যদের উত্তেজিত করছিলেন, এখন তাদের মুখে মৃত্যুপণের কথা শুনে সমুদ্রগুপ্তের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল প্রসন্ন হাসি।

তিনি আবার উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "সৈন্যগণ, তোমরা আমার সাধুবাদ গ্রহণ কর। দিগ্বিজয় করবে তোমরাই, আমি কেবল তোমাদের পথ-প্রদর্শক মাত্র। তোমাদের সাজ-সজ্জা, নিয়মানুবর্তিতা দেখে আমি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি, আর তোমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনে বুঝতে

পারছি, আমার আদর্শ তোমরা গ্রহণ করতে পেরেছ। আর এক সপ্তাহ পরেই তোমাদের সঙ্গে হবে আমার যাত্রা শুরু। আজ আমার আর কোন বক্তব্য নেই। তোমরা এখন সৈন্যাবাসে ফিরে যাও।"

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকদের মধ্যে জাগ্রত হলো গতির চাঞ্চল্য। শোনা গেল সেনাপতিদের উচ্চ আদেশ-বাণী।...দলে দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যরা ফিরে চলল সেনাবাসের দিকে—শত শত পতাকা-দণ্ডে, রথচূড়ায় এবং হাজার হাজার বর্শায় শূন্য হয়ে উঠল কণ্টকিত!

সমুদ্রগুপ্ত গর্বপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাঁর সযত্নে সংগৃহীত বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তারা সকলে যখন অদৃশ্য হলো, তিনি তখন ধীরে ধীরে অলিন্দ ছেড়ে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং পোশাক ছাড়বার জন্যে গেলেন নিজের ঘরের ভিতর।

ঘরে ঢুকে দেখলেন, গবাক্ষের কাছে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পদ্মাবতী। শুধোলেন, "পদ্মা, তুমি এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে পদ্মা প্রশ্ন করলে, "চন্দ্রপ্রকাশ, তুমি এ-ঘর থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছ?"

—"সূর্যোদয়ের আগে। কিন্তু এ-কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

—"তাহলে তুমি যাবার পরে এ ঘরে অন্য কেউ ঢুকেছিল।"

—"আশ্চর্য কি, ভৃত্যরা—"

—"ভৃত্য নয় চন্দ্রপ্রকাশ, ভৃত্য নয়। ভৃত্যরা উদ্যানের ভিতর থেকে গবাক্ষ-পথ দিয়ে কাদামাখা পায়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে না। এই দেখ—"

সমুদ্রগুপ্ত বিস্মিত চোখে দেখলেন, গবাক্ষের কাছ থেকে একসার কর্দমাক্ত পদচিহ্ন বরাবর তাঁর শয্যার কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং আর একসার পদচিহ্ন আবার ফিরে এসেছে গবাক্ষের কাছে।

—"দেখছ চন্দ্রপ্রকাশ? গবাক্ষ দিয়ে কেউ ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার গবাক্ষ-পথেই উদ্যানের ভিতরে ফিরে গিয়েছে? কাল রাতে

বৃষ্টি পড়েছিল বলেই সে তার কর্দমাক্ত পদচিহ্ন গোপন করতে পারেনি! কিন্তু কে সে?"

সমুদ্রগুপ্ত হাস্য করে বললেন, "চোর এসেছিল পদ্মা! কিন্তু এ-ঘরে ধনরত্ন না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে!……উদ্যানে ও কে ভ্রমণ করছে? কবি হরিসেন? পদ্মা, এই নাও আমার তরবারি আর ধনুক-বাণ, কবির সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।"

—"কিন্তু চন্দ্রপ্রকাশ, এই সাহসী চোরের কথা এত সহজে তুমি উড়িয়ে দিও না—"

—"পদ্মা, ও-জন্যে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যাদের চোর-ধরা ব্যবসা তাদের খবর দাও" বলতে বলতে সমুদ্রগুপ্ত ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হলেন।

উদ্যানের ভিতরে গিয়ে সমুদ্রগুপ্ত দেখলেন, হরিসেন একটি লতা-কুঞ্জের ছায়ায় মর্মর-বেদীর উপরে বসে আছেন।

তাঁকে দেখে হরিসেন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠতেই সমুদ্রগুপ্ত বললেন, "বোসো কবি, বোসো। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ কাব্যচর্চা করতে।"

হরিসেন বললেন, "রাজকুমার, আমার কবিতা আজ পলাতকা!"

—"পলাতকা কেন?"

—"যুদ্ধের দামামা শুনে আমার কবিতা আজ ভয় পেয়েছে!"

—"কবিতা ভয় পেয়েছে যুদ্ধের দামামা শুনে? ভুল কবি, ভুল! কবিতা কি কেবল কোমলা? তার বুকে কি বজ্রের আগুন বাস করে না? ক্রৌঞ্চ পাখির মৃত্যু-ব্যথায় বাল্মীকির যে কবিতা হয়েছিল কেঁদে সারা, বীরবর রামচন্দ্রের সঙ্গে সেও কি শত শত যুদ্ধযাত্রা করে অস্ত্র-ঝন্‌ঝনার ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে পারেনি? হরিসেন, বন্ধু! যোদ্ধারা কেবল অস্ত্র ধরতে পারে, কিন্তু দেশ জাগাবার মন্ত্র শোনাবে তোমরাই, দেশ না জাগলে অস্ত্র ধরে কোন লাভ নেই। শোন কবি, তুমি প্রস্তুত হও,—আমার সঙ্গে তুমিও যাবে দিগ্বিজয়ে!"

বিস্ময়ে-অভিভূত স্বরে হরিসেন বললেন, "আমিও যাব দিগ্বিজয়ে ! রাজকুমার, লেখনী চালনা করে আমি কি শত্রু বধ করতে পারব ?"

—"তরবারি চালনা করে মানুষ মারা যায় বটে, কিন্তু লেখনী চালনা করে তোমরা মানুষকে অমর করতে পারো ! বাল্মীকির কাব্যই আজ রামচন্দ্রকে জীবন্ত করে রেখেছে। বন্ধু, আমি চাই তুমিও আমার দিগ্বিজয় স্বচক্ষে দেখে বর্ণনা কর ! যদি সফল হই তোমার কাব্যের প্রসাদে আমিও অমর হয়ে থাকব যুগ-যুগান্তর পর্যন্ত ! কবি,—"

হঠাৎ পিছনে এক আর্তনাদ উঠল, সমুদ্রগুপ্ত ও হরিসেন দুজনেই সচমকে ফিরে দেখলেন, একটা মনুষ্য-মূর্তি উদ্যান-পথে পড়ে বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করছে !

সমুদ্রগুপ্ত তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই সে মূর্তি নিস্পন্দ !

হরিসেন বললেন, "রাজকুমার, এর বুকে বিঁধে রয়েছে একটা তীর !"

সমুদ্রগুপ্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "আমার উদ্যানে নরহত্যা ! কে এ কাজ করলে ?"

—"আমি করেছি চন্দ্রপ্রকাশ, তোমারি ধনুকে বাণ জুড়ে আমি একে হত্যা করেছি !" সমুদ্রগুপ্ত বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, একটা গাছের আড়াল থেকে ধনুক-হাতে বেরিয়ে এল পদ্মাবতী !

—"পদ্মা !"

—"বিস্মিত হচ্ছ কেন চন্দ্রপ্রকাশ ? তুমি কি ভুলে গিয়েছ ধনুর্বিদ্যা শিখেছি আমি তোমার কাছ থেকেই ?"

—"ভুলি নি। এও জানি তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। কিন্তু তুমি লক্ষ্য করতে কেবল গাছের ফুল আর ফলকে। তোমার বাণে কোন-দিন একটা পাখি পর্যন্ত মরে নি, আর আজ তুমি করলে কিনা নরহত্যা !"
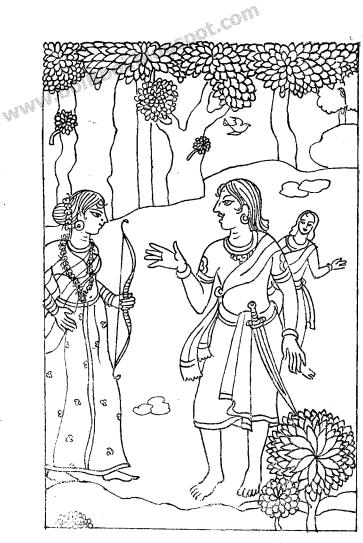
তোমার বাণে কোনদিন একটা পাখি পর্যন্ত মরে নি, আর
আজ তুমি করলে নরহত্যা

—"এজন্যে আমি দুঃখিত বটে, কিন্তু কি করব বল চন্দ্রপ্রকাশ? তোমার শয়নগৃহের গবাক্ষ থেকে দেখতে পেলুম, এই লোকটা চোরের মতো পা টিপে টিপে একখানা শাণিত ছোরা নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে আসছে। তখনি তোমার ধনুক-বাণ নিয়ে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলুম। তারপর যখন তোমাকে লক্ষ্য করে লোকটা অস্ত্র তুললে, আমাকেও বাধ্য হয়েই বাণ ত্যাগ করতে হলো।"

—"গুপ্তঘাতক! তাহলে এরই পদচিহ্ন দেখেছি আমার ঘরে! পদ্মা—পদ্মা, তুমিই আমার জীবন-রক্ষা করলে! তখন এ কথা—"

সমুদ্রগুপ্তের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখা গেল, প্রাসাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে সৈনিক-বেশধারী এক পুরুষ বেগে দৌড়ে আসছে, তার সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত!

সমুদ্রগুপ্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, "মগধ-সেনানী মহানন্দ!"

মহানন্দ কাঁছে এসে জানু পেতে বসে পড়ে বললে, "জয় মগধের মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের জয়! তাহলে আমি ঠিক সময়েই আসতে পেরেছি!"

—"মহানন্দ, মগধের মহারাজা হচ্ছেন আমার দাদা।"

—"কচ এখন পরলোকে। মন্ত্রীরা তাঁকে হত্যা করেছেন।"

—"হত্যা করেছেন!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! একে তো কচের অত্যাচারে এরি-মধ্যে রাজ্যময় হাহাকার উঠেছিল, তার উপরে মন্ত্রীরা চরের মুখে খবর পান যে, আপনাকে হত্যা করবার জন্যে কচ এক গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছেন। তাই শুনে মন্ত্রীরা ক্রুদ্ধ হয়ে কচকে হত্যা করে আপনাকে সাবধান করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

—"ঐ দিকে চেয়ে দেখ মহানন্দ, সেই ঘাতক এখন নিজেই নিহত! আমার বান্ধবী পদ্মাবতী ওর কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। এদিকে এগিয়ে এসো বান্ধবী, তোমাকে একবার ভালো করে দেখি! বন্ধু হরিসেন, নারীও কি তোমার কবিতার মতোই

কোমলা নয়? দেখ দরকার হলে কোমলা নারীও বজ্রের মতোই কঠিন হতে পারে কিনা!"

পদ্মাবতী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ, তোমার ধনুক ফিরিয়ে নাও।"

মহানন্দ বললে, "মহারাজ, মগধের সিংহাসন খালি। এখন আপনাকে যে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করতে হবে।"

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, "অসম্ভব! তুমি কি শোনোনি মহানন্দ, স্বর্গীয় পিতৃদেবের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর্যাবর্ত জুড়ে স্বাধীন ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন না করে পাটলিপুত্রে আর ফিরে আসবো না?"

—"তাহলে রাজ্যচালনা করবে কে?"

—"আমার মাতা মহারানী কুমার দেবী আর আমার গুরুদেব বসুবন্ধু।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একতা, একতা, একতা !
একতার জোরে মানুষের কাছে
হারে যে দানব-দেবতা।

তারপর এক বৎসর কেটে গেছে।

এই এক বৎসর ধরে সমুদ্রগুপ্তের রক্ত-পতাকা দেখা দিয়েছে আর্যাবর্তের—অর্থাৎ উত্তর-ভারতের দেশে দেশে।

আগেই বলেছি উত্তর-ভারত ভাগ করে নিয়েছিল ছোট ছোট হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় রাজারা এবং শক, হূণ ও গ্রীক প্রভৃতি যবনরা। খাঁটি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বৃহত্তর শত্রুর আবির্ভাব হলে একা একা লড়বার ক্ষমতা না থাকলেও তাঁরা একত্রে দলবদ্ধ হতে জানতেন না।

এই বিপদজ্জনক স্বভাবটা হচ্ছে একেবারেই ভারতের নিজস্ব। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এই কুস্বভাবের জন্যে ভারতবর্ষ বার বার বিদেশী শত্রুদের করতলগত হয়েছে। এ স্বভাব না থাকলে ভারতবর্ষের শিয়রে আজও যে ব্রিটিশ সিংহের গর্জন শোনা যেত না, এ-কথা জোর করে বলা যায়।

য়ুরোপের ধারা হচ্ছে স্বতন্ত্র। এই কয়েক শত বৎসর আগেও য়ুরোপের বিভিন্ন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়িয়ে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বারংবার।

কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত ভারতের ইতিহাসেও একটা ব্যাপার অনেকবার দেখা গিয়েছে। শত শত বৎসর অন্তর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারত-বর্ষের ক্রন্দন যখন গগনভেদী হয়ে উঠেছে, তখন এখানে অবতারের মতন আবির্ভূত হয়েছেন এক-একজন মহামানব। যেমন চন্দ্রগুপ্ত,

সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন। এঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন ব্যক্তিত্বের অপূর্ব মহিমায় ভারতবাসীদের প্রাণে এনেছেন বিচিত্র প্রেরণা, এবং জোর করে একতাহীন রাজাদের দমন করে সমগ্র আর্যাবর্তকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে বিদেশী শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতের ধর্মকাব্যে অমর হয়ে আছে। এ যুদ্ধ কবে হয়েছিল এবং এর ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু সে কথা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। কিন্তু এ যুদ্ধের ইতিহাস যে ভারতের সত্যিকার স্বভাবের ইতিহাস সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সমগ্র আর্যাবর্ত যেন আত্মহত্যা করবার জন্যেই বদ্ধপরিকর হয়ে কয়েকদিন-ব্যাপী এক মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম,দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধা যতই বীরত্ব প্রকাশ করে থাকুন, তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তুচ্ছ কারণে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়, তা হচ্ছে ভারতের পক্ষে লজ্জাকর। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যদি ঐতিহাসিক হয় তবে বলতে হবে যে, তার ফলে ভারতের ক্ষাত্র বীর্য একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল বলেই সেই সুযোগে হয়তো পারসী ও গ্রীক প্রভৃতি যবনরা ভরসা করে পঞ্চনদের তীরে প্রথম আগমন করতে পেরেছিল।

কিন্তু একতা-মন্ত্রের যে কত গুণ,ভারতবর্ষ নিজেও একবার সে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল। সে হচ্ছে ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের উপরে ভেঙে পড়ে হুণ-যবনদের প্রবল বন্যা। এই হুণদের চেহারা ছিল যেমন রাক্ষসের মতো তাদের প্রকৃতিও ছিল তেমনি ভয়ানক এবং সংখ্যাতেও তারা ছিল অগণ্য। এই হুণদের অন্যতম নেতা আটিলার নাম শুনলে আজও য়ুরোপ শিউরে ওঠে। ঐতিহাসিক গিবন তাদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন: "সাধারণ মনুষ্য-জাতির সঙ্গে হুণদের চেহারা মেলে না। তাদের দুই কাঁধ খুব চওড়া, নাক থ্যাঁদা, কুৎকুতে কালো চোখ একেবারে কোটরগত, দাড়ি-গোঁফ গজায় না।"

ভারতে আটিলার ব্রত নিয়ে এসেছিল মিহিরগুল। লক্ষ লক্ষ

সঙ্গী নয়ে নগ্ন তরবারি খুলে সে সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে প্রলয়-নৃত্য করে বেড়িয়েছিল। রক্ত-সাগরে ভেসে, গ্রাম-নগর পুড়িয়ে দিয়ে, নারীর উপর অত্যাচার করে ভারতবর্ষকে সে যেন এক মহাশ্মশানে পরিণত করতে চেয়েছিল। সেই সময়ে মধ্য-ভারতের এক রাজা যশোধর্মণ বুঝলেন, এখনো ভারতবাসীরা যদি একতার মর্ম গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে আর আর্যাবর্তের রক্ষা নেই।

যশোধর্মণের যুক্তি শুনে ভারতের অন্যান্য রাজারা সেই প্রথম হিংসা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে একতাবদ্ধ হলেন। তার সুফল ফলতেও দেরি লাগল না। আনুমানিক ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে একতাবদ্ধ রাজাদের নিয়ে যশোধর্মণ এমন ভাবে মিহিরগুলকে আক্রমণ ও পরাজিত করলেন যে, হুণদের বিষদাঁত একেবারে ভেঙে গেল।

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কথা যে, যশোধর্মণের আদর্শ এখানে দীর্ঘকালস্থায়ী হতে পারে নি। এমনি মাটির গুণ!

শক ও হুণ প্রভৃতি যবনরা ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে অভিশাপের মতো। মহাভারতের মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত বার বার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয়ে শেষটা পশ্চিম-ভারতের শেষ-প্রান্তে সমুদ্রের ধারে পালিয়ে গিয়ে দ্বারকানগর বসিয়ে নিরাপদ হবার চেষ্টা করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের যুগে যবনরা বোধ হয় খুব বেশি প্রবল বা একতাবদ্ধ ছিল না। তারাও নানা স্থানে আলাদা আলাদা ছোট-বড় রাজ্য স্থাপন করে বাস করত।

উত্তর-ভারতের এই সমস্ত একতাহীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও যবন রাজা সমুদ্রগুপ্তের ভীষণ আক্রমণে মহাঝড়ে বনস্পতির মতন ধরাতলশায়ী হলো। সমুদ্রগুপ্ত তাদের কারুকেই ক্ষমা করলেন না, নিজের সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সকলেরই রাজ্য একে একে কেড়ে নিলেন। অশোক-স্তম্ভের গায়ে সমুদ্রগুপ্তের নিকটে পরাজিত প্রধান প্রধান নয় জন উত্তর-ভারতীয় রাজার নাম খোদা আছে বটে, কিন্তু একজন ছাড়া আর কারুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ঐ একজনের নাম হচ্ছে

গণপতি নাগ, তাঁর রাজধানী ছিল পদ্মাবতী নগরে। সে-স্থান এখন মহারাজা সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত।

আজকের দিনে এক রাজা যদি শখ করে অন্যের রাজ্য কেড়ে নেন, তাহলে তাঁর নিন্দার সীমা থাকে না। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের যুগ ছিল প্রবলের যুগ, দুর্বলকে দমন করাই ছিল যেন তখন প্রবলের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং আজকের মাপ-কাঠিতে সমুদ্রগুপ্তকে বিচার করা সঙ্গত হবে না। হিটলার ও মুসোলিনী আজ আবার সেই পুরাতন যুগধর্মকেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এথেকেই বোঝা যায়, দুর্বলের উপরে প্রভুত্ব করবার ইচ্ছাটা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ও চিরন্তন ইচ্ছা।

উত্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত দেশ জয় করে সমুদ্রগুপ্ত আবার অযোধ্যায় ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও তাঁর দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা শান্ত হয় নি, কারণ তখনও দক্ষিণ-ভারত রয়েছে তাঁর নাগালের বাইরে এবং পিতার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সমগ্র ভারতের উপরে তুলবেন তাঁর গৌরবময়-পতাকা!

নবম পরিচ্ছেদ

সুন্দরী সে, সুন্দরী !
চরণ-কমল সন্ধানে তার
মধুপ ওঠে গুঞ্জরি' !

বাতাস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে শত শত মঙ্গলশঙ্খের সুগম্ভীর আনন্দ-কল্লোল, জনতার অশ্রান্ত ঐক্যতানে ঘন ঘন বেজে উঠছে অনাহত জয়-গীতিকা, পথে পথে ঝরে পড়ছে লাজাঞ্জলির পর লাজাঞ্জলি !

বিজয়ী বীর সুদূরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছেন স্বদেশে, প্রাচীন অযোধ্যা তাঁকে অভিনন্দন দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

প্রাসাদ-তোরণে অপেক্ষা করছিলেন রাজমাতা মহারানী কুমার দেবী, রাজগুরু বসুবন্ধু ও রাজ-বান্ধবী পদ্মাবতী।

প্রণত সমুদ্রগুপ্তকে সানন্দে আশীর্বাদ করে কুমার দেবী বললেন, "বাছা, তোমার মতো বীর পুত্র পেয়ে আমার গর্বের আর সীমা নেই। এইবারে মগধের সিংহাসন গ্রহণ করে মায়ের জীবন সার্থক কর।"

সমুদ্রগুপ্ত মায়ের একখানি হাত আদর করে নিজের বুকের উপরে টেনে নিয়ে বললেন, "সময় হয় নি মা, এখনো সময় হয়নি। প্রতিজ্ঞা করেছি, সমস্ত ভারত যতদিন না আমাকে সম্রাট বলে মানবে, ততদিন মগধের মুকুট দাবি করব না। কেবল উত্তর-ভারত নিয়ে আমি খুশি হতে পারব না—আগে দক্ষিণ-ভারত জয় করি, তারপর করব মুকুটধারণ।"

বসুবন্ধু বললেন,"বৎস, সন্ন্যাসীকে করে গেছ তুমি রাজ-প্রতিনিধি। কিন্তু আমার সন্ন্যাস যে এ ঐশ্বর্য আর সইতে পারছে না, তার আর্তনাদ যে নিশিদিন আমি শুনতে পাচ্ছি ! আমাকে মুক্তি দাও বৎস, মুক্তি দাও !"

সমুদ্রগুপ্ত হেসে বললেন, "মুক্তি ! শিষ্যের স্নেহের রাজ্যে গুরুর মুক্তি যে কোনদিনই নেই প্রভু ! ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে-সন্ন্যাস নির্লিপ্ত থাকতে পারে, তার চেয়ে গৌরব আছে আর কার ? হে রাজ-তপস্বী শিষ্যের মুখ চেয়ে আরো কিছু দিন রাজ্য-পীড়া ভোগ করুন।"

পদ্মাবতী ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

সমুদ্রগুপ্ত বললেন, "কি সংবাদ, পদ্মা ? মাতৃদেবীর আর্তনাদ শুনলুম। এইবারে তোমারও আর্তনাদ শুনতে হবে নাকি ?"

পদ্মাবতী বললেন, "হ্যাঁ চন্দ্রপ্রকাশ ! আমার কাছেও এক আর্তনাদ এসেছে, দূর-দূরান্তর থেকে !"

—"দূর-দূরান্তর থেকে। জীবন্মৃত ভারতের অসাড় চরণে মহাসমুদ্রের মাথা-কোটা আর্তনাদ আমার মতন তুমিও কি শুনতে পেয়েছ পদ্মা ?"

—"অত বেশি শোনবার শক্তি ভগবান আমাকে দেন নি !"

—"তবে ?"

—"আমার কাছে এসেছে এক নারীর আর্তনাদ !"

—"পদ্মা, তোমার কথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি !"

—"মালব-রাজকন্যা দত্তা দেবীর নাম শুনেছ ?"

—"মালব-রাজ্য জয় করেছি বটে, কিন্তু রাজকন্যাকে চিনি না।"

—"দত্তা দেবী যাচ্ছিলেন তীর্থ-ভ্রমণে। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কোশল-রাজ মহেন্দ্র পথে তাঁকে বন্দী করেন। কিন্তু দত্তা দেবীকে নিয়ে তিনি নিজের রাজধানীতে ফেরবার আগেই অরণ্য-প্রদেশের রাজা ব্যাঘ্ররাজ তাঁর কাছ থেকে দত্তা দেবীকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।"

—"ব্যাঘ্ররাজ ? হ্যাঁ, তার নাম আমি জানি। বিষম নিষ্ঠুর, প্রবল পরাক্রান্ত এই বন্য রাজা। এর রাজধর্ম হচ্ছে দস্যুতার অত্যাচার। পদ্মা, মালব-রাজকন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

—"কেবল দুঃখিত হলেই তো চলবে না চন্দ্রপ্রকাশ! দত্তা দেবী যে সাহায্য চেয়ে তোমার কাছেই দূত পাঠিয়েছেন।"

—"আমার কাছে! আমি কি করব? আমার চোখের সামনে এখন জেগে আছে খালি মহাভারতের বিরাট মূর্তি। তুচ্ছ এক নারীর আবেদন শোনবার সময় এখন নেই।"

কুমার দেবী বললেন, "বাছা, আর্য ভারতবর্ষে বীরের বাহুই চিরদিন নারীর ধর্মরক্ষা করে এসেছে, তুমি কি এ আদর্শ মানো না?"

—"মানি, মা, মানি। কিন্তু বৃহত্তর কর্তব্য পালন না করে—"

পদ্মাবতী বাধা দিয়ে বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ, দত্তা দেবীর আবেদন শুনলে তোমার কর্তব্যপালনে কোনই বাধা হবে না। তুমি তো দাক্ষিণাত্যে যেতে চাও? তাহলে অরণ্য-প্রদেশ পড়বে তোমার যাত্রা-পথেই। ব্যাঘ্ররাজকে দমন না করে তুমি তো অগ্রসর হতে পারবে না!"

সমুদ্রগুপ্ত হেসে বললেন, "পদ্মা, আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে তুমি যে দেখছি, সমস্ত যুক্তিই স্থির করে রেখেছ। বেশ, আমি তোমাদের কথাই শুনব! দত্তা দেবীর দূতকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অবিলম্বে দূত এসে অভিবাদন করলে।

সমুদ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "দত্তা দেবী এখন কোথায়?"

—"অরণ্য-প্রদেশের এক গিরি-দুর্গে তিনি বন্দিনী।"

—"কোন্ পথে শীঘ্র সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব?"

—"দক্ষিণ কোশলের মহানদীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে।"

—"তাহলে আগে আমাকে কোশল-রাজ্যও জয় করতে হবে। কিন্তু দূত, ততদিন দত্তাদেবী আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবেন কি?"

—"মহারাজ, দুরাত্মা ব্যাঘ্ররাজ রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজকন্যা তার কাছে দুই মাস সময় প্রার্থনা করেছেন, সেও রাজী হয়েছে।"

—"কোশল-রাজ মহেন্দ্র আর ব্যাঘ্ররাজ দুজনেই যখন দত্তা দেবীর জন্যে লালায়িত, তখন বোধ হচ্ছে তোমাদের রাজকন্যা খুবই সুন্দরী ?"

—"অসীম সুন্দরী মহারাজ, সাক্ষাৎ তিলোত্তমা! যেমন রূপ, তেমনি গুণ!"

—"আচ্ছা, যাও দূত! দত্তা দেবীকে জানিও, দুই মাসের মধ্যেই সমুদ্রগুপ্ত সসৈন্যে ব্যাঘ্ররাজের দর্প চূর্ণ করবে।"

দূত চলে গেল। পদ্মাবতী কাছে এসে দুষ্টামি-ভরা হাসি হাসতে হাসতে চুপি চুপি বললে, "চন্দ্রপ্রকাশ, শুনলে তো ?"

—"কি ?"

—"দত্তা দেবী হচ্ছেন সাক্ষাৎ তিলোত্তমা।"

—"হুঁ।"

—"দত্তা দেবী কুমারী।"

—"হুঁ।"

—"তুমিও কুমার।"

—"পদ্মা, তুমি কি বলতে চাও ?"

—"হয়তো শীঘ্রই তোমাদের বিবাহের ভোজে আমাদের নিমন্ত্রণ হবে।"

—"পদ্মা!"

কিন্তু পদ্মা আর দাঁড়াল না, চঞ্চলা হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

মরীচিকা—বিভীষিকা !
কালো অরণ্য !
মানুষের প্রাণ হেথা
অতি নগণ্য !

সে রাজ্যের নাম মহাকান্তার—মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী প্রদেশে তার অবস্থান। তারই রাজা হচ্ছে ব্যাঘ্ররাজ। বাঘ থাকে বনে এবং মহাকান্তার বলতে ভীষণ নিবিড় অরণ্যই বোঝায়। কাজেই রাজার ও রাজ্যের নাম হয়েছে এমন অদ্ভুত।

কিন্তু সাধারণত নিবিড় অরণ্য বললে আমাদের মনে বনের যে ছবি জেগে ওঠে, মহাকান্তারের আসল দৃশ্য তার চেয়েও ভয়ানক। এখানে এসে দাঁড়ালে মনে হবে, সৃষ্টি-প্রভাতের যে-পৃথিবীতে মানুষ জন্মায় নি, আমরা যেন সেই পৃথিবীরই কোন এক অংশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

যেখানে মানুষের বসতি নেই সেখানকার কথা বলতে গেলে আগে স্তব্ধতার বর্ণনা দিতে হয়। মহাকান্তারেরও অধিকাংশ স্থানে মানুষের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু এ অরণ্য-সাম্রাজ্য নিস্তব্ধ নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নানা জাতের নানা বৃক্ষ সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে মর্মর-গর্জন ! পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ঢুকে ঝোড়ো হাওয়া করছে অশ্রান্ত চীৎকার এবং তারপর যেন কাকে খুঁজে না পেয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাশি রাশি শুকনো পাতা উড়িয়ে তুলছে যেন বনবাসী অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের মাংসহীন অস্থি-কঙ্কালের খড়মড়-খড়মড় শব্দ ! লক্ষ লক্ষ লতা লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের আপাদমস্তক জড়িয়ে যে সব জাল ফেলেছে, ঘন পাতার যবনিকা ভেদ করে তাদের

দেখা যায় না এবং দুপুরের প্রখর সূর্যকরও সে দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতর দিয়ে নীচেকার অনন্ত গুল্ম ও কাঁটাঝোপের উপরে এসে পড়তে পারে না। অরণ্যের তলায় বিরাজ করে রাত্রিময় দিবসের ভয়াবহ অন্ধকার এবং তারই মধ্যে থেকে থেকে জাগে মাতঙ্গদের বৃংহিত ও পৃথিবী-কাঁপানো পদশব্দ এবং ব্যাঘ্র-ভল্লুকের হিংস্র কণ্ঠধ্বনি এবং হতভাগ্য নানা জীবের মৃত্যু-আর্তনাদ!

এই মহাকান্তারেরই স্থানে স্থানে বন-জঙ্গল কেটে মানুষেরা বসবাস করবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু বিরাট অরণ্যের বিপুল জঠরের ভিতর থেকে তাদের আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সে-সব গ্রামের অবস্থা হয়েছে যেন মহাসাগরের মাঝে মিশিয়ে-যাওয়া এক এক ঘটি জলের মতো।

মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ—যেমন তার নাম, তেমনি তার আকৃতি, তেমনি তার প্রকৃতি! সে হচ্ছে এক অনার্য রাজা, ঘোরকৃষ্ণ-বর্ণ প্রায় পাঁচ হাত উঁচু দানবের মতন তার দেহ—তার এক-একখানা হাত সাধারণ মানুষের উরুর মতন মোটা এবং পায়ের তালে তার মাটি কাঁপে থরথরিয়ে! তার মিষ্ট কথাও শোনায় বাঘের গর্জনের মতো এবং সে যখন অট্টহাস্য করে লোকের কানে লেগে যায় তালা!

মানুষ হলেও ব্যাঘ্ররাজের একমাত্র সম্বল হচ্ছে পশুশক্তি। দয়া-মায়া-স্নেহের কোন ধারই সে ধারে না, তাই মহাকান্তারের আশপাশের রাজ্যের বাসিন্দারা তার নাম শুনলেই চোখের সামনে দেখে মৃত্যুর স্বপ্ন! কারণ সে যখন অরণ্যের অন্ধকার ছেড়ে দেশে দেশে দস্যুতা করতে বেরোয়, তখন আকাশের বুক রাঙা করে দিকে দিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গ্রাম ও নগর, পথে পথে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে নরনারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবার মৃতদেহ, সর্বত্র ছড়িয়ে যায় হাজার হাজার মানুষের কাতর ক্রন্দন!

কিন্তু বাইরের কোন রাজ্যের কোন সাহসী রাজাও ব্যাঘ্ররাজের মুল্লুকে ঢুকে তার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করতে আসেন না। প্রথম

প্রথম দু-একজন সে চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু মহাকান্তারের মৃত্যু-ভীষণ অন্ধকারজালে, তার ক্ষুধার্ত উদর থেকে আজ পর্যন্ত কোন বিদেশীই মুক্তিলাভ করতে পারে নি!

আজ ব্যাঘ্ররাজের পরামর্শ-সভা বসেছে। পরামর্শ-সভা বললে বোধ হয় ঠিক হবে না। ব্যাঘ্ররাজ জীবনে কারুর পরামর্শে কান পাতেনি। সে মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য সর্দারদের আহ্বান করে কেবল হুকুম দেবার জন্যেই।

তার গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বাঘের ছালে, কোমরে ঝুলছে তরবারি, হাতে দুলছে গদা বা মুগুর। মাথার ঝুলে-পড়া লম্বা লম্বা চুলে ও গোঁফ-দাড়িতে তার মুখের অধিকাংশ ঢাকা পড়ে গিয়েছে—তারই ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে অজগরের মতো কুৎকুতে তীব্র দুটো চক্ষু, বনমানুষের মতো থ্যাবড়া নাক ও কাফ্রির মতো পুরু ঠোঁটের ফাঁকে জানোয়ারের মতো বড় বড় দাঁত!

ব্যাঘ্ররাজ অতিশয় উত্তেজিতভাবে তখন আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাতের গদাটা সশব্দে আসনের উপরে রেখে দিয়ে সে বললে, "সুমুদ্দুরগুপ্ত মহাকান্তারের প্রান্তে এসে হাজির হয়েছে বলে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তোমরা কি জানো না, আমার এই মহাকান্তারের চারিধারে কত রাজার অস্থিচূর্ণ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে আছে? আসুক সুমুদ্দুরগুপ্ত, সে আমার করবে কি?"

সেনাপতি বললে, "আমিও মহারাজের মত সমর্থন করি। আমাকে আদেশ দিন, সৈন্যরাও প্রস্তুত, আমরা এই মুহূর্তে যুদ্ধ-যাত্রা করতে রাজী আছি।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, সমুদ্রগুপ্ত সাধারণ শত্রু নয়, সে কত সহজে কোশলরাজ মহেন্দ্রকে হারিয়ে দিয়েছে, তা কি আপনি শোনেন নি?"

ব্যাঘ্ররাজ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "শুনেছি হে মন্ত্রী, শুনেছি। কোশল-রাজ মহেন্দ্র কি আমারও হাতের মার খায় নি? তার হাত থেকে

আমিও কি মালব-রাজার মেয়ে দত্তা দেবীকে ছিনিয়ে আনি নি? মহেন্দ্র আর আমি কি সমান? হেঁঃ! মন্ত্রী, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি বেজায় কম! সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার গদা ওখানে শুয়ে আছে। বেশি যদি ঘ্যান্-ঘ্যান কর তাহলে এখনি আমার গদা তোমার বউকে বিধবা না করে ছাড়বে না! হেঁঃ, সমুদ্দুরগুপ্ত না পুকুরগুপ্ত, খালগুপ্ত! একবার আমার হুঙ্কার শুনলেই তার নাড়ী ছেড়ে যাবে! হেঁঃ!"

বুদ্ধিমান মন্ত্রী আড়-চোখে একবার গদার দিকে চেয়েই নিরাপদ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে।

ব্যাঘ্ররাজ বললে, "কি হে মন্ত্রী, সরে পড়ছ বড় যে?"

—"আজ্ঞে না মহারাজ, সরে পড়ব কেন? কি আদেশ বলুন।"

—"পুকুরগুপ্ত কত সৈন্য নিয়ে এসেছে সে খবর রাখো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। সমুদ্রগুপ্ত যে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, এ-খবর আমি পেয়েছি। কিন্তু সে মহা-কান্তারের দিকে এসেছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে।"

—"মোটে পঞ্চাশ হাজার?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!"

—"সেনাপতি, আমাদের কত সৈন্য আছে?"

—"পঁচিশ হাজার।"

—"পঁচিশ হাজার? হেঁঃ! ব্যাঘ্ররাজের এক-একজন সৈন্য পুকুরগুপ্তের চার-চারজন সৈন্যের সমান! কি বল হে সেনাপতি, তাই নয় কি?"

—"নিশ্চয়ই মহারাজ, নিশ্চয়ই!"

—"তুমি কি বল হে মন্ত্রী?"

মন্ত্রী আর একবার গদার দিকে তাকিয়ে বললে, "নিশ্চয় মহারাজ, নিশ্চয়!"

—"হেঁঃ! মন্ত্রী, আমার গদার ভয়ে তুমি ও-কথা বলছ না তো?"

—"সে কি মহারাজ, আপনার মন্ত্রী হয়ে গদাকে আবার কিসের ভয় ? ও গদার ঘা খেয়ে খেয়ে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে যে !"

—"তা যা বলেছ, পেটে খেলেই পিঠে সয় ! হেঁঃ, মাইনেটি তো বড় কম পাও না ! যাক ও কথা ! সেনাপতি, তুমিই যুদ্ধে যাও ! আমি আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না ।"

সেনাপতি বিদায় নিলে ।

ব্যাঘ্ররাজ বললে, "মন্ত্রী, মনে আছে তো, মালব-রাজার মেয়ে দত্তা দেবী আমার কাছ থেকে দু-মাস সময় চেয়েছিল, আজ সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ !"

—"তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দত্তা দেবীর সঙ্গে আজ বাদে কাল আমার বিয়ে হবে ! হেঁঃ, কি আনন্দ মন্ত্রী, কি আনন্দ ! কাল সকালে উঠেই তুমি বিয়ের সব বন্দোবস্ত করে ফেলো—বুঝেছ ?"

—"বুঝেছি ।"

ব্যাঘ্ররাজ গর্জন করে বললে, "বুঝেছ না ছাই বুঝেছ, ঘোড়ার ডিম বুঝেছ ! হেঁঃ, কি বুঝেছ বল দেখি ?"

—"আজ্ঞে না মহারাজ, আমি কিছুই বুঝি নি !"

—"তাই বল ! তুমি কিছু বুঝলে কি বোকার মতো আমার মন্ত্রী হতে আসতে ? কিন্তু বোঝো আর না বোঝো, যা বললুম মনে রেখো । এখন চল, রাজধানীর সিংহদ্বারের ওপরে নহবৎখানায় বসে মজা করে যুদ্ধ দেখা যাক ।"

আশ্চর্য ব্যাপার, এটা কল্পনাই করা যায় না । ব্যাঘ্ররাজ যা বলেছিল তাই হলো ।

রাজধানীর সামনেই এক মস্ত মাঠ—তার দুই দিকেই গভীর অরণ্য ।

মাঠের মধ্যে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হবার পরেই মগধ সৈন্যেরা বেগে

পলায়ন করতে লাগল এবং তাদের পিছনে পিছনে ছুটল জয়ধ্বনি করতে করতে মহাকান্তারের সৈন্যগণ।

সিংহদ্বারের উপর থেকে বিকট আনন্দে চেঁচিয়ে ব্যাঘ্ররাজ বললে, "দেখছ হে মন্ত্রী, দেখছ? মহাকান্তারের বীরত্বটা দেখছ তো? তবু আমি যুদ্ধে নামি নি।"

মন্ত্রী প্রকাশ্যে কিছু না বলে মনে মনে মাথা নাড়তে নাড়তে মনে মনেই বললে, "দিগ্বিজয়ী মগধ সৈন্যরা এত সহজে পালাবে? অসম্ভব! ভেতরে নিশ্চয়ই কোন ফন্দি আছে। কিন্তু ফন্দিটা যে কি হতে পারে সেটা বোঝা গেল না।"

ব্যাঘ্ররাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মন্ত্রী, মগধের দর্প তো চূর্ণ হলো, আমি বাঘগড়ে দত্তা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চললুম।"

ব্যাঘ্ররাজ চলে গেল, মন্ত্রী কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না। দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মগধ-সৈন্যদের তাড়া করে মহাকান্তারের সৈন্যেরা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো মাঠের দুই পাশের বনের দিকে। চমকে উঠে সে বললে, "অ্যাঁ! আগে ছিল অর্ধচন্দ্র ব্যূহ, এখন হচ্ছে চক্রব্যূহ! কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

হরিণ ছোটে অন্ধ বনে,
নেই নিশানা—নেই ঠিকানা।
হায় সে ভীরু, পায় নি খবর
ব্যাঘ্র কোথায় দিচ্ছে হানা।

মগধ-সৈন্যের সঙ্গে মহাকান্তারের সৈন্যদের যুদ্ধ হচ্ছিল নগরের সিংহদ্বারের—অর্থাৎ সামনের দিকে।

সেখান থেকে বাঘগড়ে যেতে হলে নগরের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে ক্রোশ তিনেক পথ পেরুতে হয়। এ পথ বাইরের কেউ চেনে না। কাজেই নগরে কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে ব্যাঘ্ররাজ এইখানে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করত। এবং নিরাপদ বলেই সে দত্তা দেবীকে লুকিয়ে রেখেছিল বাঘগড়ে।

রাজধানী থেকে বাঘগড়ের পথ ক্রোশ-তিনেকের বেশি নয় বটে, কিন্তু কোন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে ও-পথে হাঁটবার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহাকান্তারের বিভীষণ মূর্তি এইখানেই ফুটে উঠেছে ভালো করে কেবল অরণ্যই যে এখানে বেশি নিবিড় ও দুর্ভেদ্য, তা নয়; একটানা পাহাড়, চড়াই-উৎরাই, গিরিসঙ্কট, জলপ্রপাত, নদী ও খাদ প্রভৃতি একত্রে মিলে এ স্থানটাকে মানুষের অগম্য করে তোলবার চেষ্টা করেছে। বনবাসী হাতীরা পর্যন্ত এদিকটা মাড়াতে চায় না। যদিও বনের অন্ধকার এখানে যখন-তখন কেঁপে ওঠে বাঘের ধমকে ও ভাল্লুকের ঘুৎকারে এবং ভয়াবহ অজগররা নীরবে শিকার খুঁজে বেড়ায় এর যেখানে-সেখানে! যে মানুষ এখানকার গুপ্তপথ চেনে সেও যদি একবার অন্যমনস্ক হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু-সম্ভাবনা।

শহর থেকে বাঘগড়ে যাবার এই অতি দুর্গম পথটি রীতিমত সুরক্ষিত। ব্যাঘ্ররাজ পথের উপরে পাহারা দেবার জন্যে প্রায় চারিশত রক্ষী সৈন্য নিযুক্ত করেছেন। তাদের কারুকেই চোখে দেখা যায় না। অন্ধ গিরিগুহার ভিতরে, বড় বড় পাথরের আড়ালে, প্রকাণ্ড বনস্পতির পত্রবহুল ডালে ডালে নিঃশব্দ ছায়ার মতো তারা আত্ম-গোপন করে থাকে—হাতে তাদের ধারালো বর্শা, ধনুক-বাণ! শত্রু কিছু জানবার বোঝবার আগেই ইহলোকের গণ্ডী ছাড়িয়ে হাজির হবে একেবারে পরলোকের সীমানায়!

বাঘগড়ের পিছনেও আর একটা দুর্গম গুপ্তপথ আছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে বাইরের শত্রু আসবার সম্ভাবনা নেই, কারণ বাইরের কেউ তার অস্তিত্ব জানে না। ভবিষ্যতে যদি কখনো চূড়ান্ত বিপদে দরকার হয়, ব্যাঘ্ররাজ সেইজন্যে নিজের ব্যবহারের জন্যে এই পালাবার পথটি তৈরি করে রেখেছে। এদিকে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকালয় নেই বলে পথে পাহারা দেবার জন্যে রক্ষী রাখবারও দরকার হয়নি।

হয়তো সব দিকে আট-ঘাট বাঁধা বলেই দুর্গ হিসাবে বাঘগড়কে দুর্ভেদ্য করবার চেষ্টা হয়নি। ধরতে গেলে তাকে গড় না বলে প্রাসাদ বলাই উচিত। সেকালে কেবল রাজবাড়ি নয়, অধিকাংশ সাধারণ ধনীর চারিদিকে গড়খাই-কাটা উঁচু পাঁচিল-ঘেরা অট্টালিকাকেও দুর্গ বলে মনে হোত। প্রাচীন কালে, এমন কি মধ্যযুগেও আইনের বাঁধন এমন কঠিন ছিল না, দেশে সর্বদাই ছিল অশান্তির সম্ভাবনা, কেবল বিদেশী শত্রু নয়—বড় বড় ডাকাতদের সশস্ত্র দলও যখন-তখন গৃহস্থদের করত আক্রমণ। এই সব কারণে যার কিছুমাত্র সঙ্গতি ছিল, সেই-ই নিজের বাড়িকে যতটা সম্ভব দুর্গের আদর্শে গড়ে তোলবার চেষ্টা করত।

এই বাঘগড়ে বন্দিনী হয়েছেন মালব রাজকুমারী দত্তা দেবী।

প্রাসাদের তিনতলার ছাদে সুদূর অরণ্য ও পর্বতমালার দিকে

হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দত্তা দেবী দাঁড়িয়েছিলেন। পাশেই তাঁর পরিচারিকা বা সহচরী লক্ষ্মী। ইনিও মালব দেশের মেয়ে, দত্তা দেবীর সঙ্গে বন্দীত্ব স্বীকার করেছেন।

দত্তা বললেন, "আজ আমার শেষ স্বাধীনতার দিন, লক্ষ্মী!"

—"দেবী, আজও কি আপনি নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করছেন? আপনি যে বন্দিনী, এ কথা কি ভুলে গিয়েছেন?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দত্তা বললেন, "কিছুই ভুলিনি লক্ষ্মী! ব্যাঘ্ররাজ বন্দী করেছে কেবল আমার দেহকে, এখনো মন আমার নিজেরই আছে। কিন্তু সে আমাকে আজ পর্যন্ত সময় দিয়েছে, আজ যদি এখান থেকে উদ্ধার না পাই, তবে কাল সে আমাকে বিবাহ করবে—তখন আমার দেহ আর মন দুই-ই হবে বন্দী!"

ভাঙা-ভাঙা গলায় লক্ষ্মী বললেন, "দেবী, সেই অসীম দুর্ভাগ্যের জন্যই প্রস্তুত হোন। যাঁর আশায় আপনি পথ চেয়ে আছেন, সেই সমুদ্রগুপ্ত তো আজও এলেন না!"

—"ব্যাঘ্ররাজের এক সর্দারকে আমার গায়ের সমস্ত অলঙ্কারের লোভ দেখিয়ে বশীভূত করেছি। সে যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্তকে আহ্বান করতে গিয়েছে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হয় সে পথে কোন বিপদে পড়েছে, নয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি।"

—"দেবী, এটাও তো হতে পারে যে মহারাজা সমুদ্রগুপ্ত আপনার দূতের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি?"

—"অসম্ভব লক্ষ্মী, অসম্ভব! মনের চোখে আমি দ্বাপরের ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জুনের যে-সব বীর-মূর্তি দেখতে পাই, সমুদ্রগুপ্তের কথা ভাবলে তাঁদের কথাই স্মরণ হয়! যে মহাবীর আর্যাবর্তের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দৃঢ় পণ করেছেন, অনার্য নর-রাক্ষসের কবলে বন্দিনী আর্য কন্যার কাতর ক্রন্দনে তিনি যে কর্ণপাত করবেন না, এ অসম্ভব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না!"

লক্ষ্মী কথা শুনতে শুনতে কান পেতে যেন আরো কিছু শুনছিলেন। তিনি বললেন, "খুব দূর থেকে অস্পষ্ট সমুদ্র গর্জনের মতো একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন কি?"

সেটা হচ্ছে রাজধানীর অনতিদূরে যে যুদ্ধ চলছে তারই গোলমাল। দুই পক্ষের প্রায় পঁচাশী হাজার সৈনিকের সিংহনাদ বা আর্তনাদ ও অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা, মহাকান্তারের তিন-চার ক্রোশব্যাপী নদী-জঙ্গল-পাহাড়ের উপর দিয়ে বাতাস বহন করে আনছে তারই কিছু-কিছু নমুনা!

দত্তাও শুনলেন। হতাশ ভাবে বললেন, "কাল আমার বলিদান। রাজধানীর রাক্ষসরা তাই হয়তো আজ থেকেই উৎসব আরম্ভ করেছে!"

সেই নিরাশা-মাখা কণ্ঠস্বর শুনে লক্ষ্মীর চোখে এল জল। পাছে দত্তা দেখতে পান তাই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আর একটা শব্দ শুনে লক্ষ্মী দ্রুতপদে ছাদের ধারে ছুটে গেলেন। সেখান থেকে একবার সামনের দিকে চেয়েই তিনি আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "দেবী, দেবী!"

—"কি লক্ষ্মী?"

—"দূরে বনের পথে চারজন অশ্বারোহী!"

দত্তাও ছুটে গিয়ে দেখলেন।

—"দেবী, ওদের একজনের চেহারা দেখুন! প্রকাণ্ড মানুষের মতন মূর্তি, বাঘ-ছালের পোশাক! ব্যাঘ্ররাজ আসছে!"

—"হুঁ, আমার বলির আয়োজন করতে!" বলতে বলতে দত্তা দেবীর দুই চক্ষে জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা! তীব্র স্বরে আবার তিনি বললেন, "লক্ষ্মী, প্রাণ বড়, না মান বড়?"

—"মান বড় দেবী, মান বড়!"

—"তাহলে তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?"

—"কোথায়?"

—"বাঘগড়ের পিছনকার বনে? ওখানে কেউ পাহারা দেয় না।"

—"দেয় দেবী। ওখানে পাহারা দেয় হিংস্র জন্তুরা—বাঘ, ভাল্লুক, বরাহ, অজগর।"

—"কিন্তু ব্যাঘ্ররাজের চেয়ে তারা ভয়ানক নয়! তারা মানুষের মান কেড়ে নেয় না। আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি……লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, আর দেরি নয়! ঐ শোনো, ঘোড়ার পায়ের শব্দ কত কাছে এসে পড়ল! আর দেরি করলে পালাবারও সময় পাব না। আমি পিছনের দরজা দিয়ে এখনি বেরিয়ে যাব—তোমার যদি ভয় হয় তবে তুমি এখানেই থাকো। বিদায় লক্ষ্মী!"

—"আপনার সঙ্গে যখন এখানে এসেছি, তখন অন্য কোথাও যেতে আমার ভয় হবে না!"

দুজনে প্রাণপণে ছুটে ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

ওদিকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ বাঘগড়ের ভিতরে এসে থামল।

একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে ব্যাঘ্ররাজ প্রাসাদের উপরে উঠে এল এবং একেবারে প্রবেশ করলে দত্তা দেবীর ঘরে।

ঘরে কেউ নেই। ব্যাঘ্ররাজ চীৎকার করে ডাকলে, "দত্তা দেবী, দত্তা দেবী কোথায়? আমি এসেছি, শুনতে পাচ্ছ না?"

তবু কারুর সাড়া নেই।

—"প্রহরী, প্রহরী! শীগ্গির দত্তা দেবীকে ডেকে আনো!"

প্রহরীরা চারিদিকে ছুটল। ব্যাঘ্ররাজ দুম্-দুম্ শব্দে মেঝে কাঁপিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রহরীরা খানিক পরে এসে ভয়ে ভয়ে জানালে, প্রাসাদের কোথাও দত্তা দেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্যাঘ্ররাজ কট্মট্ করে দুই চোখ পাকিয়ে এবং দুই পাটি দাঁত বার করে খিঁচিয়ে বলে উঠল, "কী! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? আমার সামনে এত-বড় অলক্ষুণে কথা বলবার সাহস হল তোদের? জানিস্, এখুনি সবাইকে শূলে চড়িয়ে দেব?"

এমন সময়ে হন্তদন্তের মতন মন্ত্রী-মহাশয়ের প্রবেশ।

ব্যাঘ্ররাজ তেড়ে উঠে বললে, "হেঁঃ! তুমি আবার আমার পিছু-পিছু এখানে মরতে এলে কেন? কে তোমাকে ডেকেছে?"

– "মহারাজ, মহারাজ!"

—"চুপ কর মন্ত্রী, বাজে কথা এখন ভালো লাগছে না। জানো, দত্তা দেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"মহারাজ, ওদিকে যে সর্বনাশ উপস্থিত!"

—"মন্ত্রী, গদার বাড়ি দু-এক ঘা না খেলে তোমার মুখ বন্ধ হবে না বুঝি!"

—"মহারাজ, এতক্ষণে বোধ হয় মগধ-সৈন্যরা রাজধানী দখল করেছে।"

ব্যাঘ্ররাজ এবারে গর্জন না করে অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে বললে, "আমার সঙ্গে এসেছ ঠাট্টা করতে? স্বচক্ষে দেখে এলুম—"

—"স্বচক্ষে যা দেখেছেন ভুল দেখেছেন। মগধ সৈন্যরা পালাচ্ছিল বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে তাদের কৌশল!"

ব্যাঘ্ররাজের রাগ এইবারে জল হয়ে এল। হতভম্বের মতো বললে, "কৌশল?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্রের দুই পাশে ছিল গভীর বন। মগধের হাজার কুড়ি সৈন্য মাঝখানে ছিল অর্ধ-চন্দ্রের আকারে। আমরা আক্রমণ করতেই আপনি তাদের পালিয়ে যেতে দেখেছেন তো?—কিন্তু তারা পালায় নি,—মহাকান্তারের সৈন্যদের ভুলিয়ে নিজেদের অর্ধচন্দ্র ব্যূহের আরো ভিতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

—"তারপর মন্ত্রী, তারপর?"

—"তারপর হঠাৎ দেখি, যুদ্ধক্ষেত্রের দুই ধারের বন থেকে পিল্-পিল্ করে মগধ সৈন্য বেরিয়ে আসছে। যে সব শত্রু পালাচ্ছিল আচমকা তারা ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ করলে। আমরা সে আক্রমণও হয়তো সহ্য করতে পারতুম, কিন্তু দেখতে দেখতে দুইধারের বন থেকে আরো প্রায় হাজার

ত্রিশ মগধ-সৈন্য বেরিয়ে মহাকান্তারের সৈন্যদের ডান, বাম ও পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেললে। সেই পঞ্চাশ হাজার শত্রুর চক্রব্যূহের ভিতরে পড়ে আমাদের পঁচিশ হাজার সৈন্যের যে অবস্থা হল তা আর বলবার নয়। মগধের জয়নাদে আর মহাকান্তারের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরে গেল! আমি আর সইতে না পেরে আপনাকে খবর দেবার জন্যে প্রাণপণে ছুটে আসছি। এতক্ষণে আমাদের সব সৈন্য যে হত বা বন্দী হয়েছে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই—হয়তো মগধ-সৈন্যরা আমাদের রাজধানীও অধিকার করেছে!"

রবারের বলের ভিতর থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেলে সেটা যেমন চুপসে যায়, মন্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে ব্যাঘ্ররাজের মুখের অবস্থাও হল কতকটা সেই রকম। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, "মন্ত্রী, তোমার বাক্যি শুনে আমার পিলে ভয়ানক চমকে যাচ্ছে যে। মহাকান্তারের রাজধানীতে মগধের সৈন্য! আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছি?"

আচম্বিতে বাঘগড়ের প্রাকার থেকে ভোঁ-ভোঁ রবে বেজে উঠল প্রহরীর ভেরী!

ব্যাঘ্ররাজ চমকে লাফ মেরে বললে, "মন্ত্রী, ও আবার কি বাবা?"

একজন লোক দৌড়ে এসে সভয়ে খবর দিলে, "মহারাজ! বাঘ-গড়ের পিছনকার বনের ভিতর দিয়ে দলে দলে শত্রু আসছে!"

—"মন্ত্রী, মন্ত্রী, একি শুনি? বাঘগড়ের পিছনকার বনের গুপ্ত-পথের সন্ধান শত্রুরা জানলে কেমন করে?"

—"মহারাজ, আমাদের রাজ্যে নিশ্চয় কোন বিশ্বাসঘাতক আছে!"

আবার ভেরী বাজল ভোঁ ভোঁ!

আবার আর একটা লোক এসে খবর দিলে, "মহারাজ, হাজার হাজার শত্রু রাজধানীর দিক থেকে বাঘগড়ের পথ দিয়ে ছুটে আসছে!"

ব্যাঘ্ররাজ ধপাস করে একখানা আসনের উপরে বসে পড়ে বললে, "কি হবে মন্ত্রী, এখন কি হবে? সামনে শত্রু, পিছনে শত্রু! বাঘগড় তো নামে মাত্র কেল্লা! শত্রুদের ঠেকাই কেমন করে? ও বাবা, এ আমার কি হল গো!"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, শত্রুদের দৃষ্টি দেখছি বাঘগড়ের দিকেই! ওরা নিশ্চয় দত্তা দেবীর খোঁজেই এদিকে আসছে!"

ব্যাঘ্ররাজ মাথায় করাঘাত করে বললে, "হায় রে আমার পোড়া-কপাল! কেন ও কাল-সাপিনীকে ধরতে গিয়েছিলুম!"

—"মহারাজ, আর আক্ষেপ করারও সময় নেই! যদি বাঁচতে চান তো তাড়াতাড়ি বাঘগড়ের পিছনকার গুপ্তদ্বার খুলে বনের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবেন চলুন!"

মন্ত্রী ছুট মারলে—পিছনে ব্যাঘ্ররাজও!

গুপ্তদ্বার খুলে বাইরে বেরিয়ে যেতে তাদের কিছুমাত্র দেরি হলো না।

দত্তা দেবী ও লক্ষ্মীও এই পথেই পলায়ন করেছেন। একই পথ ধরে ছুটল বাঘ ও হরিণ!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অাঁধার-পথেও এগিয়ে গেল
পথ হারালো যারা,
সামনে হঠাৎ জাগল কখন
উজল ধ্রুবতারা।

কোথায় আকাশ, কোথায় বাতাস! সে যেন অন্ধকারের অনন্ত সাম্রাজ্য! উপরে, নীচে, এপাশে, ওপাশে অন্ধকারের পরে যেন অন্ধকারের তরঙ্গ! সে যেন বিরাট এক ক্ষুধার্ত বিভীষিকা, পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে!

লক্ষ্মী প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "দেবী, চোখ আর পা কিছুই যে চলছে না! নীচে পথ নেই, মাথার ওপরে ঘন পাতার ভেতরে একটা ফুটো, আলোর একটা রেখা পর্যন্ত নেই!"

দত্তা বললেন, "তবু আমাদের এগুতে হবে! চল লক্ষ্মী, দু-হাতে বনজঙ্গল ঠেলে আরো ভেতরে গিয়ে লুকোই চল! এ অন্ধকারকে এখন আমার বন্ধু বলে মনে হচ্ছে! এখানে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না!"

—"না দেবী, না! আমার মনে হচ্ছে, এখানে শত শত অজানা শত্রু অদৃশ্য চক্ষু মেলে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে! তাদের হাত ছাড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই—কোন উপায় নেই!" লক্ষ্মীর গলার আওয়াজ শুনে বোধ হয়, এইবারে তিনি কেঁদে ফেলবেন!

দত্তা লক্ষ্মীর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে ধীরে ধীরে বললেন, "ভয় পেও না লক্ষ্মী, তাহলে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। এই ভয়ানক গহন-বনে আমাদের কপালে যদি মৃত্যুই লেখা থাকে, তাহলেও এই সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারব যে, ব্যাঘ্ররাজকে আমরা ফাঁকি দিয়েছি!"

ফোঁস করে একটা বিশ্রী গর্জন জেগে উঠল—লক্ষ্মীর পায়ের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে চলে গেল যেন একটা শীতল ও ভয়াবহ শব্দ-বিদ্যুৎ! এবারে লক্ষ্মী ভয়ার্ত চীৎকার না করে থাকতে পারলেন না।

—"চুপ, চুপ! হল কি লক্ষ্মী?"

—"পায়ের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে গেল! দেবী, আর আমি এগুতে পারব না, কপালে যা আছে তাই হবে!"

—"তাহলে তুমি এইখানে থাকো, আমি একলাই অগ্রসর হবো।"

—"কোথায় অগ্রসর হবেন? সামনের দিকে চেয়ে দেখুন! মাগো!"

দশ-বারো হাত তফাতে অন্ধকার হয়ে উঠেছে যেন অগ্নিময়! চারটে বড় বড় বুভুক্ষু চক্ষু দপ্ দপ্ করে জ্বলছে! ও কাদের চোখ? বাঘ ও বাঘিনী? ভাল্লুক? বরাহ? কিছুই বোঝা যায় না!

দুই হাতে মুখ ঢেকে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন লক্ষ্মী।

দীপ্ত চোখগুলো নিবে গেল। অন্ধকারের মধ্যে শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ হল! জন্তু দুটো চলে যাচ্ছে।

দত্তা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ভয় নেই লক্ষ্মী! মৃত্যু আপাতত আমাদের গ্রহণ করলে না।"

পরমুহূর্তেই অন্ধকার যেন আচম্বিতে ভাষা পেয়ে বললে, "কে? কে এখানে কথা কইছে?"

দত্তা অন্ধের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলেন—পিছনে পিছনে লক্ষ্মীও।

কখনো বড় বড় গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে, কখনো কাঁটাঝোপে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, কখনো মাটির উপরে পড়েই আবার উঠে তাঁরা ছুটতে লাগলেন এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁদের মনে হতে লাগল এই মুহূর্তেই জীবনের শেষ মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন তাঁদের পিছনেও উঠেছে একাধিক পায়ের দ্রুত পদশব্দ! যারা পালাচ্ছে

আর যারা অনুসরণ করছে তারা কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না—কেবল পদশব্দের পিছু নিয়েছে পদশব্দ!

ছুটতে ছুটতে দত্তা লক্ষ্য করলেন, অরণ্য আর তত দুর্ভেদ্য নয়, অন্ধকার আর তত গাঢ় নয়, মাথার উপরে মাঝে মাঝে আলোর আভাস, মাঝে মাঝে ফুঠে উঠছে সমুজ্জ্বল আকাশের এক-একটা টুকরো। দারুণ ভয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অন্ধকারের যে-নিবিড়তা এতক্ষণ তাঁদের রক্ষা করছিল, এই বারে তার সাহায্য বুঝি হারাতে হয়!

পিছন থেকে বিকট চীৎকার জাগল, "পেয়েছি মন্ত্রী, আমার বৌকে পেয়েছি!"

ব্যাঘ্ররাজ ও মন্ত্রী তখন দত্তাদের খুব কাছে এসে পড়েছে।

অন্ধকারের রাজ্য শেষ হল—একখণ্ড খোলা জমির উপরে বিরাজ করছে দিনের আলো।

আর পালাবার চেষ্টা করা মিছে বুঝে দত্তা ও লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ব্যাঘ্ররাজও দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বাব্বাঃ! তুমি বউ, না উড়োপাখি? একেবারে বেদম হয়ে গিয়েছি যে!"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, এখানে অপেক্ষা করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? বনের গুপ্তপথ দিয়ে শত্রু আসছে সে কথা কি ভুলে গেলেন?"

—"হেঁঃ! সে কথাও ভুলি নি, আমার বউকেও ভুলব না! হারাধন যখন ফিরে পেয়েছি তখন তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

—"মহারাজ, শাস্তরে বলে, পথে নারী বিবর্জিতা।"

—"মরছি হাঁপিয়ে, এখন আবার শাস্তর-ফাস্তর নিয়ে গোলমাল কোরো না বাপু।"

—"আমার কথা শুনুন মহারাজ! ঐ দত্তা দেবীর জন্যেই আজ আপনার এত বিপদ! আমি বলি কি, ও-আপদকে আপনি বনবাস দিয়ে যান!"

—"মন্ত্রী, গদাটা আমি ভুলে ফেলে এসেছি বলেই তুমি এত মুখ

নাড়ছ বুঝি? কিন্তু জানো তো, আমার হাত গদার চেয়ে কম শক্ত নয়!" ব্যাঘ্ররাজ ভারি ভারি পা ফেলে দত্তার দিকে এগিয়ে গেল।

দত্তা পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, "রাজা, আমার কাছে আসবেন না।"

—"কাছে আসব না মানে? হেঁঃ, তুমি না আমার বউ হবে?"

—"আপনার স্ত্রী হবার আগে আমি আত্মহত্যা করব।"

—"এ আবার কি-রকম উলটো কথা হল? এমন কথা তো ছিল না!"

—"মালবের রাজকুমারীর সঙ্গে কোন পশুর বিয়ে হতে পারে না!"

ব্যাঘ্ররাজের কুতকুতে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ও তার বাঁদুরে থ্যাবড়া নাকটা ফুলে উঠল, এমন আশ্চর্য কথা আজ পর্যন্ত তার মুখের সামনে আর কেউ বলতে সাহস করে নি। সে বললে, "আমি পশু? ওহে মন্ত্রী, মেয়েটা বলে কি হে?"

মন্ত্রী মনে মনে বললে, মেয়েটা অত্যুক্তি করে নি। মুখে সান্ত্বনা দিয়ে বললে,"মহারাজ, দত্তা দেবী আপনাকে বোধ হয় পশুরাজ বলতে চান। আপনি পুরুষসিংহ কিনা?"

অমনি বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, দুইদিকে দুই বাহু ছড়িয়ে ব্যাঘ্ররাজ সগর্বে বললে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! বউ, একবার আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি, সত্যিই আমি পুরুষসিংহ কিনা! এমন চেহারা কটা দেখেছ?"

মন্ত্রী মনে মনে বললে, মানুষের সৌভাগ্য যে, পৃথিবীতে এমন চেহারা বেশি দেখা যায় না।

দত্তা কিছু বললেন না, তাঁর দুই চোখে বিজাতীয় ঘৃণা।

ব্যাঘ্ররাজ হঠাৎ লাফ মেরে দত্তাকে ধরতে গেল।

দত্তা তাড়াতাড়ি পিছনে সরে গেলেন।

লক্ষ্মী আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন,"কে আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

ব্যাঘ্ররাজ অট্টহাস্য করে বললে, "ভয় নেই, আমিই তোমাদের রক্ষা করব!"

—"রক্ষা কর, রক্ষা কর !"

—"ওহে মন্ত্রী, একেই বুঝি অরণ্যে রোদন বলে ? ও বোকা মেয়েটা চেঁচিয়ে কাকে ডাকতে চায় ?"

পিছন থেকে গম্ভীর স্বরে কে বললে, "আমাকে।"

ব্যাঘ্ররাজ চমকে ফিরে সবিস্ময়ে দেখলে, এক দীর্ঘদেহ সৈনিক স্থির পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছেন ! মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে বর্ম, পৃষ্ঠে তূণ ও ধনু, কটিবন্ধে তরবারি, ডান হাতে বর্শাদণ্ড। মুখ দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি কোন অসাধারণ পুরুষ।

ব্যাঘ্ররাজ আগন্তুকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। তুমি কে বট হে ?"

—"আমি সমুদ্রগুপ্ত।"

ব্যাঘ্ররাজের চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে পড়বার মতো হলো। বিস্ময়ের আতিশয্যে সে কথা বলতে পারলে না।

দত্তা দৌড়ে সমুদ্রগুপ্তের কাছে গিয়ে অবশ হয়ে বসে পড়লেন।

সমুদ্রগুপ্ত প্রশান্ত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেবী, শ্রেষ্ঠ ফুল দেখলেই চেনা যায়, পরিচয়ের দরকার হয় না। মালব-রাজকুমারী, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।"

ব্যাঘ্ররাজ চীৎকার করে বললে, "ওহে সুমুদ্দুরগুপ্ত, তুমি জানো আমি কে ?"

সমুদ্রগুপ্ত একটু হেসে বললেন, "নিকৃষ্ট পশুকেও দেখলেই চেনা যায়। তুমি ব্যাঘ্ররাজ। এতক্ষণে আমার সৈন্যরা তোমার রাজধানী দখল করছে। পাছে মালব-রাজকুমারীকে নিয়ে তুমি এইদিক দিয়ে পালিয়ে যাও, সেই ভয়েই গুপ্তপথ দিয়ে আমি বাঘগড়ে যাচ্ছিলুম।"

—"একা ?"

—"একটু আড়ালেই আমার একহাজার সৈন্য অপেক্ষা করছে। তুমি কি তাদের দেখতে চাও? একবার ভেরী বাজালেই তারা আসবে।"

মন্ত্রী চুপিচুপি বললে, "এখন বুঝুন মহারাজ, এদিকে এসে আপনি কি অন্যায় করেছেন!"

দাঁতে দাঁত ঘষে ব্যাঘ্ররাজ বললে, "কি বলব সুমুদ্দুরগুপ্ত, নিতান্ত একলা পড়ে গেছি, নইলে তোমাকে একবার দেখে নিতুম।"

সমুদ্রগুপ্ত সে কথার জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে দত্তার হাত ধরে তুলে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ব্যাঘ্ররাজ গর্জন করে বললে, "কী! আমার বউ-এর গায়ে হাত! মন্ত্রী, মন্ত্রী, থাব্ড়া মেরে সমুদ্দুরের গালটা ভেঙে দিয়ে এসো তো!"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, ও কাজটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো করে করতে পারবেন। আমি এখন পালালুম।"

ব্যাঘ্ররাজ ব্যস্ত হয়ে বললে, "দাঁড়াও হে মন্ত্রী, দাঁড়াও! আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি!"

সমুদ্রগুপ্ত ভেরী বার করে ফুঁ দিলেন!

ব্যাঘ্ররাজ সভয়ে বললে, "ও মন্ত্রী, ও যে আবার শিঙে বাজায় গো!"

মন্ত্রী হতাশভাবে বললে, "এইবারে আমাদেরও শিঙে ফুঁকতে হবে! ঐ দেখুন, চারিধার থেকে দলে দলে সেপাই আসছে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিকেয় তুলে গল্পকথাগুলি,
ঘাঁটব এবার ইতিহাসের ঝুলি !

ব্যাঘ্ররাজকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়-ব্রত সমাপ্ত করবার জন্যে আবার অন্য দিকে যাত্রা করলেন।

এই ফাঁকে আমরা দু-একটা কথা বলে নি। বাজে নয়, কাজের কথা।

একশো বছর আগে সমুদ্রগুপ্তের নামও কেউ জানত না বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তারপরে পণ্ডিতদের প্রাণপণ চেষ্টায় বহু শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে তিনি হচ্ছেন প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন এবং মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত (তিন হাজার মাইল) জয় করে তিনি প্রমাণিত করেছেন, তাঁর কীর্তি-কাহিনী অনায়াসেই আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে !

এক হিসাবে আলেকজাণ্ডারেরও চেয়ে সমুদ্রগুপ্তকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী বলা চলে। প্রথমত, সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, কাব্য ও সঙ্গীতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলে বিখ্যাত। দ্বিতীয়ত, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত এমন দৃঢ় ভিত্তির উপরে সাম্রাজ্য স্থাপন করে গিয়েছিলেন যে, তার পরমায়ু হয়েছিল প্রায় দুই শত বৎসর।

সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা প্রচারিত তিনটি স্বর্ণমুদ্রার প্রতিলিপি আমরা দেখেছি। এই সচিত্র মুদ্রা তিনটি চমৎকার। এর লেখাগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে। মুদ্রাগুলির ছবি থেকে চতুর্থ

শতাব্দীর ভারতীয় সাজপোশাক ও আসবাবের কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর পিতা-মাতার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর আন্দাজ করা যেতে পারে। মুদ্রা তিনটির বর্ণনা দিলুম।

প্রথম মুদ্রা : শিল্পী সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসে বীণা বাজাচ্ছেন। সিংহাসন বলতে সাধারণত আমারা যা বুঝি, এ সে-রকম সিংহাসন নয়। একখানা সামনের দিকে লম্বাটে, কিছু বেশি-উঁচু, বাহারি পায়াওয়ালা জলচৌকির উপরে চেয়ারের মতো পিঠ রাখবার জায়গা থাকলে দেখতে যে-রকম হয় এই সিংহাসন হচ্ছে সেই রকম। এ সিংহাসনকে ভারতীয় কৌচ বলাও চলে। অবশ্য, সিংহাসনটি কি দিয়ে তৈরি সেটা বলা কঠিন। সোনা-রূপো বা অন্য কোন ধাতুরও হতে পারে, কাঠের বা হাতীর দাঁতেরও হতে পারে। ডান পায়ের উপর দিয়ে বাঁ পা ঝুলিয়ে সমুদ্রগুপ্ত উপবিষ্ট, বাঁ পায়ের তলায় পাদপীঠ। তাঁর পেশীবদ্ধ, চওড়া বুক। প্রভামণ্ডলের মাঝখানে খালি মাথা, কানে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে-পড়া কুণ্ডল, গলায় হার। পরনে হাঁটুর উপরে খাটো কাপড়—সেকালের রাজারাজড়ারা যে রাজসভার বাইরে বেশি কাপড়-চোপড় পরতেন না, এটা হচ্ছে তারই প্রমাণ। তাঁর হাতের বীণাটি অলাবুহীন, ধনুকাকৃতি—অনেকটা প্রাচীন য়ুরোপীয় বীণার মতো। মুদ্রাটি ক্ষয়ে গেছে বলে মূর্তির মুখ স্পষ্ট নয়, কিন্তু রীতিমত টিকালো নাকটি বেশ দেখা যায়। গঠন ছিপ্‌ছিপে, কিন্তু বলিষ্ঠ। মুদ্রার চারিধারে মণ্ডলাকারে লেখা—"মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তঃ"।

দ্বিতীয় মুদ্রা : যোদ্ধা, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কানে কুণ্ডল, উর্ধোত্থিত বাম হাতে ধনুক, ডান হাতে তরবারি কিংবা দণ্ড, পরনে পাজামা, পায়ে পাদুকা। অশ্বারোহীর বেশ। সমুদ্রগুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাই তাঁর সামনে গরুড়ধ্বজার উপরে গরুড়ের মূর্তি। সমুদ্রগুপ্তের এ মূর্তির মুখেও বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর সুদীর্ঘ নাসিকাটি।

তৃতীয় মুদ্রা ঃ সমুদ্রগুপ্ত এর উপরে দেখিয়েছেন তাঁর পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও মাতা কুমার দেবীকে। এটি নাকি তাঁদের বিবাহের স্মারক মুদ্রা। মা কুমার দেবী মহাসম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন লিচ্ছবি রাজবংশের মেয়ে বলে সমুদ্রগুপ্ত যথেষ্ট গর্ব অনুভব করতেন। চন্দ্রগুপ্তের যোদ্ধার বেশ। কুমার দেবীর দেহের উপর-অংশ অনাবৃত। পণ্ডিতেরা বলেন, সেকালের রাজপরিবারেরও মেয়েরা খালি বা আদুল গায়ে থাকতেন। (কিন্তু গুপ্ত-রাজত্বেই মহাকবি কালিদাসের উদয় হয়েছিল, তাঁর কাব্যে কি এর নজীর আছে ?) চন্দ্রগুপ্ত ডান হাতে করে রানী কুমার দেবীর হাতে কি-একটি গহনা পরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর বাঁ হাতে অর্ধচন্দ্র-পতাকা। তাঁর বাঁ পাশে উপর থেকে নীচে লেখা "চন্দ্রগুপ্ত" এবং নারীমূর্তির ডান পাশে লেখা "শ্রীকুমার দেবী।"

সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির চেহারা ও পোশাকের কথা বলা হলো। কিন্তু কি-রকম ফৌজ নিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, এবারে সেটা দেখা দরকার। তবে এ-বিভাগে আমাদের অল্পবিস্তর অনুমানের সাহায্য নিতে হবে। কারণ, সমুদ্রগুপ্ত নিজের দিগ্বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন বটে, কিন্তু নিজের বাহিনীর বর্ণনা দেন নি।

তবে আমাদের অনুমান বিশেষ ভ্রান্ত হবে না। কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের যুদ্ধশাস্ত্র সেনাগঠনের যে সব নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তার আর কোন অদল-বদল হয়নি বললেও চলে। রামায়ণে—বিশেষ করে মহাভারতে ফৌজ ও যুদ্ধরীতির যে-সব বর্ণনা পড়ি, কবিকল্পনার অত্যুক্তি ত্যাগ করলে দেখি আলেকজাণ্ডারের ভারতীয় অভিযানের সময়েও সে-সব বর্ণনার অনেকটাই হুবহু মিলে যায়। সমুদ্রগুপ্তেরও ঢের পরে, সপ্তম শতাব্দীর সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রাচীন রীতির কিছু কিছু ত্যাগ করেছিলেন। ভারতীয় ফৌজের প্রধান একটি অঙ্গ—অর্থাৎ রথারোহী সৈন্যদল তিনি গঠন করেন নি। যদিও হর্ষবর্ধনের যুগে অন্যান্য যুদ্ধের সময়ে যে রথ ব্যবহৃত হতো তার প্রমাণ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙের

বর্ণনায় দেখি, একজন ভারতীয় সেনাপতি চার ঘোড়ায় টানা রথে চেপে এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

এ গেল সপ্তম শতাব্দীর কথা। এরও প্রায় একহাজার বছর আগেকার যবনিকা তুললে দেখা যাবে : গ্রীকদের বিরুদ্ধে রাজা পুরুর রথারোহী সৈন্যেরা যুদ্ধে চলেছে। প্রত্যেক রথে জোড়া চার ঘোড়া এবং প্রত্যেক রথের উপরে রয়েছে যে ছয়জন করে আরোহী, তাদের মধ্যে দুজন হচ্ছে ঢাল-বাহী, দুজন ধনুক-ধারী এবং দুজন সারথি। শত্রুদের ভিতরে গিয়ে পড়লে, হাতাহাতি যুদ্ধের সময়ে সারথিরাও ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে ধনুর্বাণ নিয়ে লড়াই করে।

এক হাজার বছরের ভিতরে যে-দেশে একমাত্র হর্ষবর্ধন (তাও ৭ম শতকে) ছাড়া আর কেউ ফৌজ গঠনে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন নি, সে-দেশে চতুর্থ শতকের যোদ্ধা সমুদ্রগুপ্তও যে ফৌজে প্রাচীন ধারাই বজায় রেখেছিলেন, এটা অনুমান করা কঠিন নয়। অন্তত হর্ষবর্ধনের আগে আর কেউ যে ভিন্নভাবে ভারতীয় ফৌজ গঠন করেছিলেন, এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

আলেকজাণ্ডারের ভারতীয় অভিযান দেখে কিছু-কিছু নূতন শিক্ষা পেয়ে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত হয়তো স্বগঠিত ফৌজকে অল্প-বিস্তর পরিবর্তিত করেছিলেন এবং তারপর থেকে খুব সম্ভব মৌর্য ফৌজই ছিল ভারতের আদর্শস্থানীয়। কিন্তু প্রথম ভারত-সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ফৌজের প্রধান চার অঙ্গই বজায় রেখেছিলেন, যথা—অশ্বারোহী, পদাতিক. হস্তী ও রথ। এবং সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সেনাবিভাগের এই চতুরঙ্গ অবলম্বন করেই প্রত্যেক রাজা করতেন যুদ্ধযাত্রা।

ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি সমুদ্রগুপ্তের ছিল অতিশয় অনুরাগ। আর্য সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনকে পুনর্বার নবজীবনে পরিপুষ্ট করে তোলবার চেষ্টাই যে ছিল তার জীবনের সাধনা, এর ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে

ভারতের অবস্থা কি-রকম ছিল তার কোন ঐতিহাসিক ছবি নেই বটে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের মধ্যে আর্য আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রভৃতির বড় অল্প পরিচয় পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্ত সেই আদর্শ, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন অধিকতর সমুজ্জ্বল রূপেই। বৌদ্ধধর্মের আসরে তিনি হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হিন্দু শিল্প ও সাহিত্যকে করেছিলেন বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁর যুগে পালি ও প্রাকৃতের বদলে দেবভাষা সংস্কৃতই হয়েছিল সাহিত্যের ভাষা। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা লুপ্ত হয়েছিল বৌদ্ধদের অহিংস ধর্মের মহিমায়; সমুদ্রগুপ্ত আবার সেই প্রথার পুনঃপ্রচলন করেন। এমন-কি তাঁর দিগ্বিজয় যাত্রার মধ্যেও দেখতে পাই রামায়ণ-মহাভারতে কথিত পৌরাণিক দিগ্বিজয়ীদের অনুসরণ। সুতরাং ফৌজ গঠনের সময়েও তিনি যে পুরাতন যুদ্ধশাস্ত্রের নিয়ম মেনেই কাজ করতেন এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহ হবার আর একটা বড় কারণ এই: ফৌজ গঠনে সমুদ্রগুপ্ত নূতন রীতি অবলম্বন করলে পরবর্তী যুগের যোদ্ধারাও পুরাতনকে ছেড়ে এই নূতন ও সফল রীতিই গ্রহণ করত। কিন্তু তা হয় নি। সপ্তম শতাব্দীতেও দেখি, ভারতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ফৌজের প্রাচীন চতুরঙ্গের কোন অঙ্গের হানি হয় নি।

মৌর্য যুগে ভারতীয় বাহিনী কি ভাবে গঠিত হতো তা দেখলেই সকলে সমুদ্রগুপ্তের ফৌজ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন।

সেকালে ভারতের বড় বড় রাজ-রাজড়াদের কারবার ছিল অগুন্তি সৈন্য নিয়ে। রাজা পুরু মোটে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রীকদের গতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি খুব বড়-দরের রাজা ছিলেন না, গ্রীকদের সংস্পর্শে না এলে আজ তাঁর নাম পর্যন্ত কেউ জানত না। ভারতে তখনকার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মগধের মহারাজা নন্দ—যাঁর ভয়ে আলেকজাণ্ডারকে পর্যন্ত ভারত-বিজয় অসমাপ্ত রেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন

করতে হয়েছিল! গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি বলেন, নন্দের অধীনে ছিল আশী হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার রথ (প্রত্যেক রথে থাকত সারথি ও দুজন করে যোদ্ধা—সুতরাং আট হাজার রথ মানে একুশ হাজার লোক), ছয় হাজার হাতী (প্রত্যেক হাতীর উপরে থাকত মাহুত ও তিনজন করে ধনুকধারী—সুতরাং ছয় হাজার হাতী মানে চব্বিশ হাজার লোক)! অতএব মান বাঁচিয়ে সরে পড়ে আলেকজাণ্ডার বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মগধ জয় করে এই সৈন্যসংখ্যা আরো ঢের বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অধীনে ছিল ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, ছত্রিশ হাজার গজারোহী এবং চব্বিশ হাজার রথারোহী—মোট ছয় লক্ষ নব্বই হাজার নিয়মিত সৈন্য!

ভারতের অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজারাও বেশি লোক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারলে খুশি হতেন না। অনেক কালের কথা নয়, মধ্য-যুগেও বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব (১৫০৯—২৯ খ্রীষ্টাব্দ) সাত লক্ষ তিন হাজার পদাতিক, বত্রিশ হাজার ছয়শো অশ্বারোহী ও পাঁচশো একান্ন রণহস্তী নিয়ে এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন!

সমুদ্রগুপ্ত বেরিয়েছিলেন প্রায় সমস্ত ভারত জয় করতে। সুতরাং তাঁর মতন দিগ্বিজয়ীর অধীনে কত লক্ষ সৈন্য ছিল, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

এই বিরাট ফৌজের তত্ত্বাবধান করা হতো কি উপায়ে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের কার্যবিধি দেখলেই আমরা সেটা ধারণা করতে পারব।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বাহিনীকে ছয় বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন। পরিচালনার জন্যে তিনি ত্রিশজন প্রধান কর্মচারী রেখেছিলেন—প্রত্যেক বিভাগে পাঁচজন করে। বিভাগগুলি এই:

প্রথম: নৌ-বিভাগ। দ্বিতীয়: রসদ-বিভাগ। মাল চালান দেবার, দামামাবাদক, সহিস, কারিকর ও ঘেষেড়া প্রভৃতিরও খোরাকের

জন্যে ভালো ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয়ঃ পদাতিক-বিভাগ। চতুর্থঃ অশ্বারোহী-বিভাগ। পঞ্চমতঃ যুদ্ধরথ-বিভাগ। ষষ্ঠঃ রণহস্তী-বিভাগ।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতীয় ফৌজ চিরকালই পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ ও হস্তী—এই চার অঙ্গ নিয়ে গঠিত হতো। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরও দুটি অঙ্গ জুড়ে দিয়েছিল—রসদ ও নৌ-বিভাগ। হয়তো গ্রীকদের ফৌজ পর্যবেক্ষণ করে এই দুটি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তকেও সমগ্র ভারত জুড়ে সৈন্যচালনা করতে হয়েছিল। রসদের সুব্যবস্থা না থাকলে এটা অসম্ভব হতো। যাত্রাপথে পড়ত তাঁর বহু সেতুহীন নদনদী। সুতরাং তাঁর নৌ-বিভাগও না থাকলে চলত না। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, চন্দ্রগুপ্তের দেখাদেখি তিনিও এই দুটি অঙ্গকে পুরাতন চতুরঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত যথেচ্ছভাবে বা ভাড়াটে সৈন্য যোগাড় করতেন না। তাঁর প্রত্যেক সৈন্য নিজস্ব, তাদের তিনি নিয়মিত মাহিনা দিতেন। ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোশাক ও রসদ—সমস্তই দেওয়া হতো রাজভাণ্ডার থেকেই—মধ্যযুগেও ভারতের ও য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে এ প্রথা ছিল না। কারণ সৈনিকরা হতো হয় ভাড়াটে, নয় নিজেদের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোশাক সংগ্রহ করত নিজেরাই। অনেক সময়েই তাদের রসদও দেওয়া হতো না, তারা যাত্রাপথে যে-সব গ্রাম-নগর পড়ত, লুঠ করে পেট ভরাবার ব্যবস্থা করত। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ত্রিশবৎসরব্যাপী য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময়ে ওদেশে লোকে বলত —"যার তরবারি নেই, জামা-কাপড় বেচে সে তরবারি কিনুক, তাহলেই সেপাই হতে পারবে!" ঐ সময়েই দেখা গিয়েছিল, ব্যাভেরিয়ার ফৌজে লোক আছে এক লক্ষ আশী হাজার, কিন্তু রাজ-ভাণ্ডার রসদ জোগায় মাত্র চল্লিশ হাজার লোকের জন্যে! বাকি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক খাবার যোগাড় করত যথেচ্ছভাবে—অর্থাৎ চুরি, রাহাজানি, লুঠপাট প্রভৃতির দ্বারা!

চাণক্যের মত ছিল, ফৌজের পক্ষে সব-চেয়ে দরকারি হচ্ছে, রণহস্তীরা। কারণ শত্রুসৈন্য ধ্বংস হয় তাদের দ্বারাই।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে থাকত একখানা করে ঢাল ও দুটি করে বল্লম। পদাতিকদের প্রধান অস্ত্র ছিল চওড়া ফলকওয়ালা তরবারি এবং অতিরিক্ত অস্ত্ররূপে তারা সঙ্গে নিত শূল বা ধনুক-বাণ। আমরা এখন যে-ভাবে বাণ ছুঁড়ি, তারা সে ভাবে ছুঁড়ত না। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়্যান বলেন, 'ভারতীয় সৈনিকরা ধনুকের এক প্রান্ত মাটির উপরে রেখে, বাঁ পায়ের চাপ দিয়ে এমন ভয়ানক জোরে বাণ ত্যাগ করত যে, শত্রুদের ঢাল ও লৌহবর্ম পর্যন্ত কোন কাজে লাগত না!' বোঝা যাচ্ছে, সেকালের ধনুক হতো আকারে রীতিমত বৃহৎ!

এতক্ষণে প্রাচীন ভারতীয় ফৌজ সম্বন্ধে পাঠকরা নিশ্চয় অল্পবিস্তর ধারণা করতে পেরেছেন। সমুদ্রগুপ্ত এই ধরনের বাহিনী নিয়েই চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষের দিকে দিকে উড়িয়েছিলেন তাঁর রক্তাক্ত বিজয়-পতাকা! তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু, প্রচণ্ড শক্তিমন্ত্রের দ্বারা করতেন বিষ্ণুর উপাসনা! একালের গোঁড়া বৈষ্ণবেরা নিরামিষ খায় জীবহত্যার ভয়ে। এ হচ্ছে কেবল তাদের ভীরুতা, শক্তিহীনতা ও কাপুরুষতা লুকোবার বাজে ওজর! কারণ বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বীর প্রধান উপাস্য যিনি, সেই বিষ্ণু কেবল হাতে পদ্ম নিয়ে কমল-বিলাসীরূপে পরিচিত নন, অধর্মের কবল থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে রক্তপাতেও তাঁর যে কিছুমাত্র আপত্তি নেই, ভয়াবহ গদা ও শাণিত সুদর্শন-চক্র ধারণ করে সেই সত্যই তিনি প্রকাশ করতে চান!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হিন্দু ভারত ঐক্য-বাঁধনে যুক্ত,
জয় মহারাজ! জয় সমুদ্রগুপ্ত!

তিন বছরে ভারতের তিন হাজার মাইলব্যাপী ভূভাগের উপরে নিজের জয়পতাকা উড়িয়ে দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত আবার ফিরে এলেন মগধ-রাজ্যে। তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় বীর এমন অসাধ্য সাধন করতে পারেন নি।

এ-যুগের কাছে সমুদ্রগুপ্তের এই দিগ্বিজয়-কাহিনী হয়তো খুব অসাধারণ বলে মনে হবে না। আধুনিক যুদ্ধনায়করা সুনির্মিত রাস্তা, রেলপথ, মটর-যান, বাষ্পীয় পোত ও উড়ো-জাহাজ প্রভৃতির প্রসাদে তিনি হাজার মাইলকে হয়তো বেশি গ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু সেকালে এ-সবের কিছুই ছিল না। নিরন্ধ্র অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বত, প্রশস্ত নদ-নদী পার হয়ে বিপুল বাহিনী নিয়ে পদে পদে বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটাছুটি করা তখনকার দিনে যে কি অসম্ভব ব্যাপার ছিল, আজকের দিনে আমরা তা ধারণাও করতে পারব না।

সমুদ্রগুপ্ত বাধা পেয়েছেন বহুবার, কিন্তু কোথাও তিনি পরাজিত হয়েছেন বা পলায়ন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আর কোন দিগ্বিজয়ীর সম্বন্ধেই বোধ হয় এ-কথা বলা যায় না। (আগেই বলেছি, আলেকজাণ্ডারকেও নন্দ-রাজার ভয়ে ভারত-জয়-কার্য অসমাপ্ত রেখে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতে হয়েছিল।) এবং এটাই হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তের অতুলনীয় যুদ্ধ-প্রতিভার প্রধান প্রমাণ।

তাঁকে যে অসংখ্য যুদ্ধ জয় করতে হয়েছিল, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে-সব যুদ্ধের কোন ইতিহাসই

আর পাবার উপায় নেই। তবে এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কবি হরি সেন (ষেণ ?) বহু পরাজিত রাজার নাম করেছেন, আমরাও এখানে তাঁদের উল্লেখ করতে পারি।

আর্যাবর্তের বা উত্তর-ভারতের অহিছত্রের অধিপতি অচ্যুত (মহাভারতে-উক্ত দ্রুপদ-রাজা এই অহিছত্রে রাজত্ব করতেন, সম্প্রতি এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে), মথুরার রাজা নাগ সেন, পদ্মাবতীর (সিন্ধিয়া রাজ্যের আধুনিক নারওয়ার শহরের কাছে) রাজা গণপতি নাগ এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, নন্দী, বলবর্মা ও চন্দ্রবর্মা প্রভৃতি।

কথিত আছে, রাজা প্রবর সেনের পক্ষ অবলম্বন করে মথুরা পদ্মাবতী ও অহিছত্রের রাজারা এলাহাবাদের কাছে একসঙ্গে সমুদ্র-গুপ্তকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। এতগুলি রাজার বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়ে সমুদ্রগুপ্ত জয়মাল্য অর্জন করেছিলেন, এও তাঁর সাহস ও যুদ্ধ-প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

উপরে সর্বশেষে যে চন্দ্রবর্মার নাম করা হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। তিনি উত্তর-ভারতের এক অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। রাজপুতানার মরু-প্রদেশে পুষ্করণা নামক স্থানে তিনি রাজত্ব করতেন। দিল্লীর লৌহ স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপি পড়ে জানা গিয়েছে, সমুদ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের কিছু আগেই তিনি বাংলা থেকে বাহ্লিক দেশ পর্যন্ত—অর্থাৎ সমস্ত আর্যাবর্ত নিজের দখলে এনেছিলেন। কিন্তু এত বড় শক্তিশালী রাজাকেও সমুদ্রগুপ্তের সামনে পরাজয় স্বীকার ও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

উত্তরাপথ দখল করবার পর সমুদ্রগুপ্ত অগ্রসর হলেন দক্ষিণাপথে। এদিকে সমুদ্রগুপ্তের কাছে যাঁরা হেরে গিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম : ১। দক্ষিণ-কোশলের রাজা মহেন্দ্র, ২। মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ, ৩। কৌরলদেশের রাজা মণ্টরাজ, ৪। কোট্টুর ও পিষ্টপুরের (আধুনিক পিট্টপুরম) রাজা স্বামিদত্ত, ৫। এরণ্ডপল্লের

রাজা দমন, ৬। কাঞ্চীর রাজা বিষ্ণু গোপ, ৭। অবমুক্তের রাজা নীলরাজ, ৮। বেঙ্গীনগরের রাজা হস্তিবর্মা, ৯। পলক্কের (সম্ভবত নেলোর জেলায়) রাজা উগ্রসেন, ১০। দেবরাষ্ট্রের (আধুনিক মহারাষ্ট্রের) রাজা কুবের, ১১। কুস্থলপুরের (খন্দেশের) রাজা ধনঞ্জয় প্রভৃতি।

সমুদ্রগুপ্তের কাছে মাথা নত করে কর দিত এই সব জাতি বা রাজ্যঃ—১। সমতট (যা দক্ষিণ থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত), ২। ডবাক (বোধ হয় ঢাকার পূর্ব-নাম), ৩। কামরূপ, ৪। নেপাল, ৫। কর্তৃপুর (আধুনিক কুমায়ুন ও গঢ়োয়াল), ৬। আর্জুনায়ন, ৭। যৌধেয়, ৮। মদ্রক (পাঞ্জাব), ৯। আভীর, ১০। সনকানীক (মালব), ১১। কাক, ১২। খরপরিক।

তখনকার ভারতে যে-সব রাজা সবচেয়ে বিখ্যাত ও পরাক্রমশালী ছিলেন, সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে নিশ্চয়ই কেবলমাত্র তাঁদেরই নাম স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া তাঁর দিগ্বিজয়ের নেশার মধ্যে যে আরো কত রাজার প্রাণ ও রাজ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সে হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

শত শত রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভারে ভারে এসে মগধের রাজ-ভাণ্ডারকে করে তুললে যক্ষপতি কুবেরের রত্নভাণ্ডারের মতো। জনবলে, অর্থবলে, ও অপূর্ব খ্যাতিতে মগধের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, ভারতবর্ষে এমন রাজ্য আর দ্বিতীয় রইল না। প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের তিরোধানের পরে মহানগর পাটলিপুত্র কেবল পূর্বগৌরব থেকেই বঞ্চিত হয় নি, তার জীবনীশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছিল ক্রমশ। সমুদ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্য আবার তাকে করে তুললে নবযৌবনে বলীয়ান, বিচিত্র মহিমায় মহিয়ান।

ভারতের সীমান্তে ও আশপাশের রাজ্যাধিকারীরা সমুদ্রগুপ্তের তরবারির সঙ্গে পরিচিত না হয়েও সসম্ভ্রমে উপলব্ধি করলেন যে, বহুকাল পরে হিন্দুস্থানে আবার এমন এক বৃহৎ জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েছে, যাকে আর মাথা নামিয়ে স্বীকার না করে উপায় নেই। এঁর

সঙ্গে শত্রুতা করলে মৃত্যু অনিবার্য, মিত্রতা রাখতে পারা গর্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়। গ্রীক, পার্সী ও অন্যান্য জাতীয় বৈদেশিক দস্যুরা দুর্বলতার সুযোগ পেলেই ভারতকে লুণ্ঠন করবার জন্যে ছুটে আসত সাগ্রহে, তারা এখন আর আর্যাবর্তের দিকে ফিরে তাকাতেও ভরসা করলে না। নিরাপদ হবার জন্যে কাবুলের কুষাণ রাজা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

এই সময়ে (৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি) সুদূর সিংহল থেকে দুজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এলেন বুদ্ধ-গয়ায় তীর্থ করতে। সমুদ্রগুপ্তের উৎসাহে নবজাগ্রত হিন্দুত্বের প্রাথমিক উত্তেজনায় মগধের প্রজারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উচিত মতো আদর করে নি, সম্মান দেখায় নি। সন্ন্যাসীরা নানা অসুবিধা ভোগ করে দেশে ফিরে গিয়ে সিংহলের রাজা শ্রীমেঘবর্ণের কাছে সব কথা জানালেন। মেঘবর্ণ তখনি সমুদ্রগুপ্তের কাছে বহুমূল্য উপহার পাঠিয়ে, সিংহলী বৌদ্ধদের জন্যে বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

বলেছি, হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নূতন করে জাগিয়েতোলাই ছিল সমুদ্রগুপ্তের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তিনি নিজেও ছিলেন বিষ্ণুর পূজক। কিন্তু তাঁরও কয়েক শতাব্দী আগে শেষ মৌর্য রাজাকে হত্যা করে সেনাপতি পুষ্যমিত্র যেমন মগধের সিংহাসনে বসে হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অগুন্তি বৌদ্ধ মঠ-মন্দির ভেঙে হাজার হাজার বৌদ্ধকে তরবারির মুখে সমর্পণ করেছিলেন, সমুদ্রগুপ্ত তেমন হিংসুক হিন্দু ছিলেন না। তাঁর মন ছিল পরম উদার, তাই বৌদ্ধ না হয়েও বৌদ্ধ বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। সুতরাং তিনি সানন্দেই বুদ্ধগয়ার নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সিংহলপতির কাছে নিজের সম্মতি জানালেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রোম ও চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু তিনি পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিজ্ঞার

কথা ভোলেন নি। দিগ্বিজয়ের কর্তব্য সমাপ্ত ; কিন্তু এখনো অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হয় নি।

বহু শতাব্দী আগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের জন্যে ভারত থেকে অশ্বমেধের প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কারণ ঐ দুই ধর্মে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। তারপর পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অশ্বমেধের বৈদিক অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সেও পাঁচ শতাব্দীরও বেশি আগেকার কথা।

এরই মধ্যে কুষাণ-সম্রাটদের যুগে বৌদ্ধধর্ম আবার মাথা তোলবার অবসর পায়। তারপর ভারতে আসে অন্ধ-যুগ এবং আর্যাবর্ত হয়ে যায় খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। সে-সময়ে হিন্দু রাজার অভাব ছিল না বটে—কিন্তু তাঁদের কারুর অশ্বমেধের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবার শক্তি ও সাহস ছিল না। কারণ যিনি মহাশক্তিমান সার্বভৌম সম্রাট নন, তাঁর পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের দুরাশা করা বামনের চাঁদ ধরবার দুশ্চেষ্টা করার মতো হাস্যকর।

অশ্বমেধের বিধি হচ্ছে এই ঃ—একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত ঘোড়াকে মন্ত্রপূত করে তার মাথায় জয়পত্র বেঁধে নানা দেশে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হতো—তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত বহু সশস্ত্র রক্ষক। রাজা বা তাঁর প্রতিনিধিও সঙ্গে যেতেন। ঘোড়া কোন বিদেশী রাজার রাজ্যে ঢুকলে তাঁকে হয় যুদ্ধ করতে নয় বশ মানতে হতো। এক বৎসর ধরে ঘোড়ার সঙ্গে এই যাত্রা চলত। যে-যে দেশের ভিতর দিয়ে ঘোড়া অগ্রসর হতো তার প্রত্যেকটিরই রাজা যদি অধীনতা স্বীকার করতেন, তাহলে ঘোড়ার মালিক দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বশীভূত রাজাদের সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসতেন। কোন স্থানে পরাজিত হলে লোকে তাঁকে উপহাস করত, সার্বভৌম সম্রাট বলে মানত না এবং তিনিও যজ্ঞাধিকারী হতে পারতেন না। সফল হয়ে ফিরে এলে পর চৈত্র-পূর্ণিমায় খুব ঘটা করে যজ্ঞ আরম্ভ হতো। ঘোড়াকে দেওয়া হতো বলি। ঘোড়ার বুকের চর্বিতে হতো যজ্ঞাগ্নির সংস্কার এবং তার দেহের

মাংস পুড়িয়ে করা হতো হোম। যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠাতা উপবাস করে থাকতেন এবং রাত্রে তাঁকে সস্ত্রীক শয্যাহীন মাটির উপরে শুয়ে ঘুমোতে হতো।

নির্বিঘ্নে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে সমুদ্রগুপ্ত প্রমাণিত করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন ভারতের একছত্র সম্রাট, এখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন এমন আর কেউ নেই।

কথিত আছে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতব্যাপী গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে মহোৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং মহারানী দত্তা দেবীকে নিয়ে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত যে যজ্ঞের প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণরা দান পেয়েছিল কোটি কোটি মুদ্রা।

দক্ষিণা দেবার জন্যে, সমুদ্রগুপ্ত নতুন রকমের স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করিয়েছিলেন। তার এক পিঠে আছে যজ্ঞযূপে বাঁধা বলির ঘোড়ার মূর্তি, অন্য পিঠে সমুদ্রগুপ্তের মহারানীর মূর্তি। এই দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার একটি নমুনা কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। সমুদ্রগুপ্তের হুকুমে গড়া তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়ার একটি পাথরের মূর্তিও হিমালয়ের তলায় বনের ভিতরে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি আছে লক্ষ্মৌ-এর যাদুঘরে।

কবি হরি সেন শিলাপটে সমুদ্রগুপ্তের যে সমুজ্জ্বল শব্দচিত্র এঁকে গেছেন তাতে দেখি যে, তিনি একাধারে দিগ্বিজয়ী সম্রাট, গীতবাদ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, এবং কাব্যরাজ্যেও শ্রেষ্ঠ কবির সমকক্ষ।

দিগ্বিজয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরও অধিকাংশ দিগ্বিজয়ীর রক্ত নেশা পরিতৃপ্ত হয় না এবং অনেক দিগ্বিজয়ীই অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেছেন রক্তাক্ত তরবারি হাতে করেই। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত এ-শ্রেণীর যুদ্ধপাগল বীর ছিলেন না। যুদ্ধপর্ব যখন সমাপ্ত হলো, তখন তিনি একাগ্রচিত্তে নানাদিকে নানা সুব্যবস্থা করে নিজের সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন। এত যত্নে প্রজাপালন

করতে লাগলেন যে, তাঁর রাজ্য হয়ে উঠল রাম-রাজ্যের মতো। তাঁর শক্তি ও বীরত্ব দেখে যারা মনে মনে তাঁকে মানত না তারাও ভয়ে হয়ে পড়েছিল বিষহারা নতফণা সর্পের মতো। কঠিন ও দৃঢ় হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করে আছে দেখে দস্যু, চোর ও অসাধুদের দল গেল ভেঙে। এই সব কারণে প্রজাদের সুখের সীমা ছিল না—তারা যাপন করত শান্তিময় জীবন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই চৈনিক ভ্রমণকারী ফা-হিয়েন গুপ্ত-সাম্রাজ্যে এসে দেখেছেন, এখানে গুরুতর অপরাধের সংখ্যা এত কম যে, প্রাণদণ্ড দেবার কথা লোকের মনেই পড়ত না এবং রাজ্যের কোথাও ছিল না দস্যুতার উপদ্রব।

কিন্তু কেবল রাজনীতি নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন না। কেবল গীত-বাদ্য-কাব্যই তাঁর অবলম্বন ছিল না। হরিসেন বলেন, বিদ্বজ্জন-সমাজের মধ্যে থাকতে পারলে সমুদ্রগুপ্ত অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। শাস্ত্রালোচনার সুযোগ তিনি ছাড়তেন না।

সব দিক দিয়ে হিন্দুর লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে সমুদ্রগুপ্ত প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। গ্রীক ও পার্সীদের প্রাদুর্ভাবের জন্যে ভারতের শিল্পে ও সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, সমুদ্রগুপ্ত দিলেন সেই প্রভাব লুপ্ত করে। কবি, নাট্যকার ও শিল্পীদের ঘুমন্ত দৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলে তাদের সামনে দেশের দর্পণ ধরে তিনি বললেন—'একবার নিজেদের মুখের পানে তাকিয়ে দেখ। তোমরা হচ্ছ সুন্দরের বংশধর, নিজেরাও পরমসুন্দর!' সমুদ্রগুপ্তেরই সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অন্ধ-যুগের অত্যাচারিত, জীবন্মৃত ভারত আবার শক্তিধর হয়ে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে লাভ করলে ধ্রুবদৃষ্টি—দেখতে পেলে আপন আত্মার ঐশ্বর্য। পিতৃদত্ত শিক্ষার গুণে বিখ্যাত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা কাব্যে প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য মহাভারতের যে বিচিত্র মানস-প্রতিমা সম্পূর্ণ করে বিশ্বের বিস্মিত চোখের সামনে তুলে ধরেন, তার অপূর্ব কাঠামো গড়ে গিয়েছিলেন সমুদ্রগুপ্তই স্বহস্তে। সেই বহুবাহুধারিণী দেবীমূর্তির

হাতে কেবল শত্রুঞ্জয় নানা প্রহরণই ছিল না, ছিল বেদ, উপনিষদ, নব নব পুরাণ; ছিল দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা; ছিল কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য; ছিল গীত-বাদ্য-নৃত্য ও অভিনয়ের প্রতীক; ছিল চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য প্রভৃতি বিবিধ ললিতকলার নিদর্শন; এবং সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ ধন-ধান্যের পসরা! রামায়ণ-মহাভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ কবিদের কল্পনা-কুহেলিকায় রহস্যময় বলে মনে হয়; তার ভিতর থেকে নিশ্চিতভাবে কিছুই আবিষ্কার করবার উপায় নেই। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের ধ্যানের মন্ত্র হিন্দু-ভারতের যে মহিমময় মূর্তিকে সাকার করলে, ঐতিহাসিক কালের আগে বা পরে তার সঙ্গে তুলনীয় আর কিছুই দেখা যায় না। পুত্র বিক্রমাদিত্য ও পৌত্র কুমারগুপ্ত উত্তর-সাধক হয়ে সমুদ্রগুপ্তেরই সাধনাকে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁরা ছিলেন সমুদ্রগুপ্তেরই প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসারী।

সমুদ্রগুপ্ত অক্ষরে অক্ষরে পিতৃসত্য পালন করলেন। দিগ্বিজয়ের দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভারতকে সংযুক্ত করে স্থাপন করলেন এক অখণ্ড ও বিরাট সাম্রাজ্য এবং বৈদিক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সার্বভৌম সম্রাট হয়ে আর্যাবর্তে ফিরিয়ে আনলেন আবার হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি—প্রাচীন হিন্দুরা হলো আবার নবীন যুবকের মতো।

এই সফল সাধনার আশ্চর্য পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় ডুবে যাবে আমাদের মতো ক্ষুদ্র গল্প-লিখিয়ের কাল্পনিক কাহিনীর সূত্র—মহাসাগরে সাঁতারুর সৃষ্ট অস্থায়ী জলের রেখার মতো। এর পর গালগল্প চলে না, তাই সমুদ্রগুপ্তের নিপুণ হাতের বীণাবাদন শোনবার জন্যে তাঁর রানী দত্তাদেবী আর সখি পদ্মাবতীকে আর আমন্ত্রণ করতে পারলুম না।

কঙ্কাল-সারথি

উঃ—ম্যালেরিয়ার মতন ছ্যাঁচড়া অসুখ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? উঁহু।

এই ত্থাখনা, শখ করে সেদিন ঢাকুরিয়ার 'লেক' দেখতে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার একটু আগে। হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে আমার জ্বর এল।

সেকি যে-সে জ্বর, যে-সে কাঁপুনি? না পারি দাঁড়াতে না পারি বসতে, একেবারে ঘাসের উপর পড়লুম শুয়ে। কী শীত রে বাপ! পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে, কাঁপতে কাঁপতে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে রইলুম।

সেই ভাবে কতক্ষণ ছিলুম, ভগবান জানেন। তবে একবার চাদরের ভিতর থেকে জুল-জুল করে চোখ মেলে উঁকি মেরে দেখলুম চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মেলা বসেছে, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই।

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কোথায় বাগবাজারে আমার বাড়ি, আর কোথায় পড়ে আছি আমি একলা, গুণ্ডায় গলায় ছুরি বসাতে পারে, সাপে কামড়াতে পারে, বিনা চিকিৎসায় প্রাণপাখি ফুড়ুক করে পালিয়ে যেতে পারে! বাড়ির লোক এতক্ষণে হয়তো ভেবেই সারা হচ্ছে!

আর তো এখানে থাকা চলে না! যেমন করেই হোক আমাকে আজ বাড়ি যেতে হবে!

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালুম। গায়ের ভিতর দিয়ে তখনো যেন আগুনের ঝলক ছুটছে, চোখের সামনে দিয়ে যেন রাশি রাশি সর্ষে ফুল নাচতে নাচতে একবার আঁধার-সাগরে ডুবে যাচ্ছে, আর একবার ভেসে ভেসে উঠছে। প্রতিবার পা ফেলি আর মনে হয়, এই বুঝি আমি দড়াম করে পপাতধরণীতলে হলুম। তবু থামলুম না, মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে চললুম।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে! সেই রাত্রে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, পৃথিবী কত-বেশি স্তব্ধ হতে পারে! শহরের হট্টগোলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এ স্তব্ধতাও সহ্য করা অসম্ভব! একটা ব্যাঙ, কি ঝিঁঝিঁ পোকা, কি একটা পাহারাওয়ালার নাক পর্যন্ত ডাকছে না, গাছের পাতায় বাতাসের একটু নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না! সারি সারি কোম্পানির আলোর থামগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চক্ষে যেন থমথমে অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করছে! তিমির-তুলির প্রলেপ-মাখানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির পর বাড়ি দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারাও যেন প্রেতপুরীর মতন নিস্তব্ধ—তাদের ভিতর থেকে একটা ঘুম-ভাঙা খোকার কান্নার আওয়াজ পর্যন্ত জেগে উঠছে না। কে যেন আজ নিচুটীর মন্ত্র পড়ে সমস্ত জগৎকে বোবা করে দিয়ে গেছে!

জ্বরের ঘোরে চলেছি তো চলেছিই—এই নিঃশব্দ পল্লী ছেড়ে শহরের শব্দের রাজ্যে গিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণ যেন আই-ঢাই করতে লাগল, তবু এ পথ যেন আজও শেষ হবে না, কালও শেষ হবে না—আমাকে যেন কোন অভিশপ্ত আত্মার মতন চলতে হবে অনন্তকাল ধরে! এক বেচারা ইহুদীর গল্প পড়েছিলুম। কার শাপে তাকে নাকি অনন্তকাল ধরে সারা বিশ্বে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছিল। আমারও তাই হলো নাকি?—

মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে ভাবলুম, দূর ছাই, এ-সব কি উদ্ভট কথা ভাবছি? জ্বরে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মাঝে মাঝে এক-একটা মাঠ—যেন এক-একটা অন্ধকারের মায়া সরোবর! সেখান দিয়ে যেন অন্ধকারের ঢেউ বইছে, অন্ধকারের স্রোত ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করবার জন্যে! অন্ধকারের তরঙ্গের ভিতরে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে যেন বড় বড় দৈত্য-দানবের মতো—পথিকের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবার জন্যে তারা ওঁৎ পেতে প্রস্তুত হয়ে আছে! কান্না-ভরা কন্‌কনে বাতাস এসে চুপিচুপি যেন আমার কানে কানে বলে যাচ্ছে—ওহে নিঝুম রাতের অজানা মানুষ! এ মৃত্যুপুরীর ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? আমার কথা শোনো, ভূত-প্রেতেরা একে একে জেগে উঠছে, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, যাও গো!···

আরো খানিক অগ্রসর হয়ে মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত শব্দ এসে আমার দুই পায়ের দুই জুতোর ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে! প্রত্যেকবার পা ফেলি আর সেই শব্দগুলো জুতোর ভিতর থেকে চল্‌কে উঠে রাজ-পথের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে আমাকে চমকে চমকে তোলে! শব্দ শুনতে চাই, নিজের পায়ের শব্দ পাচ্ছি, কিন্তু কেন জানি না, সে শব্দ শুনে শুনে মন আমার খুশি হবে কি, আরো বেশি নেতিয়ে পড়তে লাগল!—সে যেন রাজপথে ঘুমন্ত কোন অশরীরী প্রেতাত্মার চ.ৎকার, আমার পদাঘাতে সে যন্ত্রণায় গজরে গজরে উঠছে!

আঃ! এতক্ষণ পরে রসা রোডের মোড়ে এসে পড়লুম। আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ট্রামওয়ের একটা লোহার থামে ঠ্যাসান্ দিয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলুম।

এখানটাও তেমনি নির্জন ও তেমনি নিস্তব্ধ হলেও আমার মন যেন অনেকটা আরাম পেল। এই তো ট্রামের রাস্তা! এই পথ ধরে সিধে গেলেই—যত মাইল দূরেই থাক—আমাদের পাড়া বাগবাজার

যাওয়া যাবেই যাবে! খানিক দূর এগুতে পারলেই লোকজনের সাড়া পাব নিশ্চয়, আর ট্রাম বাস বন্ধ হলেও ট্যাক্সি মেলাওতো অসম্ভব নয়।

তখন জ্বরে আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে, কান করছে ভোঁ ভোঁ, আর মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে! বার বার ইচ্ছে হতে লাগল পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে, কেবল বাপ-মায়ের বিষণ্ণ মুখের কথা ভেবেই মনের সে ইচ্ছা দমন করলুম, অনেক কষ্টে। নিজে নিজেই বললুম,—মন, তুমি শান্ত হও! এই পথের শেষেই আছে তোমার বাড়ি, তোমার আত্মীয়-স্বজন, তোমার নরম তুলতুলে বিছানা! কোন রকমে চক্ষু মুদে এই পথটুকু পার হতে পারলেই—ব্যাস, সকল কষ্ট সকল ভাবনার অবসান!

হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ জেগে উঠে চারিদিকের নিস্তব্ধতার মুখে যেন ভাষা দিলে! ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ করে একটা বাজ-ডাকার মতন শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে—তারপরেই শুনলুম ভেঁপুর আওয়াজ—ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্!

ট্যাক্সি, না বাস?

আহ্লাদে চাঙ্গা আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তারপরেই দেখা গেল, নীচে দুটো আর উপরে একটা আলো। তিনটে আলো দেখেই বুঝলুম ট্যাক্সি নয়, বাস আসছে। ...... তাহলে জ্বরের ধমকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাস যখন চলছে তখন রাত খুব বেশি হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য, এরি-মধ্যে এ-অঞ্চলটা এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে? বাবা, আমার কলকাতার গোলমাল বেঁচে থাক, এ অঞ্চলে আবার ভদ্রলোক বাস করে?

কিন্তু বাসের আলো অত বেশি জ্বলছে কেন, সামনে সারা পথে সে যেন আগুনের ঢেউ বইয়ে ছুটে আসছে। আর এই নিরালা পথে অত ভেঁপু বাজাবারই বা দরকার কি, এ-অঞ্চলের সন্ধ্যের-পরেই-ঘুমকাতুরে লোকগুলোর কানে যে তালা ধরে যাবে!

উর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ধুলোয় ধুলোয় পথ অন্ধকার করে একখানা রাঙা-টক্‌টকে মস্ত বড় বাস আমার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—"ধর্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার !"

আমি তাড়াতাড়ি বাসে উঠে একখানা গদীমোড়া আসনের উপর গিয়ে ধুপ্‌ করে বসে পড়লুম। হোক শ্যামবাজারের বাস্‌, এই স্তব্ধ মড়ার মুল্লুক থেকে এখন তো সরে পড়ি, শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার পায়ে হেঁটে যেতে এমন বিশেষ দেরি লাগবে না !

কিন্তু কেন জানি না, বাসের ভিতরে ঢুকেই আমার বোধ হল আমি যেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক অচেনা জগতের ভিতরে প্রবেশ করলুম !

বাস ছুটছে, তার ভেঁপু বাজছে। এত বেগে বাস ছুটছে, তার জানালাগুলো সব খোলা রয়েছে, অথচ বাহির থেকে বাতাসের একটুখানি ঝলক পর্যন্ত আমার গায়ে লাগছে না। ভারি অবাক হয়ে গেলুম। আমার জ্বর কি এত বেশি উঠেছে যে দেহের অনুভব করবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই ?

পথ তেমনি নির্জন আর নিঃসাড়। কিন্তু বাতাসও কি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে ? আমার খালি মনে হতে লাগল, দমবন্ধ হয়ে সারা পৃথিবী আজ মারা পড়েছে—তার কোথাও আর জীবনের লক্ষণ নেই। বেঁচে আছি খালি আমি ও এই বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টার।

আমরা তিনজন ছাড়া বাসের ভিতরেও কোন আরোহী ছিল না। থাকবেই বা কেন ? এত রাতে কার ঘাড়ে ভূত চাপবে যে বাসে চড়ে বেড়াতে বেরুবে !

বাসের ভেঁপু বাজছে আর বাজছে আর বাজছে ! কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল ! কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বিরক্ত স্বরে বললুম, "ড্রাইভারকে বারণ করে দাও। পথে লোকও নেই,—তবু এত 'হর্ণ' বাজছে কেন ?"

লোকটা শিখ। মস্ত-বড় লম্বা দেহ, মস্ত-বড় দাড়ি। সে কালা আর বোবার মতো আমার পানে তাকিয়ে রইল!

আবার বললুম, "শুনচ? 'হর্ণ' দিতে বারণ কর।"

সে তবু জবাব দিলে না, ড্রাইভারকে হর্ণ থামাতেও বললে না। লোকটা সত্যি-সত্যিই কালা ও বোবা নাকি? কিন্তু না, তাই বা হবে কি করে? এই খানিক আগেই তো সে "ধর্মতলা, ওয়েলেসলি, শ্যামবাজার" বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করছিল!

সে বোধ হয় আমার কথার জবাব দিতে চায় না। এরা কি ভেবেছে যে এদের ভেঁপুর আওয়াজে সারা শহরের ঘুম ভেঙে যাবে, আর তাহলেই সবাই বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে বাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে বসবে?

কিন্তু শহর জাগবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করলে না। পথের আশেপাশে লেড়ি কুকুরগুলো আরাম করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু এই বাসের সাড়া পেয়েই তারা তাড়াতাড়ি উঠে, ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে পালাতে লাগল—মহা-ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে। আজকে বাইরের জীবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কেবল ঐ কুকুরগুলোর কাছ থেকে, কিন্তু তারাও দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে!

কুকুরগুলো কেন আমাদের বাস দেখে পালাচ্ছে? মনের ভিতর কেবল এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

কণ্ডাক্টার কেন আমার কথার জবাব দিচ্ছে না—কেন? কেন? কেন?

ড্রাইভার কেন ক্রমাগত ভেঁপু বাজাচ্ছে?—কেন? কেন? কেন?

কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরে বললুম, "তোমার ভাড়ার পয়সা নাও।"

সে মস্ত একখানা কালো হাত বাড়ালে। ভাড়া দিয়ে টিকিট নেবার সময়ে আমার হাতে তার হাতের ছোঁয়া লাগল—উঃ, অমনি মনে

হলো কে যেন একখানা তীক্ষ্ণ বরফের ছুরি দিয়ে আমার হাতে খ্যাঁচ করে খোঁচা মারলে! জ্যান্ত মানুষের হাত এমন ঠাণ্ডা-কনকনে হয়!

আশ্চর্য হয়ে তার মুখের পানে তাকালুম

আশ্চর্য হয়ে তার মুখের পানে তাকালুম। তার লম্বা চুল আর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ভরা মুখখানা বাসি-মড়ার মতো স্থির। তার চোখেও পলক পড়ছে না। তার চোখ যেন পাথরে গড়া।

আমার বুকটা গুড়গুড় করতে লাগল। আজকের শহরের এই নির্জনতা, পৃথিবীর এই নিঃশব্দতা, বাতাসের এই অভাব, ভাড়াটে বাসের এই ভেঁপুর আওয়াজ, কণ্ডাক্টারের এই উদাসীন মূর্তি সমস্তই যেন রহস্যময়, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক!

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ির বাইরে পা দিয়েছি!

যতবার ফিরে তাকাই, ততবারই কণ্ডাক্টারের সেই মড়ার মতো স্থির মুখ আর পলক-হারা পাথুরে দৃষ্টি চোখে পড়ে! কেমন একটা অমানুষিক ভাবে আমার মনটা ছেয়ে গেল—আর সহ্য করতে পারলুম না—সামনের বেঞ্চের উপরে, দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে চোখ মুদে আমি চুপ করে বসে রইলুম। ভাবলুম, শ্যামবাজারে পৌঁছবার আগে আর মাথা তুলে চাইব না!

কিন্তু মাথা তুলতে হলো—আবার চোখ খুলতেও হলো।

আধ ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে, গাড়িও না থেমে ক্রমাগত ছুটছে, তবু এখনো শ্যামবাজার এল না কেন?

মুখ তুলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্যামবাজার তো অনেক দূরের কথা, গাড়ি এখনো ভবানী-পুরেই আসে নি! অথচ গাড়ি এত বেগে ছুটছে, যে, পথের দু-পাশের বাড়িগুলো তীরের মতন পিছনে সরে সরে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব?

হতভম্বের মতন মুখ ফিরিয়েই দেখি, গাড়ির ভিতরে দশবারো জন লোক বসে রয়েছে! নিজের চোখকেও আমি আর বিশ্বাস করতে পারলুম না!

আমি হলপ করে বলতে পারি, এতক্ষণের ভিতরে গাড়ি একবারও থামে নি, তবু কোত্থেকে এরা এল, কখন এরা গাড়িতে উঠল?

একে একে সকলকার মুখের পানেই তাকিয়ে দেখলুম, সব মুখই মড়ার মতন স্থির, নির্বিকার, সব চোখের পাথুরে দৃষ্টিই আড়ষ্ট হয়ে আছে! কে যেন শ্মশান থেকে কয়েকটা মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে বেঞ্চের উপরে সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে!

তাদের ভিতরে বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, সাহেব আছে। কিন্তু তারা সবাই চেয়ে আছে আমার দিকেই। সে চাউনিতে কোন ভাবের আমেজ নেই, সে চাউনি যেন চাউনিই নয়—অথচ সে চাউনি দেখলেই গা ছমছম করে, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তাদের চাউনি যেন চোখের ভিতর দিয়ে আসছে না,—আসছে আলোকের ওপার থেকে, অন্ধকারের আত্মার ভিতর থেকে, যে দেশে জ্যান্ত মানুষ নেই, সেই দেশ থেকে! ভাবহীন অথচ ভয়ানক তাদের সেই চাউনি!

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, গাড়ির ঝাঁকুনিতেও তাদের কারুর দেহ একটুও নড়ছে না! গাড়ির ভিতরে বসেও তাদের দেহ

যেন গাড়িকে না ছুঁয়ে শূন্যে বিরাজ করছে! মনে হতে লাগল আমার অজ্ঞাতসারে যেমন হঠাৎ তারা গাড়ির ভিতরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তেমনি হঠাৎ তারা আবার হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, আমার অজান্তেই। যেন তারা ছায়ার কায়াহীন অনুচর —দেখা দেয়, ধরা দেয় না। তাদের দেখা যায়, ধরা যায় না।

আমার সভয় দৃষ্টি আবার পথের দিকে ফিরিয়ে নিলুম। গাড়ি তেমনি হেঁচকি-তোলা আওয়াজের মতন ভেঁপুর শব্দ করতে করতে তীরবেগে ছুটছে—কিন্তু তখনো ভবানীপুর আসে নি! আমি শ্যাম-বাজার না সোজা যমালয়ের দিকে চলেছি?

কি এক দুঃসহ অজানা টানে অস্থির হয়ে চোখ আবার গাড়ির ভিতরে ফেরালুম! গাড়িতে ইতিমধ্যে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠেছে—তারাও স্থির নেত্রে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে!

সমস্ত গাড়ির ভিতরে একটা বোঁটকা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে —যেন বাসি-মড়ার গন্ধ। হাসপাতালের মড়ার ঘরে গিয়ে আমি একবার এই রকম গন্ধই পেয়েছিলুম!

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে, বুকের কাছটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।—আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

আর থাকতে না পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "এই কণ্ডাক্টার গাড়ি বাঁধো!"

কণ্ডাক্টার কোন সাড়া দিলে না, গাড়ি থামাবারও চেষ্টা করলে না।

আবার বললুম, কিন্তু কোন ফল হলো না।

রেগে দাঁড়িয়ে উঠে কণ্ডাক্টারের দেহ ধরে আমি নাড়া দিতে গেলুম—কিন্তু তাকে ছুঁতেও পারলুম না! চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পারছি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারছি না, সে দেহ যেন হাওয়া দিয়ে তৈরি।

হঠাৎ গাড়ির সব লোক এক সঙ্গে অট্টহাস্য শুরু করে দিলে! সে অদ্ভুত বীভৎস হাসি আসছে যেন অনেক দূর থেকে, অনেক আকাশ-

ভেদ করে, অনেক সমুদ্র-পাহাড়-প্রান্তর পার হয়ে, অনেক নরকের অন্ধকারে ডুব দিয়ে—অথচ তার আওয়াজ এত স্পষ্ট যে, আমার কান ফেটে যাবার মতো হলো !

আমি পাগলের মতন চীৎকার করে বললুম, "গাড়ি থামাও, জলদি গাড়ি থামাও—এই—ড্রাইভার!"—গাড়ি-থামানো-ঘণ্টার দড়ি ধরে আমি ঘন ঘন নাড়তে থাকলুম !

ড্রাইভার এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালে—সে মুখে এক তিলও মাংস নেই, সে মুখ সাদা-ধবধবে হাড়ের মুখ—নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গর্ত, তু-ঠোঁটের জায়গায় তু-সারি দাঁত বেরিয়ে আছে।

এতক্ষণ তবে এই পোশাক-পরা কঙ্কালটাই গাড়ি চালিয়ে আসছে ?

গাড়ির ভিতরে অট্টহাসির আওয়াজ আরো বেড়ে উঠল !

আর সইতে পারলুম না—সেই ভীষণ অট্টহাসি শুনতে শুনতে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

জ্ঞান হলে দেখলুম, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চারপাশে বসে মা, বাবা, ভাই আর বোনেরা।

শুনলুম, আমি নাকি রসা রোডের ফুটপাতের উপরে জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে শুয়েছিলুম।

কালকের রাতের বিভীষিকার কথা সকলকে বললুম।

বাবা বললেন, "ও-সব বাজে কথা। জ্বরের ঝোঁকে লেকের ধার থেকে রসা রোড পর্যন্ত এসেই তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে। তারপর ঐ-সব খেয়াল দেখেছ।"

কিন্তু আমার মন বলতে লাগল—না, না, আমি যা দেখেছি তা খেয়াল নয়, খেয়াল নয় !

পলাতক চায়ের পেয়ালা

একটা তদন্ত সেরে মাণিকের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল জয়ন্ত। হঠাৎ রাস্তার ধারের একখানা বাড়ির একতলার জানলা থেকে আত্মপ্রকাশ করলে ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুর সুপরিচিত মুখখানি ও তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়ি।

—"হুম্! বলি ও জয়ন্ত! একবার এদিকে পদচালনা করবে কি? কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়ে গিয়েছি ভায়া! বাড়ির ভিতর এস।"

একতলার যে ঘরের ভিতরে তারা প্রবেশ করলে, বোধ হয় সেটা বৈঠকখানা। একটা গোল-টেবিলের উপরে রয়েছে চায়ের পেয়ালা এবং 'টোস্ট্' ও 'এগ-পোচ' প্রভৃতির পাত্র।

জয়ন্ত বললে, "ব্যাপার কি? এখানে বসে এত বেলায় প্রাতরাশ সারছেন যে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "এতক্ষণ ফুরসত হয়নি ভায়া! কিন্তু তোমরা জানোই তো, চা-টা না খেলে আমার বুদ্ধি খোলে না, তাই পাড়ার একটা দোকান থেকে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য আর পানীয় আনাতে বাধ্য হয়েছি! তোমাদের জন্যে আনাব নাকি?"

—"নিশ্চয়ই নয়! একদিনে দু-বার প্রাতরাশ আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।"

—"তাহলে তোমরা বসে বসে শোনো আর আমি খেতে খেতে বলি।"

জয়ন্ত ও মাণিক আসনগ্রহণ করলে পর সুন্দরবাবু বললেন, "গৌরচন্দ্রিকা না করে খুব সংক্ষেপেই ব্যাপারটা বলি শোনো। এসেছি এখানে একটা চুরির মামলায়, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে পিছনে অন্য কোন রহস্যও থাকতে পারে। এই বাড়িখানার মালিক হচ্ছেন

পরিতোষ রায়চৌধুরী। হরিপুরের জমিদার। বেশির ভাগ মফস্বলেই থাকেন, কাজের তাগিদে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। এবারে একখানা বাগান কেনবার জন্যে তাঁর কলকাতায় আবির্ভাব হয়েছিল। বাগানখানা আজই কেনবার কথা, তাই কাল তিনি ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকার নোট আনিয়ে নিজের শোবার ঘরের আলমারির ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন। সেই টাকা চুরি গিয়েছে।"

—"কেমন করে?"

—"তা কেউ জানে না।"

—"পরিতোষবাবু কি বলেন?"

—"তাঁর কিছুই বলবার শক্তি নেই। কারণ কাল রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

—"স্বাভাবিক মৃত্যু?"

—"হুম্, আমারও মনে জেগেছে এই জিজ্ঞাসা। কিন্তু লাসের কোথাও সন্দেহজনক কোন চিহ্নই নেই। পরিতোষবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক হচ্ছেন বিখ্যাত ডাক্তার এস, এন, সিংহ। তাঁর মতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুন পরিতোষবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি কিছুকাল থেকেই বুকের অসুখে ভুগছিলেন, কাল সন্ধ্যাতেও তিনি নাকি বুকের ভিতরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন।"

—"এ কথা কে আপনাকে বললে?"

—"মুরারিবাবু।"

—"তিনি কে?"

—"পরিতোষবাবুর প্রতিবেশী। তিনিও আগে ডাক্তারি করতেন, এখন ও-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। রাস্তার ওপারেই সামনের ঐ বাড়িখানায় তিনি থাকেন। সর্বশেষে তিনিই কাল জীবিত অবস্থায় পরিতোষবাবুকে দেখে গিয়েছেন।"

—"মৃতদেহের সৎকার হয়েছে?"

—"না। পরিতোষবাবু এবারে একলাই কলকাতায় এসেছেন।

হরিপুরে তাঁর পরিবারবর্গের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে, তাঁরা এখনো এসে পৌঁছন নি।"

—"আপনি সমস্যায় পড়েছেন বলছেন, কিন্তু আপনার সমস্যাটা কি?"

—"একই রাত্রে পরিতোষবাবুর মৃত্যু আর টাকা চুরি কি সন্দেহ-জনক নয়? অথচ মৃত্যুর জন্যে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই, কারণ এস, এন সিংহের মতো বিখ্যাত ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তা না হলে লাস আমি মর্গে পাঠাতে বাধ্য হতুম।"

—"আচ্ছা, চুরির কথাই হোক। আলমারিতে দশ হাজার টাকার নোট আছে, এ খবর আর কেউ জানত?"

—"সন্তোষবাবু জানতেন। তিনি পরিতোষবাবুর ম্যানেজার, এই বাড়িতেই থাকেন। টাকাটা তিনিই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছিলেন।"

—"মুরারিবাবু কি বলেন?"

—"টাকার কথা তিনি নাকি কিছুই জানতেন না।"

—এ বাড়িতে আর কে থাকে?"

—"দুজন দ্বারবান, দুজন বেয়ারা, একজন পাচক।"

—"রাত্রে পরিতোষবাবুর শয়নগৃহের দরজা কি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?"

—"না।"

—"মৃতদেহটা আমি একবার দেখতে পারি কি?"

—"অনায়াসে! চল।"

দুই

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে একটা আলমারি—টাকা ছিল তার ভিতরেই। একদিকে একখানা পালঙ্ক। রাস্তার ধারের জানলার সামনে একটি ছোট টেবিল ও একখানা চেয়ার। মেঝেতে কার্পেটের উপরে পাতা একটি ছোট বিছানা, মৃতদেহ ছিল তার উপরেই।
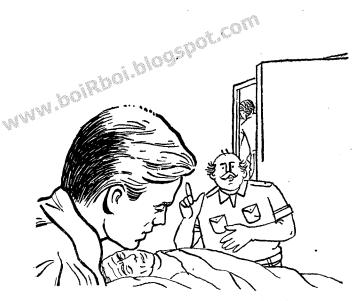
জয়ন্ত বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলে

পরিতোষবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা চেহারা। পরনে কেবল গেঞ্জী ও কাপড়। মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি যেন ঘুমোচ্ছেন!

জয়ন্ত বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলে। তারপর পকেট থেকে একখানা আতশী কাচ বার করে মৃতদেহের বাম হাতের বুড়ো আঙুলের উপরে রেখে কি দেখতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু, এই ক্ষত চিহ্নটা আপনি কি দেখেছেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ক্ষতচিহ্ন?"

—"হ্যাঁ। অত্যন্ত ছোট একটা ক্ষত, প্রায় অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে, বিশেষ ভাবে না দেখলে চোখেই পড়ে না।"

ভালো করে দেখে সুন্দরবাবু বললেন, "ধেৎ, এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

জয়ন্ত বললে, "পরিতোষবাবুর ম্যানেজার সন্তোষবাবু আর তাঁর প্রতিবেশী মুরারিবাবুকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

তাঁরা দুজনেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। দুজনেরই অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, বর্ণনা করবার মতো কিছুই নেই।

জয়ন্ত সুধোলে, "সন্তোষবাবু, পরিতোষবাবুর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে গিয়েছিল কেমন করে?"

সন্তোষবাবু বললেন, "কাল সকালে পেনসিল বাড়তে গিয়ে কর্তার হাত সামান্য একটু ছড়ে যায়। মাত্র দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল, কর্তা তা আমলেই আনেন নি।"

মুরারিবাবু বললেন, "এ বিষয়ে আমি আরো দু-একটা কথা বলতে পারি। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে পরিতোষবাবু বললেন, 'বুড়ো আঙুলটা একটু টন্‌টন্ করছে।' আমিও আগে ডাক্তারি করতুম। কোন ক্ষতকেই অবহেলা করা উচিত নয় বলে আমি নিজের বাড়িতে গিয়ে 'লাইজলের' শিশিটা নিয়ে আসি। তারপর খেলা শেষ হয়ে গেলে পর একটা চায়ের পেয়ালায় জল ভরে তাতে দশ ফোঁটা 'লাইজল' ঢেলে পরিতোষবাবুকে বলি, সেই জলে মাঝে মাঝে কাটা আঙুলটা ভিজিয়ে রাখতে। ঠিক সেই সময়েই পরিতোষবাবু বুকের কাছে ব্যথা বোধ করেন। আমি তাঁকে শুয়ে পড়তে বলে বাড়ি ফিরে যাই।"

জয়ন্ত বললে, "তাহলে কাল আপনি এ বাড়িতে দুবার এসে-ছিলেন?"

—"না, তিনবার।"

—"তিনবার?"

—"হ্যাঁ, আমি একটু রাতে আর একবার এসেছিলুম, সন্তোষবাবু সে কথা জানেন।"

—"আবার এসেছিলেন কেন?"

—"পরিতোষবাবুর বুকের ব্যাথাটা কেমন আছে জানবার জন্যে।

কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলুম, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাজেই তাঁকে না জাগিয়েই আবার আমি ফিরে যাই।"

কথা শুনতে শুনতে জয়ন্ত ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করছিল। সে বললে, মুরারিবাবু, আপনি যখন তৃতীয়বার এ ঘরে আসেন, সেই লাইজলের পেয়ালাটা কোথায় ছিল?"

—"ঐ টেবিলটার উপরে।"

—"কিন্তু সেটা এখন আর ঘরের কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

মুরারিবাবু হতভম্বের মতো বললেন, "আমি কেমন করে বলব?"

—"সন্তোষবাবু কি পেয়ালাটাকে সরিয়ে রেখেছেন?"

সন্তোষবাবু দৃঢ়স্বরে মাথা নেড়ে বললেন, "নিশ্চয়ই নয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! পেয়ালাটা কি তাহলে জ্যান্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে সরে পড়ল?"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, বাড়ির ভিতরে খুঁজে দেখুন পেয়ালাটা কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা! সেই-ই হচ্ছে যত নষ্টের মূল! ততক্ষণে আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে চাই।" বলেই সে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

তিন

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে জয়ন্ত আবার একতলার বৈঠকখানায় ঢুকে একজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললে, "সুন্দরবাবু আর মাণিকবাবুকে সেলাম দাও।"

মিনিট-খানেক পরে সুন্দরবাবু এসে বললেন, "জয়ন্ত, বাড়ির কোথাও চায়ের পেয়ালাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।"

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, "পাবেন না তা আমি জানি। সুন্দরবাবু, এটা খুব সহজ মামলা। অপরাধী বোকা আর অপরাধটাও কাঁচা, যদিও সে খুন আর চুরি দুই-ই করেছে।"

—"কি বলছ হে ?"

—মৃতদেহে ক্ষতচিহ্ন দেখে আর পেয়ালা অদৃশ্য হয়েছে শুনেই আমার মন আসল সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগল, পেয়ালায় নিশ্চয় 'লাইজলে'র বদলে এমন কোন মারাত্মক পদার্থ ছিল, যা আর কারুর জানা উচিত নয়। তাই সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আর সেটা সরাবার সুযোগ পেয়েছিলেন মুরারিবাবুই, কারণ তিনি বারবার এখানে আনাগোনা করছিলেন। আসবার সময় দেখেছিলুম, এ পাড়ায় একটি মাত্র ঔষধের দোকান আছে। সেখানে গিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, কাল সন্ধ্যার সময়ে মুরারি সেখান থেকে দুটো জিনিস কিনেছে—'সিয়ানাইড অফ পটাসিয়াম' আর 'হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড'। খানিকটা জলের সঙ্গে 'সিয়ানাইড অফ পটাসিয়াম' গুলে নিয়ে একটুখানি 'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড' মিশিয়ে দিলেই তা পরিণত হবে মারাত্মক 'প্রুসিক অ্যাসিডে'। মনুষ্য-দেহের অতি তুচ্ছ আঁচড়ও তার সংস্পর্শে এলে মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। মুরারি নিশ্চয় কোন গতিকে (খুব সম্ভব পরিতোষবাবুর মুখেই) জানতে পেরেছিল আলমারির মধ্যে দশ হাজার টাকার নোটের অস্তিত্ব। সুন্দরবাবু, একটা বড় মামলা নিয়ে আমি এখন বড়ই ব্যস্ত, আপাতত আমার আর কিছুই করবার নেই, বাকি তদন্তটা আপনিই সেরে ফেলুন। চলে এস মাণিক !"

পরদিন টেলিফোনের ঘণ্টি ধরে জয়ন্ত শুনতে পেলে, সুন্দরবাবু বিপুল উল্লাসে বলছেন, "হুম্ জয়ন্ত, হুম্ ! সঠিক তোমার আন্দাজ। মুরারি অপরাধ স্বীকার করেছে। তুমিই ধন্য !"

ব্রহ্মরাজের পদ্মরাগ

জয়ন্তের হাতে বাজছে বাঁশী। যখন কাজের অভাব হয় তখন বাঁশী হয় তার সাথী। ইজি-চেয়ারে কাৎ হয়ে মানিক পড়ছে খবরের কাগজ।

সকালের কচি রোদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে ধীরে ধীরে।

সিঁড়ির উপরে ভারি ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। জয়ন্তের বাঁশী হলো বোবা। দরজার সামনে দেখা দিলে বিপুল একটি ভুঁড়ি। গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি—কলকাতায় অদ্বিতীয় (অন্তত মাণিকের মতে)।

জয়ন্ত বললে, "সুপ্রভাত!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিহে, বাঁশী বাজাতে বাজাতে থামলে কেন?"

মাণিক খবরের কাগজখানা পাশের টেবিলে নিক্ষেপ করে বললে, "আপনার ভয়ে।"

—"হুম্! মানে?"

—"কোকিল কোনদিন মত্ত হস্তীর মন মজাতে সাহস করে না।"

—"আমি মত্ত হস্তী? মাণিক!"

জয়ন্ত চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি ভৃত্যের উদ্দেশে বললে, "মধু! চা, 'টোস্ট', 'এগ্-পোচ্'। শীগগির নিয়ে আয়—সুন্দরবাবুর ক্ষিধে পেয়েছে!"

সুন্দরবাবু হেসে ফেলে বললেন, "নাঃ, এর পরে আর রাগ করা চলে না দেখছি! কি বল হে মাণিক?"

মাণিক সায় দিয়ে বললে, "হ্যাঁ! সেটা বোকামি হবে। আপনি আর যা কিছু হোন, বোকা নন।"

—"হুম্ সার্টিফিকেটের জন্যে ধন্যবাদ" বলেই সুন্দরবাবু চেয়ারকে শব্দিত করে বসে পড়লেন।

জয়ন্ত বললে, "তারপর ? এত সকালে এদিকে যে ?"

—"চাকরির দায়ে।"

—"নতুন 'কেস্' ?"

"নতুন প্রহসনও বলতে পারো।"

—"প্রহসন ?"

—"হুঁ, কিন্তু এ প্রহসনটা বিয়োগান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।"

—"ব্যাপারটা কি ?"

—"খুবই সহজ, কিন্তু অপূর্ব !"

"ঘটনাটা খুলেই বলুন না !"

—"বলছি। সব ঘটনাই খুলে বলব, আগে 'ব্রেকফাস্ট'টা সেরে নি, কারণ মধু এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে"—বলেই সুন্দরবাবু বিপুল বিক্রমে 'এগ্-পোচ'কে আক্রমণ করলেন।

দুই

সুন্দরবাবু যা বললেন তা হচ্ছে এই :

মোহন মল্লিক কলকাতার একজন বিখ্যাত ধনী। তাঁর শখও যথেষ্ট। সম্প্রতি তিনি একখানি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন পদ্মরাগ মণি ক্রয় করেছেন।

মণিখানি ছিল ব্রহ্মদেশের শেষ-রাজা থীবোর রত্নভাণ্ডারের একটি প্রধান অলঙ্কার। থীবো রাজ্যচ্যুত হবার পর মণিখানি অন্য লোকের হাতে গিয়ে পড়ে। তারপর নীলামে ওঠে। মোহনবাবু সেখানি চল্লিশ হাজার টাকায় কিনে নেন। মণির আসল দাম নাকি ষাট হাজার টাকার কম হবে না।

কাল সকাল বেলায় মোহনবাবু নিজের বৈঠকখানার টেবিলের সামনে বসে থীবোর মণি পরীক্ষা করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর বাল্য-বন্ধু সুরেন্দ্রবাবু আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

সুরেনবাবু বললেন, "ওহে মোহন, ইনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ যাদুকর বিধুভূষণ বসু। তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে, তাই এঁকে নিয়ে এলুম।"

মোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বিধুকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আসুন বিধুবাবু, বসতে আজ্ঞা হোক। সুরেনের মুখে আপনার ম্যাজিক দেখাবার শক্তির কথা শুনেছি, নানা খবরের কাগজেও সেই কথা পড়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।"

সুরেনবাবু ও বিধুবাবু টেবিলের অন্য ধারে গিয়ে আসনগ্রহণ করলেন।

মোহনের হাতের দিকে তাকিয়ে সুরেনবাবু বললেন, "তোমার হাতে ওটা চক্‌চক্‌ করছে কি হে?"

মোহনবাবু বললেন, "থীবোর মণি—কাল তোমাকে যার কথা বলেছিলুম। অপূর্ব এর সৌন্দর্য, একবার হাতে নিয়ে দেখ।"

সুরেনবাবু মণিখানি নিয়ে বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে বললেন, "চমৎকার, চমৎকার!"

বিধুবাবুও মণিখানি নিজের হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, "এ মণির বিশেষত্ব কি?"

মোহনবাবু বললেন, "সব চেয়ে দামী পদ্মরাগ-মণির রঙ হয় কপোত-রক্তের মতো। এখানি সেই জাতীয়, আকারেও অসাধারণ।"

বিধুবাবু আর কিছু না বলে মণিখানি ফিরিয়ে দিলেন। মোহন-বাবু রত্নটিকে একটি হাতীর দাঁতের কৌটোর মধ্যে পুরে টেবিলের উপরে নিজের সামনে রেখে দিলেন। তারপর বিধুবাবুকে অনুরোধ করলেন, ম্যাজিকের দুই-একটি নমুনা দেখাবার জন্যে।

বিধুবাবু হাসিমুখে মোহনবাবুর অনুরোধ রক্ষা করলেন। তাঁর মন রাখবার জন্যে কেবল দু-একটি নয়, আধঘণ্টা ধরে নানান-রকম ভেল্কীর খেলা দেখালেন। তারপর হঠাৎ "জরুরি কাজ আছে" বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। খানিক পরে প্রস্থান করলেন সুরেনবাবুও।

মোহন মল্লিক রত্নটিকে আর একবার দেখবার জন্যে কৌটোটি খুলেই চমকে উঠলেন সবিস্ময়ে! কৌটো খালি, থীবোর মণি অদৃশ্য!

তিন

সুন্দরবাবু বললেন, "এই হচ্ছে প্রধান ঘটনা। এর পর আর কি শুনতে চাও?"

জয়ন্ত বললে, "ঘটনাটা নতুন-ধরনের বটে। এটা কি চুরির মামলা?"

—"তা ছাড়া আর কি বলব? মণিখানা যে টেবিলের উপর থেকে পড়ে হারিয়ে যায় নি, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"কিন্তু চোর বলে কাকে সন্দেহ করেন?"

—"মোহনবাবুর মতে, সুরেনবাবু কোনরকম সন্দেহের অতীত। তিনি বলেন, সুরেন কেবল তাঁর বিশ্বস্ত বাল্যবন্ধু নন, তিনি অত্যন্ত সাধু আর তাঁর নিজের সম্পত্তির মূল্য ত্রিশলক্ষ টাকা।"

—"তাহলে বাকি রইল কেবল বিধু?"

—"হ্যাঁ।"

—"কিন্তু মোহনবাবুর সুমুখে বসে কেমন করে সে চুরি করলে?"

—"সে যাদুকর। নানারকম হাতের কায়দা জানে। লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়াই হচ্ছে তার পেশা। আমার বিশ্বাস, অদ্ভুত ভেল্কী দেখিয়ে দর্শকদের অন্যমনস্ক করে কোন কৌশলে সে থীবোর মণি হস্তগত করে সরে পড়েছে।"

—"খুব সম্ভব, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। আপনি এখন কি করতে চান?'

—"আমি যাচ্ছি তার বাড়ি খানাতল্লাস করতে।"

—"তার বাড়ি কোথায়?"

—"মাণিক বসু লেনে। কাঠাখানেক জায়গার ওপরে ছোট্ট একখানা পুরানো দোতলা বাড়ি—ওপরে দুখানা ঘর। তিন নম্বরের

বাড়ি। সে বিখ্যাত যাদুকর হতে পারে, কিন্তু তার অবস্থা ভাল নয়।

—"কিন্তু থীবোর মণি কি সে এতক্ষণে সরিয়ে ফেলে নি?"

—"অসম্ভব। মোহনবাবু পুলিসে খবর দিতে একটুও দেরি করেন নি। বিধুর বাড়ির চারিদিকে পুলিসের পাহারা বসেছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, কাল থেকে আজ পর্যন্ত সে একবারও বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় নি।"

—"কিন্তু তার বাড়িতে মণি না পেলে তাকে চোর বলে গ্রেপ্তার করতেও তো পারবেন না?"

—"না। তার বিরুদ্ধে আদালতে গ্রাহ্য হয় এমন প্রমাণ কোথায়?"

—"বেশ, তবে চেষ্টা করে দেখুন।"

—"তোমরাও এস না আমার সঙ্গে!"

—"আপনার আপত্তি নেই?"

—"বিলক্ষণ! কী যে বল!"

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে চেয়ারের উপরে এলিয়ে চুপ করে রইল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ মিনিট কাটল,—তবু সে নীরব ও নিস্পন্দ!

মাণিক জয়ন্তের স্বভাব জানত। সে বুঝলে তার বন্ধু এখন গভীর চিন্তায় নিযুক্ত।

সুন্দরবাবু অধীর কণ্ঠে বললেন, ওহে ভায়া, বলি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

জয়ন্ত সাড়াও দেয় না, নড়েও না, চোখও মেলে না।

সুন্দরবাবু বললেন, "বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আর তো দেরি করতে পারি না!"

জয়ন্ত হঠাৎ চোখ খুলে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে চীৎকার করে উঠল, "হয়েছে, হয়েছে!"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আজ কালীপূজো না?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত কেন?"

—"বিধুর বাড়ি খানাতল্লাস করে যদি বামাল না পান, তাহলে আমি কি করব জানেন ?"

—"কি আবার করবে ?"

—"জয় মা কালী বলে বাজি ছুঁড়ব !"

—"মানে ?"

—"ভেবে দেখলুম, বিধু চোর-চূড়ামণি না হয়ে যায় না।"

—"কিন্তু বাজি ছোঁড়ার মানে কি ?"

—"পরে বলব। আপাতত মাণিককে নিয়ে আপনি বিধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হোন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমিও আপনার সঙ্গে যোগদান করব। বুঝলেন ?"

—"কিছুই বুঝলুম না। এখন যাবে না কেন ?"

—"এখনো আমার বাজার করা হয় নি" বলেই জয়ন্ত উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—নস্য নিতে নিতে।

হতাশ ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে সুন্দরবাবু বললেন, 'বরাবরই জানি জয়ন্ত ছোকরার মাথার ছিট্ আছে। এইবারে ছিট্ বোধহয় পাগলামিতে পরিণত হবে। চুরির সঙ্গে কালীপূজোর আর বাজি-ছোঁড়ার সম্পর্ক কি বাবা ?"

মাণিক বললে, "তা জানি না। তবে এটা জানি, জয়ন্ত খুশি হলেই ঘন ঘন নস্য নেয়।"

—"হুম্, খামোকা বাজার করবার জন্যে ওর এত মাথাব্যথা হলো কেন ? মাণিক, তোমার বন্ধুটি একেবারে অদ্ভুত।"

—"যা বলেছেন।"

—"এখন চল, পাগলকে নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, বিধুর বাড়ির দিকে পদচালনা করা যাক।"

চার

খানাতল্লাস ব্যর্থ হলো। বিধুর সমস্ত বাড়িখানা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও

থীবোর পদ্মরাগ-মণির কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ছোট বৈঠকখানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু নিরাশ-স্বরে বললেন "মাণিক, আমাদের কাদা ঘাঁটাই সার হলো।"

একজন কালো, রোগা বেঁটে লোক তাঁদের কাছে এসে অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "মশাই, আর আপনাদের এখানে কোন প্রয়োজন আছে?" তিনি বিধুবাবু।

এমন সময়ে জয়ন্তের প্রবেশ। তার হাতে একটা লম্বা ব্যাগ। সে এসেই বললে, "কি ব্যাপার?"

বিধুবাবু বললেন, "আপনি আবার কে?"

—"জনৈক ব্যক্তি। খানাতল্লাস শেষ হয়েছে?"

—"বুঝেছি, আপনিও পুলিসের কোন কেষ্ট-বিষ্টু। দেখুন, আমার মতন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে অকারণে আজ আপনারা যে হয়রানটা করলেন, আমি তা ভুলব না। আমি চোর? আমি থীবোর মণি চুরি করেছি? তাহলে আমার সমস্ত বাড়ি তছনছ করেও চোরাই মাল পাওয়া গেলনা কেন? এ কথা আমি লাটসাহেবের কানে তুলব।"

জয়ন্ত দুই ভুরু কপালে উঠিয়ে বলল, "কার কানে তুলবেন?"

—"লাট-সাহেবের কানে।"

—"লাট-সাহেব আপনার বিশেষ বন্ধু বুঝি?"

—"বন্ধু না হতে পারেন, কিন্তু লাট-সাহেব আমাকে চেনেন। আমি তাঁর সামনে ম্যাজিক দেখিয়েছি। তিনি আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।"

—"এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

বিধুবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "দেখবেন সেই সার্টিফিকেট?"

—"নিশ্চয়ই দেখব!"

বিধুবাবু রেগে টং হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, আমি খুঁজতে কিছু বাকি রাখি নি। মণি এখানে নেই। আর অপেক্ষা করা মিছে।"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। একদিকে একখানা চৌকী, তার উপরে ময়লা সতরঞ্চি পাতা। আর একদিকে ছোট্ট একটা দেরাজহীন টেবিল, তার উপরে ব্লটিং প্যাড, দোয়াতদান ও পিন-কুশন এবং খান-তিনেক চেয়ার, এ ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই।

সে বললে, "এ ঘরটাও খোঁজা হয়ে গেছে?"

—"এ ঘরে খোঁজবার কি আছে? এটা হচ্ছে বাইরের বৈঠকখানা,

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আগুন! আগুন!"

সর্বদাই খোলা পড়ে থাকে। বিধু এত নির্বোধ নয় যে, এমন প্রকাশ্য জায়গায় অত দামী রত্ন ফেলে রাখবে।"

—"আমি কৌশল করে বিধুকে এখান থেকে সরিয়ে দিলুম—যান, যান, আপনারাও বাইরে যান—শীগগির!" জয়ন্ত একরকম জোর করেই সুন্দরবাবু ও মাণিকবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে ঘর থকে বার করে দিলে!

পাঁচ

সুন্দরবাবু বিরক্ত স্বরে বললেন, "জয়ন্তের যত ছেলেখেলা! চল, আমরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই গে!"

মাণিক সচমকে চেঁচিয়ে উঠল, "আগুন! আগুন!"

দেখা গেল, বিধুবাবুর বৈঠকখানার জানালা-দরজা দিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া!

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আগুন! আগুন!"

জয়ন্ত এক লাফে দরজার বাইরে এসে পড়ে বাড়ি ফাটিয়ে চীৎকার করলে, "আগুন! আগুন!"

পুলিসের অন্যান্য সব লোকও এক সঙ্গে চীৎকার করতে লাগল, "আগুন! আগুন! আগুন! আগুন!"

বিধুবাবু কোথা থেকে পাগলের মতো ছুটে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন ঝড়ের মতো। পর-মুহূর্তেই আবার বেরিয়ে এলেন।

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "না, না, আগুন নয়—খালি ধোঁয়া!"

মাণিক উঁকিঝুঁকি মেরে বললে, "ঘরের ভেতরে ও ছুটো কি?"

জয়ন্ত বললে, "কিছু না, smoke rocket! আজ কালীপূজো কিনা, রকেট ছুঁড়তে হয়।……ওকি বিধুবাবু, পায়ে পায়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছেন কেন? সুন্দরবাবু!"

—"হুম্?"

—"ওঁকে গ্রেপ্তার করুন, পকেটে থীবোর মণি আছে!"

এইবারে বিধুবাবু দৌড় মারবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন দুদিক থেকে দুজন পাহারাওয়ালা তাঁকে ধরে ফেললে। বিধুবাবু তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "আমার কাছে কিছু নেই—আমার কাছে কিছু নেই!"

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তার পকেটে হস্তচালনা করে বললে, "এটা কি বিধুবাবু?"

—"পিন-কুশন!"

জয়ন্ত তখনি একখানা ছুরি বার করে কুশনের মখমল ফালা-ফালা করে ফেললে এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা রক্তবর্ণের সমুজ্জ্বল রত্ন!

জয়ন্ত বললে, "এই দেখুন সুন্দরবাবু, ব্রহ্মরাজ থীবোর পদ্মরাগ-মণি!"

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে খানিকক্ষণ সেই অপূর্ব রত্নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্ত যাদুকর কে? বিধু? না তুমি?"

ছয়

আবার জয়ন্তের ঘর। উদর-ভক্ত সুন্দরবাবুর সামনে এক প্লেট খাবার। চা-ভক্ত মাণিকের হাতে এক পেয়ালা চা। নস্য-ভক্ত জয়ন্তের হাতে নস্যের ডিবে।

জয়ন্তের উক্তি: "সুন্দরবাবু, মাণিক! এ মামলায় চোর যে কে, গোড়া থেকেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। সমস্যা ছিল কেবল একটি মাত্র: চোরাই মাল কোথায় লুকানো আছে?"

সুন্দরবাবু বললেন, চোরাই মাল বিধুর বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে যায় নি। আমারও বিশ্বাস হলো তাই। কিন্তু বাড়ির কোথায় আছে সেই মণি? জিনিসটার দাম যতই বেশি হোক, আকার তো বড় নয়,—কৌশলে লুকিয়ে রাখা খুবই সহজ। সাধারণ ভাবে খানা-

তল্লাস করলে তাকে যে আবিষ্কার করা যাবে না, এটাও আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

আর একটা সন্দেহও আমি করলুম। বিধু বেশ জানত, মোহনবাবু পুলিসে খবর দেবেন আর পুলিসের সন্দেহ পড়বে তারই উপরে এবং পুলিস তার বাড়িতে খানাতল্লাস করতে আসবে। সুতরাং কোন গুপ্তস্থানে মণিখানাকে লুকিয়ে সে পার পাবে না, কারণ পুলিস এসে আগেই সন্ধান করবে বাড়ির কোথায় কোথায় গুপ্তস্থান আছে! অতএব আমি আন্দাজ করলুম, বিধু যদি বুদ্ধিমান হয় তবে মণিখানাকে কৌশলে লুকিয়ে রাখবে কোন প্রকাশ্য স্থানেই। শেষ পর্যন্ত আমার আন্দাজটা সত্য হয়েই দাঁড়িয়েছে। যখন শুনলুম বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও হারা-মণি মেলেনি, তখন আমার সন্দেহ পড়ল এই বৈঠকখানার উপরেই। কারণ, বৈঠকখানা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে প্রকাশ্য জায়গা।

গোড়া থেকেই আমি স্থির করেছিলুম, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যে কোন স্থানেই মণি লুকানো থাক্, তার ঠিকানা আদায় করব চোরের কাছ থেকেই—অর্থাৎ রোগ ব্যক্ত হবে রোগীর নিজের মুখেই। কিন্তু কোন উপায়ে আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে? ভাবতে ভাবতে ধাঁ করে মাথায় এল এই অগ্নি-পরীক্ষার কথা।

বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগলে লোকে সর্বাগ্রে সামলাতে চায় নিজের সব-চেয়ে প্রিয় জিনিসকে। তখন আগুন দেখে সে আর সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এখানে আসবার আগে আমি বাজারথেকে কিনে এনেছি দুটো smoke rocket! হাতে হাতে রকেটের মহিমা দেখলেন তো? বাড়িতে আগুন লেগেছে শুনেই বিধু প্রথম ঝোঁকের মুখে পুলিসের কথা ভুলে ছুটে এল এই মহামূল্য মণিখানি রক্ষা করতে। আমি উঁকি মেরে দেখলুম, পাগলের মতো সে বাইরের ঘরে ঢুকে আর কোনদিকেই না তাকিয়ে 'পিন-কুশন'টি তাড়াতাড়িটেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তখনি বুঝতে পারলুম, পদ্মরাগ বিরাজ

করছে ঐ আলপিনের গদীর মধ্যেই! সুন্দরবাবু, আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?”

সুন্দরবাবু বললেন, “হুম্! এমন আশ্চর্য অগ্নি-পরীক্ষার কথা আর কখনো শুনি নি!”

—“কিন্তু আমি শুনেছি।”

—“কি-রকম?”

—“প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসদেশে এক ভুবন-বিখ্যাত পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিলেন, তাঁর নাম ফ্রাইন।”

—“প্রায় আড়াই হাজার বছর? বাবাঃ!”

—“সেই সময়ে একজন অমর শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম প্রাক্সিতেলেস। তিনি একদিন বললেন, ‘ফ্রাইন, তোমাকে আমি আমার হাতে গড়া একটি মূর্তি উপহার দেব।’...ফ্রাইন বললেন, ‘কিন্তু আমি চাই তোমার গড়া সর্বোৎকৃষ্ট মূর্তি!’...শিল্পী বললেন, ‘বেশ, তাই দেব।’...ফ্রাইন ভারি চালাক মেয়ে। শিল্পী তাঁর কোন মূর্তিটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করেন তা জানবার জন্যে তিনি আমারই মতন অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন করলেন; ফ্রাইনের একজন লোক হঠাৎ মিথ্যা খবর দিলে প্রাক্সিতেলেসের শিল্পশালায় আগুন লেগেছে। শিল্পী তখন সর্বাগ্রে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন তাঁর গড়া ‘Eors’ এর মূর্তিটিকে। ফ্রাইন তখন বললেন, ‘আমি চাই ঐ মূর্তিটিকেই!’ বুঝেছেন সুন্দরবাবু! বিংশ শতাব্দীতে আমি ব্যবহার করেছি প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার এই পুরাতন অগ্নি-পরীক্ষার পদ্ধতি! কেমন, ভুল করেছি কি?”

সুন্দরবাবু বললেন, “ভুল কি হে? তুমি বাহাদুর!”

জয়ন্তের প্রথম মামলা

এক

আমার বন্ধু জয়ন্ত গোয়েন্দাগিরি করে এখন যথেষ্ট যশস্বী হয়েছে। সে যে কত মামলার কিনারা করেছে তার আর সংখ্যা হয় না। কিন্তু তার প্রথম মামলার কথা আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। মামলাটি যদিও বিশেষ অসাধারণ নয়, তবু তরুণ বয়স থেকেই সে যে কি রকম আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিল, আমার এই কাহিনীর ভিতরে তার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমি আর জয়ন্ত তখন 'থার্ড-ইয়ারে'র ছাত্র। সে যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, জয়ন্ত তখনও এ-কথা জানত না বটে, কিন্তু সেই সময় থেকেই দেশ-বিদেশের অপরাধ-বিজ্ঞান, নামজাদা গোয়েন্দা ও অপরাধীদের কার্যকলাপ নিয়ে দস্তুরমত মস্তিষ্কচালনা শুরু করে দিয়েছে। সময়ে সময়ে অতি তুচ্ছ সূত্র অবলম্বন করে সে এমন সব বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার করত যে, আমরা—তার সহপাঠীরা—বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারতুম না।

একটি বৈকাল। জয়ন্ত ও আমি গোল-দীঘিতে পায়চারি করছি। এমন সময়ে তপনের সঙ্গে দেখা। সেও আমাদের কলেজে 'থার্ড-ইয়ারে'র ছাত্র। বনেদী বংশের ছেলে। তার পূর্বপুরুষরা আগে বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাদের আধুনিক অবস্থা ততটা উন্নত না হলেও এখনো তারা ধনবান বলে পরিচিত হতে পারে। আজও তাদের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসবে সমারোহের অভাব হয় না।

জয়ন্তকে দেখেই তপন বলে উঠল, "আরে, আরে, তোমাকেই খুঁজছি যে। কদিন কলেজ বন্ধ, তোমার সঙ্গে দেখা হয় না।"

জয়ন্ত সুধোলে, "আমাকে খুঁজছ কেন ?"

—"একটা হেঁয়ালির অর্থ জানতে চাই।"

—"কি রকম হেঁয়ালি ?"

"আমাদের বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর কিছু নয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। এ-সব ব্যাপারে তোমার মাথা খুব খেলে কিনা তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

—"ঘটনাটা বল।"

—"এই ভিড়ে নয়, আমার বাড়িতে চল। মনে কোরোনা কেবল ঘটনাটা বলবার জন্যেই তোমাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। যৎসামান্য ঘটনা, তুচ্ছ চুরি···কোন ছিঁচকে চোরের কীর্তি! কিন্তু তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে, তাই একসঙ্গে বসে চা-টা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করতে চাই।"

আমার দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, "কি হে মাণিক, রাজী আছ ?"

আমি বললুম, "মন্দ কি! অন্তত খানিকটা সময় কাটানো যাবে তো!"

দুই

তপনদের সাজানো-গুছানো বৃহৎ বৈঠকখানা। চা এল, খাবার এল।

তপন বললে, "আগে ঘটনাটা শোনো, তোমার মত বলো, তারপর অন্য গল্পসল্প!···দেখ, আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় তারাশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী মানুষ। কোন্ খেয়ালে জানি না, তিনি গুটিকয় দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়েছিলেন। বিষ্ণু, মহাদেব, কৃষ্ণ, রাধা, কালী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী—এই সাতটি মূর্তি। ওর মধ্যে লক্ষ্মীর মূর্তিটিই সব চেয়ে বড়—লম্বায় এক ফুট। অন্য অন্য মূর্তির কোনটি আট ইঞ্চি লম্বা, কোনটি ছয় ইঞ্চি। মূর্তিগুলি বেশ ভারি। কি দিয়ে গড়া জানি না, বাবা বলতেন পিতলের মূর্তি। কিন্তু বাহির থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না, কারণ প্রত্যেক মূর্তির আপাদমস্তক ছিল

রঙিন এনামেল দিয়ে ঢাকা। ঠাকুর ঘরের মধ্যে একটি 'গ্লাস-কেসে'র ভিতরে মূর্তিগুলি সাজানো ছিল—আমার প্রপিতামহের আমল থেকেই। আমার ঠাকুরদাদা কি বাবা, ও-মূর্তিগুলো নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামান নি, আমিও মাথা ঘামানো দরকার মনে করি নি, কিন্তু সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাদের নিয়ে রীতিমত মাথা না ঘামিয়ে পারে নি।"

—"কে সে?"

—"কোন অজ্ঞাত চোর।"

—"তাহলে মূর্তিগুলি চুরি গিয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কবে?"

—"তিন দিন আগে।"

—"মূর্তিগুলি কি মূল্যবান?"

—"মূল্যবান হলে সেগুলিকে কাঁচের আধারে ও-ভাবে ঠাকুরঘরে ফেলে রাখা হোত না।"

—"শিল্পের দিক দিয়েও তাদের কোন মূল্য থাকতে পারে তো?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়। অতি সাধারণ মূর্তি, শিল্পীরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। কেবল এনামেল করা মূর্তি এইটুকুই যা বিশেষত্ব। তবে সে-জন্য কেউ তাদের খুব বেশি দাম দিয়ে কিনতে রাজী হবে না। কিন্তু মজার কথা কি জানো? আমার অতি খেয়ালী প্রপিতামহ তাঁর উইলেও মূর্তিগুলির উল্লেখ করতে ভোলেন নি।"

—"কি রকম?"

—"উইলে তিনি বলেছেন, তাঁর কোন বুদ্ধিমান বংশধরের জন্যে ঐ মূর্তিগুলি আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি রেখে গেলেন, যে ও-গুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে। মূর্তি আর পুঁথি যেন সযত্নে রক্ষা করা হয়।"

—"বটে, বটে! এতক্ষণ পরে একটা চিত্তাকর্ষক কথা শুনলুম। সত্যনারায়ণের পুঁথি কি তপন?"

—"সেকেলে হাতে লেখা একখানা পুরাতন পুঁথি। তাতে সত্য-নারায়ণের পূজার সময়ে পুঁথিখানি পাঠ করা হয়।"

—"আচ্ছা, পুঁথির কথা পরে হবে, আগে চুরির কথা বল।"

—"পরশু দিন মামাতো বোনের বিয়ে ছিল। বাড়ির সবাইকে নিয়ে মামার বাড়িতেই রাত কাটাতে হয়েছিল। কাল সকালে ফিরে এসে দেখি, 'গ্লাস-কেসে'র ভিতর থেকে মূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়েছে।"

—ঠাকুর ঘরের দরজা কি তালাবন্ধ থাকত না?"

—"থাকত বইকি! চোর অন্য কোন চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলেছিল।"

—"মূর্তি ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি?"

—"না। এও এক আশ্চর্য কথা। ঠাকুরঘরের লক্ষ্মীর হাঁড়ির ভিতর ছিল আকবরী মোহর, কিছু কিছু রূপোর বাসন-কোসন, গৃহ-দেবতা রঘুনাথের রূপোর সিংহাসন, সোনার ছাতা, চুড়া, পইতা আর খড়ম। চোর কিন্তু সে-সব স্পর্শও করে নি। সে যেন খালি মূর্তিগুলো চুরি করবার জন্যেই এখানে এসেছিল।"

—"পুলিসে খবর দিয়েছ?"

—"এই সামান্য চুরির মামলা নিয়ে পুলিস হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

—"কারুর উপরে তোমার সন্দেহ হয়?"

—"কাকে সন্দেহ করব? দাস, দাসী, পাচক, দ্বারবান সকলেই বাবার আমলের পরীক্ষিত লোক, এতদিন পরে তাদের কারুর ঐ তুচ্ছ মূর্তিগুলোর উপরে দৃষ্টি পড়বে কেন? তারা ছাড়া বাড়িতে থাকেন শীতলবাবু। তাঁর কর্তব্য দু-রকম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো আর এটা-ওটা-সেটার তত্ত্বাবধান করা। তিন বছর কাজ করছেন, প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন হয়ে উঠেছেন। গরীব হলেও লেখাপড়াজানা নিরীহ সচ্চরিত্র ব্যক্তি—সকল রকম সন্দেহের অতীত।"

জয়ন্ত বললে, "তোমাদের ঐ সত্যনারায়ণের পুঁথির কথা এইবার বল। তোমার প্রপিতামহ ঐ পুঁথিখানাকেও যখন সযত্নে রক্ষা করতে বলেছেন, তখন ওর মধ্যেও নিশ্চয় কোন বিশেষত্ব আছে।"

তপন বললে, "বিশেষত্ব? পুঁথির ভিতরে আবার কি বিশেষত্ব থাকবে?" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু ভেবে সে আবার বললে "না, না, একটা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এই মূর্তি চুরির কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না।"

জয়ন্ত বললে, "হয়তো কোনই সম্পর্ক নেই। তবু বিশেষত্বের কথাটা শুনে রাখা উচিত।"

তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "পুঁথিখানা আমি এখনি নিয়ে আসছি, তুমি স্বচক্ষে দেখতে পারো।"

তিন

তপন নিয়ে এল পুঁথিখানা।

জয়ন্ত তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, "খুব প্রাচীন পুঁথি বটে। কিন্তু তপন, আর কোন বিশেষত্বই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"পুঁথি যেখানে শেষ হয়েছে, বিশেষত্বটা খুঁজে পাবে সেইখানে।"

যথাস্থানে দৃষ্টিপাত করে কিছুক্ষণ মৌন মুখে বসে রইল জয়ন্ত। আরো লক্ষ্য করলুম, তার দুই চক্ষে ফুটে উঠেছে জ্বলন্ত কৌতূহল।

পুঁথি থেকে মুখ তুলে অবশেষে সে বললে, "এখানে ভিন্ন হাতের একটু লেখা রয়েছে।"

তপন বললে, "হ্যাঁ, হিজিবিজি হেঁয়ালি। কোন্ ভাষা, কিছু বোঝবার যো নেই। কৌতূহল জাগায়, কিন্তু কৌতূহল মেটায় না। বহু চেষ্টা করে শেষটা হার মেনেছি।"

—"তোমার বাবা, তোমার ঠাকুরদাদাও নিশ্চয় পুঁথির এই লেখা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন?"

—"হ্যাঁ, তাঁরাও কিছুই বুঝতে পারেন নি।"

—"তপন, বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তোমার প্রপিতামহ যে বুদ্ধিমান বংশধরের জন্যে এই পুঁথিখানি সযত্নে রক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, তিনি এখনো তোমাদের পরিবারের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করেন নি।"

কিঞ্চিৎ বিরক্ত স্বরে তপন বললে, "তোমার কথার অর্থ বুঝলুম না।"

—"বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।" জয়ন্ত উঠে পড়ে দেওয়ালে ঝুলানো প্রকাণ্ড একখানা দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর পুঁথিখানা তুলে ধরে আয়নার ভিতরে তার প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে একখণ্ড কাগজের উপরে কি সব লিখে যেতে লাগল। তারপর ফিরে এসে কাগজখানা আমাদের সামনে টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বললে, "এইবারে পড়ে দেখ।"

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে আমরা দুজনে এই কথাগুলি পাঠ করলুম ঃ

"অভাবে স্বভাব নষ্ট করিবে না। সর্বদা দেব-দেবীর মূর্তি স্মরণ করিবে। নিশ্চিত জানিও, তোমার অভাব লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। চিন্তা দূর করিবে। লক্ষ্মীছাড়া হইলে জীবনে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিশেষ কাজে লাগে না। জগদীশ্বর কত রূপে দ্রষ্টব্য।"

তপন চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, "ঐ হেঁয়ালির ভিতরে এই সব কথা ছিল?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু যা তুমি হেঁয়ালি বলে ভ্রম করছ, তা হচ্ছে আমাদের সরল মাতৃভাষাই। কেবল উলটোভাবে সাজানো।"

—"উলটোভাবে সাজানো মানে?"

—"এ হচ্ছে এক রকম সাদাসিধে গুপ্তলিপি। ইংরেজীতে একে বলে "Looking Glass cipher" (বা দর্পণ-গুপ্তলিপি)। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ইতালীয় চিন্তাশীল চিত্রশিল্পী 'লিও নার্দো দ্য-ভিঞ্চি' এই উপায়ে গুপ্তলিপি রচনা করে গিয়েছেন। আয়নার সামনে ধরলেই এ-রকম গুপ্তলিপি খুব সহজেই পাঠ করা যায়।"

তপন বললে, "এত সহজে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করে তুমি যথেষ্ট বাহাদুরির পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু এটা আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? এতো কতকগুলি মামুলী উপদেশ মাত্র! সকলেই যা জানে, তার জন্যে আবার গুপ্তলিপির কী প্রয়োজন?"

—"ঠিক বলেছ তপন! এ-রকম মামুলী উপদেশের জন্যে গুপ্ত-লিপির প্রয়োজন হয় না। তার উপরে উপদেশগুলো কেমন যেন খাপছাড়া! আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? তোমার প্রপিতামহ এই গুপ্তলিপি রচনার সময়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে-ছিলেন! যেমন বেনারসের এক রকম কৌটোর ভিতরেও আবার কৌটো থাকে, তেমনি এই গুপ্তলিপির প্রথম রহস্যের ভিতরেও অন্য কোন রহস্য আছে। তোমরা এখন দয়া করে বাইরে যাও, আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও, একবার চেষ্টা করে দেখি, গুপ্তলিপির আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারি কিনা!"

চার

বৈঠকখানার পাশেই ছিল তপনদের লাইব্রেরী। তপন আমাকে সেই ঘরেই নিয়ে গেল।

সাধারণত বাঙালীদের বাড়িতে এত বড় লাইব্রেরী চোখে পড়ে না। মস্ত ঘরের চারিদিকের দেওয়ালের আধখানা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আলমারির পর আলমারি। ভিতরকার বইগুলোর নাম পড়তে পড়তে কেটে গেল খানিকক্ষণ।

ফিরে বললুম, "তপন, এখানে যতগুলো বইএর নাম পড়লুম, সবই দেখছি পুরানো যুগের।"

—"তা তো হবেই। এ ঘরের চারভাগের তিনভাগ কেতাব সংগ্রহ করে গিয়েছেন আমার প্রপিতামহ। কেনা আর বই পড়াও ছিল তাঁর আর এক অদ্ভুত খেয়াল।"

—"বই কেনা আর বই পড়াকে তুমি অদ্ভুত খেয়াল বলে মনে

স্কর! জানো, আমরা পশুত্বের ধাপ থেকে মনুষ্যত্বের ধাপে উঠতে পেরেছি কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা?"

—"জানি। তবু যে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়িটাকে আমি 'ফ্যাড' বলেই মনে করি!"

—"না। যা আমাদের মনকে উন্নত করে, প্রশস্ত করে, তার বাড়াবাড়িও নিন্দনীয় নয়। দেখছি তোমার প্রপিতামহ একজন অত্যন্ত সুধী ব্যক্তি ছিলেন।"

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দিলে—"তপন! মাণিক! শীগগির এ ঘরে এস।"

আবার বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলুম, জয়ন্ত একখণ্ড কাগজের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে বসে আছে।

তপন সুধোলে, "ব্যাপার কি ভায়া? গুপ্তলিপির ভিতর থেকে আর কোন নূতন অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছ নাকি?"

—"পেরেছি। তোমাদের বাড়ির যত অনর্থের মূলেই আছে এই অর্থ!"

—"অর্থটা শুনি!"

—"এখন নয়। অর্থটা ইঙ্গিতময়, শুনলেও ভাল করে বুঝতে পারবে না। অর্থটা প্রকাশ করবার আগে আমি একটা কথা জানতে চাই।"

—"কি কথা?"

—"সত্যনারায়ণের পুঁথির এই বিশেষত্ব নিয়ে তুমি আর কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছ?"

—"আগে আগে করতুম বৈকি! কিন্তু কেউই ঐ হেঁয়ালি বুঝতে পারে নি। শেষটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়েদি। কেবল গতমাসে শীতলবাবুর কৌতূহল দেখে পুঁথিখানা তাঁর হাতে দিয়েছিলুম বটে!"

—"তারপর?"

—"শীতলবাবু পরদিন পুঁথিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তিনিও কিছুই বুঝতে পারেন নি।"

—"শীতলবাবুকে একবার এখানে ডাকবে?"

—"তিনি বৈকালেই দেশের জন্যে বাজার হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না।"

—"দেশের জন্যে বাজার হাট ?"

—"হ্যাঁ। তাঁর কোন আত্মীয়ের বিয়ে, তাই এক-হপ্তার ছুটি নিয়ে কাল তিনি দেশে যাচ্ছেন।"

—"কাল কখন ?"

—"খুব ভোরের গাড়িতে। সূর্যোদয়ের আগেই তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

—"শীতলবাবু কি তোমাদের বাড়ির দোতলায় থাকেন ?"

—"না বাড়ির একতলায়, খিড়কীর বাগানের সামনেই।"

—জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, "তপন, আজ রাত্রে তোমার বাড়িতে আমাদের জন্য একটুখানি জায়গা হবে ?"

তপন বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "তার মানে ?"

—"আমি আর আমার মাণিক আজ তোমাদের বাড়িতে রাত্রিবাস করতে চাই।"

—"যদিও তোমার এই প্রস্তাবের কারণ বুঝতে পারছি না, তবু সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। কেবল রাত্রিবাস কেন, ডানহাতের ব্যাপারটাও আমার এখানে সেরে নিও।"

—"আপত্তি নেই। আর এক কথা। আমি আবার দক্ষিণ খোলা না হলে ঘুমতে পারি না।"

—"নির্ভয় হও। আমার বাড়ির দক্ষিণ দিকে আছে বাগান আর পুকুর—এখানা সেকেলে বাড়ি কিনা! আমার শয়ন গৃহও সেই দিকে। তোমরাও আমার সঙ্গে সেই ঘরেই শয়ন করবে।"

পাঁচ

তপন যে গুরুতর আহার্যের ব্যবস্থা করেছিল, একটিমাত্র ডান-হাতের

সাহায্যে কোন মানুষই তার সদ্ব্যবহার করতে পারে না, খানিক পাতে ফেলে আমরা উঠে পড়তে বাধ্য হলুম—তপনের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

বাগানের দিকে দোতলার বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করলুম তিনজনে। জ্যোৎস্নামাখা রাত, বাগানের তাল নারিকেল পাতায় পাতায় আলোর ফুলঝুরি, সরোবরের নৃত্যশীল জলে চন্দ্রকরের চক্‌মকি। মৃদু পত্র-মর্মর, বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস, ঝিল্লীদের ঘুমপাড়ানে ঝঙ্কার।

খানিকক্ষণ চলল গল্প। তারপরেই ঘুমে চোখ ভরে এল। জয়ন্তও ঘন ঘন হাই তুলতে শুরু করেছে দেখে তপন বললে, "চল, এইবার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।"

শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ ভাবলুম, জয়ন্ত গুপ্তলিপির এমন কি গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করছে, যে জন্য আজ এখানে তার রাত কাটাবার দরকার হলো? জিজ্ঞাসা করলেও এখন সে জবাব দেবে না জানি, তাই তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি। সময়ে সময়ে নিরতিশয় রহস্যময় হয়ে ওঠে জয়ন্ত!……এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম নিজের অজ্ঞাতসারে।

আচম্বিতে আমার ঘুম গেল ভেঙ্গে—কে আমাকে ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি, জয়ন্ত!

তারপর সে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল তপনকেও।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল রাত দুটো।

তপন সবিস্ময়ে বললে, "এত রাতে একি ব্যাপার জয়ন্ত?"

—"কোন কথা নয়! একেবারে একতলায় নেমে চল। সিধে শীতলবাবুর ঘরে।"

—"সেকি, কেন?"

—"কথা নয়, কথা নয়! যা বলি শোন!"

ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়লুম। সিঁড়ি বয়ে এক তলায় নামলুম। খানিক এগিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তপন বললে, "এই শীতলবাবুর ঘর।"

দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল আলোর রেখা।

জয়ন্ত বললে, "তপন, শীতলবাবুকে ডাকো।"

তপন ডাকলে, "শীতলবাবু, শীতলবাবু!" ঘরের আলো গেল নিবে। কোন সাড়া নেই।

তপন আবার ডাকলে, "শীতলবাবু! ঘরের আলো নেবালেন কেন? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন?"

এবার ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

"আমি তপন। দরজা খুলুন।"

দরজা খুলে একটি লোক বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, "এত রাতে

ইতিমধ্যে জয়ন্ত হাতের 'টর্চ' জেবলে ঘরের ভিতরে ঢুকে...

ব্যাপার কি ? কোন বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি ?"

ইতিমধ্যে জয়ন্ত হাতের 'টর্চ' জ্বেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে 'সুইচ' টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

শীতলবাবুও ঘরে ঢুকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, "কে আপনি ? আমার ঘরে আপনার কি দরকার ?"

তপন বললে, "চুপ করুন শীতলবাবু ! উনি আমার বন্ধু।"

শীতলবাবু বললে, "কিন্তু আপনার বন্ধু এত রাতে আমার ঘরে ঢুকে কি করতে চান ?"

জয়ন্ত বললে, "আমি দেখতে চাই একটা ভিজে পোঁটলা আপনি ঘরের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ?"

"পোঁটলা ? কিসের পোঁটলা ?"

কিন্তু জয়ন্ত আর তার কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই বললে, "হুঁ। এই তো ঘরের মেঝেয় রয়েছে জলের দাগ ! এই তো একটা জলে ভেজা জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ! হ্যাঁ, টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একেবারে চৌকির তলায়—"বলতে বলতে সে মেঝের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে প্রবেশ করল চৌকির তলদেশে এবং সেইভাবেই আবার যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন দেখা গেল, সে টানতে টানতে নিয়ে আসছে একটা চটের থলি !

তারপর সে থলির ভিতর হাত চালিয়ে একে একে বার করলে রাধা, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, কালী, মহাদেব ও সরস্বতী– এই সাতটি দেব-দেবীর এনামেল করা মূর্তি।

তপন নির্বাক, বিষম বিস্ময়ে। শীতলবাবুও নির্বাক, দারুণ আতঙ্কে।

হঠাৎ বিষ্ণু মূর্তিটি তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, "আরে একি ! বিষ্ণু-ঠাকুরের ডান পায়ের উপর থেকে খানিকটা এনামেলের আবরণ তুলে ফেললে কে ? বুঝেছি, এ হচ্ছে সুচতুর শীতলবাবুর কাজ ! উনি সন্দেহ করেছিলেন এনামেলের পাতলা আবরণ কেবল বোকাদের চোখ ঠকাবার জন্যে, কিন্তু ওর তলায় আছে কোন মহার্ঘ ধাতু ! তপন,

দেখতে পাচ্ছ কি, বিষ্ণু মূর্তিটির পা কি দিয়ে গড়া ?”

তপন হতভম্বের মতো বললে, “কি ?”

“সোনা। খালি পা কেন, সমস্ত মূর্তিটাই নিশ্চয় সোনা দিয়ে গড়া !”

—“বল কি জয়ন্ত !”

—“হ্যাঁ !” কেবল বিষ্ণু মূর্তি নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক দেব-দেবীর মূর্তিই নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি। আন্দাজ মনে হচ্ছে—এ মূর্তিগুলির মোট ওজন এক মণের কম নয়।”

আমি তো স্তম্ভিত !

জয়ন্ত লক্ষ্মীদেবীর সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তুলে নিয়ে বললে, “তপন, এইবারে আমি তোমাকে অধিকতর অভিভূত করতে চাই। দেখছি লক্ষ্মীদেবীর দেহের তুলনায় ঝাঁপিটি অতিরিক্ত বড়। ঝাঁপির ভিতরটা ফাঁপা। কিন্তু ঝাঁপির ঢাকনিটা ভেঙে খুলে ফেললে কে ? নিশ্চয়ই শীতলবাবুর কীর্তি ! শীতলবাবু ঝাঁপির ভিতরে কি ছিল ?”

শীতলবাবু শুষ্কস্বরে বললে, “আমি জানি না।”

—“আহা, জানেন বৈকি ! ঝাঁপির ভিতরে যা ছিল এখনি আমাকে ফিরিয়ে দিন।”

—“ঝাঁপির ভিতর কিছুই ছিল না।”

—“এখনো মিথ্যা কথা ? তপন তাহলে আর দয়া নয়, তুমি এখনি থানায় ফোন করে দাও, পুলিস এসে শেষ ব্যবস্থা করুক।”

পুলিসের নামেই শীতলবাবু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, “আমাকে ধরিয়ে দেবেন না, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না !”

—“তাহলে ঝাঁপির ভিতরে কি ছিল দিন।”

শীতলবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে জামার পকেটের ভিতর থেকে একটি ছোট কাগজের মোড়ক বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত আগে মোড়কটা খুলে তার ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ টিপে একটুখানি হাসলে। তারপর বললে, “তপন, শীতলবাবুর মস্তিষ্ক যে তোমার চেয়ে শক্তিশালী, সেটা তিনি প্রমাণিত করেছেন।

কিন্তু অপরাধী হিসাবে তিনি একেবারে শিশুর মতো কচি আর কাঁচা।

তিনি যদি এত তাড়াতাড়ি বামাল নিয়ে এখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা না করতেন, তাহলে আমরা কিছুতেই ওঁর নাগাল পেতুম না। যাক্, ও কথা। এটা হচ্ছে শীতলবাবুর প্রথম অপরাধ। আর উনি এই অপরাধটা করেছেন বলেই তুমি হলে সব দিক দিয়েই আশাতীত-রূপে লাভবান। কারণ উনি অপরাধটা না করলে তুমিও আমাকে ডাকতে না, আর তাহলে তোমাদের এই দেব-দেবীর মূর্তিগুলিও এনামেলের চাদরে গা ঢাকা দিয়ে ঐ কাঁচের আধারেরই শোভাবর্ধন করতেন, এ জীবনেও তুমি তাঁদের আসল চেহারা দেখতে পেতে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি ওঁকে ক্ষমা করবে, না পুলিসের হাতে সমর্পণ করবে ?"

তপন বললে, "আমি ওঁকে ক্ষমাও করব না, পুলিসেও দেব না। শীতলবাবু বিশ্বাসহন্তা। উনি যেন এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে যান।"

শীতলবাবুর অধিকাংশ মোটঘাট বাঁধাই ছিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করে বাকি জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "জয়ন্ত, ঐ মোড়কটার ভিতরে কি আছে ?"

জয়ন্ত হাসিমুখে মোড়কটা আমাদের সামনে খুলে ধরে বললে, "সাত রাজার ধন এক মাণিক !"

প্রকাণ্ড এক হীরক খণ্ড ! অত বড় হীরা আমি কখন চক্ষেও দেখিনি !

তপনের বোধহয় মাথা ঘুরে গেল। সে একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে ধপাস্ করে চৌকির উপর বসে পড়ল।

ছয়

জয়ন্ত বললে, "আমি কেন শীতলবাবুর উপরে সন্দেহ করেছিলুম, এখন সেই কথাই শোন।"

"এনামেল করা মূর্তিগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান, আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি যে অতিশয় দরকারি, এতদিন কেন যে তোমাদের এমন সন্দেহ হয় নি, সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। গুপ্ত-লিপির রহস্য তোমরা জানতে না বটে, কিন্তু এটা তো সকলেই জানতে যে, তোমার প্রপিতামহ উইলে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন, যে ঐ মূর্তি-গুলির আর পুঁথির সদ্ব্যবহার করতে পারবে, সে তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে, হয়তো অভাবে পড়োনি বলেই তোমরা ও-কথাগুলির উপরে বিশেষ ঝোঁক দাওনি। হয়তো অভাবে পড়লেই তোমাদেরও মাথা খুলে যেত।"

"আমি গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করবার আগেই ঐ কথাগুলি শুনেই নিশ্চিত ভাবে ধরে নিয়েছিলুম দেব-দেবীর মূর্তিগুলি মহামূল্যবান। অবশ্য গুপ্তলিপি পড়বার পর ও-সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ-ই থাকে নি।"

"বাড়ির লোকই যে চুরি করেছে এটা বুঝতেও আমার বিলম্ব হয় নি। ঠাকুরঘরের তালার জন্য নূতন একটা চাবি গড়বার সুযোগ হয় বাড়ির লোকেরই। বাইরের চোর মূর্তিরহস্য জানত না, অতএব কেবল মূর্তিগুলো চুরি করেই সরে পড়ত না। ঘটনার দিন রাত্রে বাড়িতে ছিল দাস-দাসী, পাচক আর দ্বারবানরা। নিশ্চয়ই তাদেরও কেউ চুরি করেনি, কারণ তাহলে সে ঠাকুরঘরের সোনা-রূপোর জিনিসগুলোও ফেলে যেত না। বাড়ির ভিতরে তাদের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে কেবল শীতলবাবু। আমার যুক্তি বললে, সেইই চোর।"

"কিন্তু কেন সে, বেছে বেছে কেবল মূর্তিগুলোই চুরি করলে? আমার মতো সেও কি ভিতরের রহস্য আবিষ্কার করবার কোন সুযোগ

পেয়েছিল ? তপনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, পেয়েছিল। মাসখানেক আগে সে হস্তগত করেছিল পুঁথিখানা। খুবসম্ভব আমার মতো তাড়াতাড়ি সে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। সেই চেষ্টাতেই তার কিছুদিন কেটে যায়। তারপর নতুন চাবি গড়িয়ে চুরি করে সে প্রথম সুযোগেই।”

“কিন্তু চোরাই মাল সে রাখলে কোথায় ? অতরাত্রে মূর্তিগুলো নিয়ে নিশ্চয় সে বাড়ির বাইরে যেতে সাহস করে নি, কেউ না কেউ তাকে বেরুতে দেখতে পারে। আর বাইরেই বা সে যাবে কোথায়, তার বাসা যখন এই বাড়িতেই ? কিন্তু চোরাই মাল সে নিজের ঘরে রাখতেও ভরসা করবে না। পুলিসে খবর দিলে পুলিস এসে তার ঘর খানাতল্লাস করতে পারে। অতএব চোরাই মাল সে এমন কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে, যা তার ঘরের বাইরে কিন্তু বাড়ির বাইরে নয়। কিন্তু সে জায়গাটা কোথায় ? তার ঘরের পাশেই আছে বাগান আর পুকুর। বাগানের মাটি খুঁড়ে বা পুকুরের জলে ডুবিয়ে মূর্তিগুলো লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।”

“শীতলবাবু বুদ্ধিমান, কিন্তু কাঁচা অপরাধী। ধরা পড়বার ভয়ে দুদিন যেতে না যেতেই স্থির করলে, কোন ওজরে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার পথ দেখতে পেলুম। সে দেশে যাবে কাল সকালে। আর যাবার সময়ে বহুমূল্য মূর্তিগুলো নিশ্চয়ই এখানে ফেলে রেখে যাবে না, আজ রাত্রে সেগুলোকে গুপ্তস্থান থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। সুতরাং আজ এখানে রাত্রিবাস করবার জন্যে আমি তপনের কাছ থেকে চাইলুম একখানা দক্ষিণ খোলা ঘর, কারণ এ বাড়ির দক্ষিণে যে বাগান আছে, সেটা আমার অজানা ছিল না।”

“আমি ঘুমোবার ভান করে তোমাদের সঙ্গেই শুয়েছিলুম। তারপর তোমাদের নাসাগর্জন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যা দেখবার আশা করছিলুম,

রাত পৌণে ছটোর সময়ে দেখতে পেলুম ঠিক সেই দৃশ্যই। সন্তর্পণে বাগানে এসে দাঁড়ালো শীতলবাবু। তারপরে পুকুর পাড়ে গেল। জলের ভিতর থেকে দড়ি ধরে টেনে তুললে পোঁটলার মতো কি-একটা জিনিস। তারপরের কথা বলবার দরকার নেই।”

সাত

আমি বললুম, “কিন্তু এখনো আমরা আসল কথা শুনতে পেলুম না।”

জয়ন্ত বললে, “কি কথা শুনতে চাও?”

—“গুপ্তলিপির ভিতর থেকে তুমি দ্বিতীয় কি অর্থ আবিষ্কার করেছ?”

—“কেবল আমি নই, শীতলবাবুও আবিষ্কার করেছে।”

—“অর্থটা কি?”

জয়ন্ত আমাদের সামনে একখণ্ড কাগজ খুলে ধরলে—তার উপরে লেখা ছিল গুপ্তলিপির সেই উপদেশগুলি: “অভাবে স্বভাব নষ্ট করবে না প্রভৃতি।”

তারপর সে বললে, “তপনের প্রপিতামহ সাবধানতার উপরে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। যদি কেউ Lookirg glass cipper—এর গুপ্তকথা ধরতেও পারে, তাহলেও সে আসল গূঢ় অর্থ বুঝতে পারবে না, কথাগুলোকে উপদেশ বলেই গ্রহণ করবে। কিন্তু ভালো করে এই উপদেশের শব্দগুলোকে লক্ষ্য কর। মোট লাইন আছে ছয়টি। এখন প্রত্যেক লাইন থেকে যদি কোন প্রথম আর শেষ শব্দ নিয়ে পরে পরে সাজিয়ে যাও, তাহলে পাওয়া যাবে এই কথাগুলি: “অভাবে দেব-দেবীর মূর্তি তোমার অভাব দূর করিবে। লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।” দেখছ, এখানেও সাবধানতা! স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, কেবল ইঙ্গিত। কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে ঐ ইঙ্গিতই যথেষ্ট।”

আমি বললুম, “তাহলে উপন্যাসের ময়্যালটা দাঁড়াল কি?”

জয়ন্ত হেসে বললে, "মনীষা থাকলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি অসৎ পথে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ঠকতে হয়, যেমন শীতলবাবু।"

—"আর মনীষা না থাকলে?"

—"সৎপথে নির্বোধকেও লাভবান করে। যেমন তপন।"

তপন সহাস্য বদনে বললে, "যতই আজ বাক্যবাগুরা বিস্তার কর, কিছুই আমি গ্রাহ্য করব না। আমার সোনার দেব-দেবীদের শত শত প্রণাম করে এখনি দুর্ভেদ্য লোহার সিন্দুকে তুলে রাখব।"

কিস্‌মৎ

ছোট ভাই সুরেশ শয্যাগত হয়ে পড়েছে। অসুখটা ব্লাড-প্রেসার। সুখেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছি। সে আমার বন্ধু ও বিখ্যাত ডাক্তার।

সুখেন্দুর দেখা পেলুম তার ডিসপেন্সারিতে। সে মন দিয়ে সুরেশের রোগের সব লক্ষণ শুনে বললে, "ভয়ের কারণ নেই। আজ ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছি, কাল সকালে নিজে গিয়ে দেখে আসব রোগী কেমন আছে।"

সে কাগজ-কলম নিয়ে ব্যবস্থাপত্র লেখবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে এক অদ্ভুত মূর্তি।

আগন্তুক নারী। কিন্তু এমন তার চেহারা, দেখলেই শিউরে উঠতে হয়। প্রথমেই নজরে পড়ে তার দেহের শীর্ণতা ও দীর্ঘতা। সে এতো রোগা যে তার হাড় কয়খানা কেবল চামড়া দিয়ে ঢাকা আছে বললেই হয়। আর অধিকাংশ পুরুষের চেয়ে সে মাথায় উঁচু। তার বয়সও আন্দাজ করা সহজ নয়! ত্রিশও হতে পারে, পঞ্চাশও। পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু তার বেশভূষা আধুনিক নারীর মতো নয়।

তারপরেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার ভয়াবহ গায়ের রঙ। তা হচ্ছে একেবারেই মৃতদেহের মতো—পাণ্ডুর এবং রক্তহীন। অন্তত দুই দিনের বাসি মড়ার দেহের রঙ হয় এমনিধারাই। আমি দুই দিনের বাসি মড়া কখনো দেখিনি। তবু কেন জানি না, এই কথাই মনে হলো।

সুখেন্দুরও মুখে-চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব।

নারী অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট স্বরে বললে, "আমি ডাক্তার এস. বসুর কাছে এসেছি।"

সুখেন্দু বললে, "আমারই ঐ নাম। বসুন। আপনার কি কোন অসুখ করেছে ?"

নারী বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"অসুখ কি ?"

—"তাই জানবার জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি!" স্বর ক্ষীণ হলেও তার মধ্যে পাওয়া গেল যেন ব্যঙ্গের আভাস!

সুখেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।"

নারীও তার পিছনে পিছনে চলল এবং পাশের ঘরে প্রবেশ করবার আগে হঠাৎ আমার দিকে একটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে।

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল! আমি দেখলুম দুটো মাছের চোখ—সম্পূর্ণ ভাবহীন দুটো মরা মাছের চোখ!

খানিকক্ষণ পরে ডাক্তার ও রোগিণী দুজনেই পাশের ঘর থেকে ফিরে এল।

সুখেন্দু টেবিলের ধারে বসে কলম হাতে নিয়ে শুধোলে "আপনার নাম ?"

—"আমোদিনী দেবী।"

ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে সুখেন্দু বললে, "দুটো ওষুধ লিখে দিলুম, ব্যবহার করে কেমন থাকেন জানাবেন।"

দর্শনীর টাকা টেবিলের উপরে রেখে, ব্যবস্থাপত্র নিয়ে রোগিণী দরজার দিকে অগ্রসর হলো, কিন্তু বাইরে যাবার আগে আর একবার হঠাৎ ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে গেল।

আবার দেখলুম, সম্পূর্ণ সেই দুটো মরা মাছের মতো চোখ!

মনের অস্বস্তি মনেই চেপে সুখেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওর কি অসুখ হয়েছে ?"

—"অ্যানিমিয়া, বিষম অ্যানিমিয়া। ও বেঁচে আছে কেমন করে বুঝতে পারলুম না।"

জানলার দিকে তাকিয়ে আছে একটা নারী মূর্তি

বাড়ির দিকে ফিরছি।

গাড়ির ভিতরে বসেই দেখতে পেলুম, রাস্তার ফুটপাথের উপরে দাঁড়িয়ে আমার বাড়ির বৈঠকখানার জানালার দিকে তাকিয়ে আছে একটা নারীমূর্তি। যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙা তার চেহারা।

গাড়ির শব্দে চমকে ফিরে চকিতে একবার চেয়ে দেখে মূর্তিটা হনহন করে চলে গেল। তাকে দূর থেকে চিনতে পারলুম না বটে, কিন্তু কেন জানি না, আবার মনে পড়ল সুখেন্দুর ডিসপেন্সারির সেই অদ্ভুত রোগিণীর কথা।

আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, আমার বাড়ির বৈঠকখানার দিকে তাকিয়ে মূর্তিটা কি দেখবার চেষ্টা করছিল?

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সেটা বুঝতে দেরি লাগল না।

বৈঠকখানার ভিতরে বাড়ির সব লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেই হায় হায় করছে। নিশ্চয়ই ঘটেছে একটা কোন অঘটন।

ভিড় সরিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চিত হয়ে পড়ে আছে আমার ছোটভাই সুরেশের চৈতন্যহীন দেহ। তার দুই হাত বিস্ফারিত, আড়ষ্ট চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে আছে রাস্তার ধারের জানলার দিকে এবং তার মধ্যে ফুটে আছে এক প্রচণ্ড আতঙ্কের ভাব।

কিন্তু কেন ? জানলার ভিতর দিয়ে পথের উপরে কি বা কাকে দেখে সুরেশ এতটা ভয় পেয়েছিল ?

তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডেকে আনা হলো। তিনি সব দেখে-শুনে বললেন, "আর কোন আশা নেই। রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে অত্যধিক রক্তের চাপে।"

তিন

মৃতদেহ নিয়ে এসেছি নিমতলার শ্মশান-ঘাটে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে চিতার আগুন। বড় নিষ্ঠুর ঐ চিতা। মানুষ যাদের ভালোবাসে তাদেরই গ্রাস করা তার ধর্ম।

সংসারে আপন বলতে ছিল কেবল আমার এই ভাইটি। সেও আমাকে ফেলে চলে গেল। দুনিয়ায় আজ আমি একা।

চিতার কাছে উবু হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে এইসব কথা ভাবছি। আচম্বিতে মুখ তুলে আমার দুই চক্ষু হয়ে উঠল সচকিত।

খানিক তফাতে একদল কৌতূহলী লোকের মাঝখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক সুদীর্ঘ, কঙ্কালসার নারীমূর্তি। সেই রোগিণী! মরা মাছের মতো দুটো নিষ্পলক ড্যাবডেবে চোখে সে তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই।

আমার সর্বাঙ্গের ভিতর দিয়ে খেলে গেল যেন উত্তপ্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ!

কিন্তু এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠেই দেখি, সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই রহস্যময়ী নারীমূর্তি!

চার

কেটে গিয়েছে প্রায় এক বৎসর।

মানুষ একেবারে একলা থাকতে পারে না। একটি স্প্যানিয়েল কুকুর পুষেছি। সে আমার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী—নাম তার রোভার। তাকে আমি ভালোবাসি, সে মানুষ হলেও তাকে আমি আরো বেশি ভালোবাসতে পারতুম না।

সেদিন বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে কার্জন পার্কের একখানা বেঞ্চির উপরে বসে বিশ্রাম করছিলুম।

রোভার আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছিল ঘাস-জমির এখানে ওখানে। তারপর সে ছুটতে ছুটতে চলে গেল আমার পিছন দিক-কার একটা ঝোপের ওপাশে।

মিনিটখানেক পরেই সে ক্রুদ্ধস্বরে ঘেউ ঘেউ গর্জন করে উঠল এবং পর-মুহূর্তেই শুনলুম তার আর্ত চীৎকার।

তাড়াতাড়ি উঠে ঝোপের ওধারে ছুটে গেলুম।

প্রথমটা রোভারকে দেখতে পেলুম না। তার বদলে দেখলুম, একটা নারীমূর্তি মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কি যেন লক্ষ্য করছে।

আমার পদশব্দে চমকে উঠে ফিরে দেখেই সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং হন্তদন্তের মতো দ্রুতপদে চলে গেল সেখান থেকে। কিন্তু দেখিবামাত্রই তাকে চিনলুম, সে সেই দীর্ঘ, কৃশ ও পাণ্ডু রোগিণী—দুই চোখ যার মরা মাছের মতো বিস্ফারিত ও ভাবহীন!

সে যেখানে হুমড়ি খেয়ে ছিল, সেখানে আড়ষ্ট হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রোভারের দেহ। দৌড়ে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলুম, সে আর বেঁচে নেই! আমার বলবান, স্বাস্থ্যবান ও সুবৃহৎ কুকুর, আচম্বিতে মারা পড়ল কেমন করে?

হঠাৎ খিল্ খিল্ করে শুকনো হাসি শুনেই মুখ তুলে দেখি, খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীভৎস রোগিণী! ক্ষীণ অথচ

খন্‌খনে গলায় সে বলে উঠল—“আসব, আবার আমাদের দেখা হবে!”

নিদারুণ ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে মারমুখো হয়ে আমি বেগে ছুটে গেলুম তার দিকে।

কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে সে চলে গেল আমার নাগালের বাইরে এবং তারপর হারিয়ে গেল চৌরঙ্গীর সচল জনতারণ্যে।

পাঁচ

কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আজ তিন বৎসর ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভারতের দেশে দেশে। সেই শরীরী অমঙ্গল এখনো আমাকে দেখা দেয় নি।

কিন্তু আমার মন বলে—এখনো সে আছে আমার পিছনে পিছনে, শেষবারের মতো আবার তার চরম দেখা পাব যে-কোন দিন, যে-কোন মুহূর্তে!

সে কি আমার নিয়তি?

চোরাই বাড়ি

রূপকথায় শুনেছি পুকুর-চুরির কথা। কিন্তু বাড়ি চুরির কথা কখনো শুনেছ?

সত্য-মিথ্যা জানি না, কিন্তু কয়েক বৎসর আগে শুনেছিলুম একটি বিচিত্র ঘটনার কথা। কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এক ধনী ব্যক্তির প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি ছিল। কোন কারণে তাঁকে দীর্ঘকালের জন্যে সপরিবারে বিদেশে যাত্রা করতে হয়। এবং সেই সময়ে তিনি বাড়িখানা দেখাশোনা করবার জন্যে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করে যান।

কিছুকাল পরে ভদ্রলোক আবার কলকাতায় আসেন, কিন্তু নিজের বাড়ির বা কর্মচারীর আর কোন খোঁজ পান না। বিপুল বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, যেখানে আগে তাঁর বাড়ি ছিল, সেখানে এখন পড়ে আছে একটা খোলা মাঠ! যেন গোটা বাড়িখানা মাথায় করে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে আলাদিনের বিখ্যাত দৈত্য!

তারপর জানা গেল ব্যাপার হয়েছিল এই: ভদ্রলোকের বিদেশ-যাত্রার পর তাঁর দ্বারা নিযুক্ত সেই চতুর কর্মচারী সমস্ত বাড়িখানা ভেঙে-চুরে তার মালমশলা বিক্রি করে বেশ দু-পয়সা কামিয়ে চম্পট দিয়েছে কোন নিরাপদ ব্যবধানে!

কিন্তু আমি তোমাদের আজ এরও চেয়ে আশ্চর্য এক সত্য ঘটনার কথা বলব। চোরাই মালের কথাই শুনি, কিন্তু চোরাই বাড়ির কথা কে কবে শুনেছে? ঘটনাটি ঘটেছিল ইয়াঙ্কিস্থানে অর্থাৎ আমেরিকায়।

দুই

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। স্থান—নিউইয়র্ক।

গোয়েন্দা স্টুপস্ নিজের অফিসে বসে আছেন এমন সময়ে বেজে উঠল ফোনের ঘণ্টা।

শোনা গেল তাঁর স্ত্রী বলছেন, "সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের বাড়িতে চোর ঢুকেছে। তুমি শিগগির এসো।"

পুলিসের আস্তানায় চোর—বাঘের ঘরে ঘোগের আবির্ভাব! স্টুপস্ বাড়িমুখো হতে দেরি করলেন না।

যদিও চোরের পাত্তা পাওয়া গেল না, তবে এটা বেশ বোঝা গেল যে সে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছে। কারণ স্টুপসের কয়েকটা মেডেল আর মিসেস স্টুপসের একটা 'ফারে'র (পশু-লোমের) জামা ছাড়া সে আর কিছু নিয়ে যেতে পারে নি।

স্টুপস্ বললেন, "আমার পাল্লায় পড়ে জেল খাটতে হয়েছে অনেক পাজিকেই। নিশ্চয়ই তাদেরই কেউ প্রতিশোধ নেবার জন্যে আজ আমার বাড়িতে এসেছিল।

জনৈক প্রতিবেশী বললে, "সন্ধের পর আমি এই বাড়ির সুমুখ দিয়ে একটা লোককে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেতে দেখেছি। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারি নি, তবে আমি ভেবেছিলুম সে আমাদের পাড়ার সেই খোঁড়া লোকটা।

দুই চার দিন যেতে না যেতেই আবার এক কাণ্ড!

বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বার্গেস ফেলির বাড়িতে এক চুরি হয়ে গেল। যে সে চুরি নয়, একেবারে সাড়ে সতেরো হাজার টাকা দামের মাল উধাও। তার মধ্যে ছিল দামি পোশাক, মেয়েদের হাতঘড়ি, জড়োয়ার গয়না প্রভৃতি।

জানলা দিয়ে চোর বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল। মেঝের উপরে পাওয়া গেল চোরের কাদামাখা জুতোর দাগ। ছোট আকারের জুতো।

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "দিন দুই আগে একটা নতুন লোক আমাদের বাগানে কাজ করতে এসেছিল। তার উপরই আমার সন্দেহ হয়।"

লোকটাকে ধরে এনে তার জুতোর মাপ নেওয়া হলো। কিন্তু দেখা গেল, চোরের জুতোর চেয়ে তার জুতো মাপে বড়। সে বেচারা ছাড়ান পেলে।

কিন্তু এমন একটা-দুটো চুরি নয়, শহরে আর শহরতলিতে হঠাৎ লেগে গেল যেন চুরির হিড়িক। এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানে হচ্ছে চুরির পর চুরি, পুলিস কিছুতেই কিন্তু কোন কিনারা করে উঠতে পারছে না।

এই উপদ্রবে ছয় মাস ধরে ব্যস্ত হয়ে অপরাধ-বিভাগের বড়কর্তা হোলগার ক্রিস্টোফারসেন তার সহকারী গোয়েন্দাদের ডেকে বললেন, "কোনদিকেই আমরা এক-পা এগুতে পাচ্ছি না, অথচ কতকগুলো ব্যাপার বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এ-পর্যন্ত যে-সব মাল চুরি গেছে তার বেশির ভাগই হচ্ছে 'ফার', জড়োয়ার গয়না, ক্যামেরা, রেডিও বা গৃহস্থালীয় অন্যান্য উপকরণ। তার উপরে আছে আসবাবপত্তর পর্যন্ত! সন্ধ্যার সময়ে বাড়ির লোক যখন বাইরে থাকে চোরের আবির্ভাব হয় তখনই।

পাওয়া গেল আরো কোন কোন সূত্র। নানা স্থানেই চোরের পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গিয়েছে যে চোরের পায়ের মাপ হচ্ছে ছোট। প্রথমটা সন্দেহ হয় চোর হয়তো বয়সে বালক, কিন্তু তার পরই বোঝা যায়, বালকরা কখনও এমন পাকা অপরাধীর মতো চুরি করতে পারে না। তার আঙ্গুলের ছাপ পেলে পুলিসের কাজ যথেষ্ট সহজ হয়ে আসত, কিন্তু তা পাবার কোন উপায়ই নেই, কারণ চোর আসে হাতে দস্তানা পরে। অতি চতুর চোর!

ক্রিস্টোফারসেন বললেন, "অল্পদিনের মধ্যেই এরকম চুরি হয়ে গেছে পঞ্চাশটিরও বেশি। চোর বড় কম টাকার জিনিস নিয়ে যায় নি।"

কিন্তু কেবল কি এই রকম চুরি? চারিদিক থেকে খবর পাওয়া যায়, ঘরবাড়ি তৈরির মালমশলাও যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কেউ তা ধরতে পারছে না। মূল্যবান ভিনিসিয়ান পর্দা, খচিত

'লিনোলিয়াম', দরজার কড়া—এমন কি দরজা ও সার্সি বসানো জানালার 'ফ্রেম' পর্যন্ত চুরি যেতে আরম্ভ হয়েছে! 'প্লাম্বার' ও ছুতোরদের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক উপকরণ এবং আরো আগড়-বাগড়ও বাদ যায় নি!

গোয়েন্দাদের দৃঢ় ধারণা হলো, জন-কয় কালা-বাজারের ব্যবসায়ীই করছে এই সব কাণ্ড!

প্রায় বছরখানেক যায় চোর বা চোরের দল তবু ধরা পড়ে না। তারপর ঘটল একটা বিশেষ ঘটনা! দৈব ঘটনা বলাও চলে।

তিন

গার্টরুড ব্রাক্স্মা একটি বালিকার নাম, বয়স তার চৌদ্দ বৎসর। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়ে তার ঘুম পেলে। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। বাড়িতে তখন সে ছিল একলা।

বাড়ির বাইরে ঘরের জানালার তলায় হঠাৎ একটা সন্দেহজনক শব্দ হলো।

বালিকা সচমকে সুধোলে, "কে?"

আর কোন সাড়া নেই।

বালিকা ভয় পেয়ে ছুটে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সামনের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে হাজির। প্রতিবেশীর নাম হ্যারি টাকার।

বালিকা বললে, "আমাদের বাড়িতে চোর এসেছে!"

চারিদিকে চুরি হচ্ছে বলে সবাই তটস্থ। টাকার বললে, "চলো, তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি দেখে আসি।"

কিন্তু কেউ নেই কোথাও। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে টাকার দেখলে, একখানা ফোর্ড গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সে আগে গাড়িখানার নম্বর টুকে নিলে ১৪০-৮২১ এবং তারপর তাড়াতাড়ি নিজের মোটর বার করে 'ফোর্ডে'র অনুসরণ করলে।

একটু পরেই আগের গাড়িখানা পথের এক দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির ভিতর থেকে নেমে ভালো সাজপোশাক পরা একটি তরুণী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করলে। খানিকক্ষণ পরে সে দোকানের কাজ সেরে আবার গাড়ির উপরে এসে উঠল। গাড়ি আবার সচল—পিছনে পিছনে টাকারের গাড়িও!

কিন্তু একটা বড় রাস্তার মোড়ে ফোর্ড-গাড়িখানা এগিয়ে যেতেই 'ট্রাফিক' পুলিসের লাল আলো জ্বলে উঠল। টাকারকে বন্ধ করতে হলো নিজের গাড়ির গতি। ফোর্ড গাড়ি অদৃশ্য!

টাকার কিন্তু নাছোড়বান্দা! পথখোলা পেয়েই সে জোরে ছুটিয়ে দিলে নিজের গাড়ি। খানিকক্ষণ পরেই আবার দৃশ্যমান হলো আগের গাড়িখানা। চালকের সামনে বসে আছে একজন পুরুষ এবং তার পাশেই দেখা গেল সেই তরুণীটিকে। তাদের হাবভাব সন্দেহজনক।

টাকার ভাবলে, আর দেরি না করে পুলিসকে খবর দেওয়া উচিত। অনুসরণ ত্যাগ করে সে তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে এক ডাক্তারখানায় ঢুকে ফোনের সাহায্যে যথাস্থানে সব খবর দিলে।

ফোর্ডের নম্বর পেয়েই গোয়েন্দারা বেরিয়ে পড়ল বিপুল উৎসাহে। এতদিন পরে বোধহয় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে হয়রান হবার দায় থেকে নিস্তার পাওয়া গেল।

এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, তারপর আবার এক জায়গায় ছুটাছুটি করতে করতে বেজে গেল রাত দুটো। তবুও গোয়েন্দাদের উৎসাহ একটুও শ্রান্ত হয়ে পড়ল না। নিজেরাও না ঘুমিয়ে তারা লোকের পরে লোকের ঘুম ভাঙাতে লাগল। অবশেষে ১৪০-৮২১নং ফোর্ডের চালকের বা মালিকের নাম জানা গেল—লিওনার্ড!

চার

রাত দুটো। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার এবং নীরবতা। নির্জন পথঘাট।

গোয়েন্দারা লিওনার্ডের ঠিকানা পেয়েছে। সেই হচ্ছে ১৪০-৮২১ নম্বর ফোর্ডের চালক।

যথাস্থানে গিয়ে খানিকক্ষণ দরজার কড়া নাড়ানাড়ির পর একজন লোক চোখ কচলাতে কচলাতে ঘুমের ঘোরেই বেরিয়ে এলো।

গোয়েন্দারা প্রশ্ন করলে, "এখানে লিওনার্ড নামে কেউ আছে ?"

—"না।"

আবার ভেঙে পড়ল গোয়েন্দাদের মন। তবুও একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি লিওনার্ড নামে কারুকে চেনেন কি ?"

—"না, চিনি না। তবে শুনেছি আগে এই বাসায় লিওনার্ড নামে একজন লোক বাস করত।"

আবার উৎসাহিত হয়ে গোয়েন্দারা প্রশ্ন করলে, "সে এখন কোথায়, জানেন কি ?"

—"ঠিক জানি না। তবে শুনেছি সে 'পার্কার কংক্রিট কোম্পানি'তে কাজ করে।"

গোয়েন্দাদের একজন বললে, "আজ দেখছি রাজ্যের লোকের ঘুম ভাঙাতে হবে !"

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ডাকাডাকি করবার পর স্বয়ং পার্কারেরই আবির্ভাব হলো।

"আপনি লিওনার্ডকে চেনেন ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তার ঠিকানা জানেন ?"

লিওনার্ডের ঠিকানা দিয়ে পার্কার জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি ! লিওনার্ডকে নিয়ে কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে ?"

—"সেইটেই জানবার কথা। তার কি ফোর্ড গাড়ি আছে ?"

—"আছে।"

মহা আনন্দে গোয়েন্দাদের মন নেচে উঠল। তারপর লিওনার্ডের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হতে বিলম্ব হলো না।

একখানি ছোট্ট নতুন বাড়ি। তার সামনে খোলা জমির উপরে রয়েছে একখানা ফোর্ড মোটর।

গোয়েন্দাদের একজন বললেন, "ঐ দেখ সেই ফোর্ডখানা।"

আর একজন বাড়ির সদর দরজা ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, "লিওনার্ড! লিওনার্ড!"

স্তব্ধ অন্ধকার বাড়ির ভিতরে জ্বলে উঠল একটা আলো। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল একটা ছিপছিপে হালকা চেহারার লোক, পরনে তার রাতের পোশাক। চোখে ঘুমের আমেজ।

এমন সময়ে একটি দীর্ঘতনু তরুণী ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল

—"তোমার নাম কি লিওনার্ড!"

—"হ্যাঁ।"

গোয়েন্দারা বাড়ির মধ্যে ঢুকে একখানা ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। রকম-বেরকম আসবাব ও জিনিস দিয়ে ঘরখানা অতিরিক্তরূপে সাজানো।

চেয়ারের উপর থেকে একটা দামি 'ফার' বা পশুলোমের জামা তুলে নিয়ে একজন গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করলেন—"এটা তুমি কোথায় পেলে ?"

অম্লানবদনে ও সপ্রতিভভাবে লিওনার্ড বললে, "চুরি করে এনেছি।"

টেবিলের উপরে ছড়ানো রয়েছে সোনার ঘড়ি ও পিন প্রভৃতি। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গোয়েন্দা বললেন, "ওগুলো ?"

—"ওগুলোও চোরাই মাল। তোমরা এক বছর ধরে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ আমিই হচ্ছি সেই চোর।"

এমন সময়ে একটি দীর্ঘতনু তরুণী ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

—"ও কে ?"

—"আমার বউ। আমি যখন চুরি করতে বেরুই, আমার বউ তখন গাড়ি চালায়।"

গোয়েন্দাদের প্রশ্নের উত্তরে লিওনার্ড দস্তুরমত গর্বের সঙ্গে জানালে, "আমার এই বাড়ির তিনখানা ঘরের ভিতরে যত কিছু জিনিস আছে, সব চুরি করা। এমন কি এই বাড়িখানার আগাগোড়াই আমি তৈরি করেছি চোরাই মাল-মশলা দিয়ে। সমস্ত ব্যাপারের জন্যে আমার নিজের পকেট থেকে খরচ হয়েছে সতেরো টাকা আট আনা মাত্র!" টাকাটা অবশ্য আমেরিকান ডলারেই বলেছিল লিওনার্ড।

এমন স্পষ্টবাদী ও অদ্ভুত চোরকে দেখে গোয়েন্দারা যে চমৎকৃত হয়ে গেলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। চুরির ইতিহাসে অনেক রকম আজব চোরের কথাই পাওয়া যায়। কেউ কেউ শৌখিন চোর, শখের খাতিরে চুরি করে। কেউ বা দুর্লভ আর্টের উপকরণ সংগ্রহের জন্যে চুরি করে। আবার এমন চোরও দেখা গিয়েছে, যারা চুরির টাকা

দান করে দীন-দুঃখীদের সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু নিজের হাতে চুরি-করা মাল-মশলা দিয়ে একখানা গোটা বাড়ি প্রস্তুত করে সাজাতে পেরেছে, এমন চোরের কথা কখনো শোনা যায় নি।

লিওনার্ড ধরা পড়বার পর পুলিসের অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পেলে অনেক তথ্যই।

লিওনার্ডের বয়স একচল্লিশ বৎসর। এর মধ্যে আরো চারবার চুরি করে ধরা পড়ে সে জেলখানার ভিতরেই বাস করেছে মোট বিশ বৎসর!

এবারে ধরা পড়বার আগে এক বৎসরের মধ্যে সে চুরি করে সফল হয়েছে মোট আটষট্টি জায়গায়!

ধরা পড়বার ভয়ে সে বাড়ির ভিতরে বাইরের কোন লোককেই ঢুকতে দিত না। পাছে ইলেকট্রিক কোম্পানির লোক মিটার দেখবার জন্যে বাড়ির ভিতরে আসে, তাই সে লুকিয়ে অন্য বাড়ির তারের সঙ্গে তার সংযোগ করে নিজের বাড়িতে আলো জ্বালায়। তাই এই গুপ্ত তারটি সে স্থাপন করেছিল মাটির তলায়।

হিসাব করে দেখা গেল, লিওনার্ড যে সব জিনিস চুরি করেছে তার মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা। এর উপরেও আরো কত টাকার জিনিস ইতিমধ্যেই সে কালা-বাজারে বিক্রি করে ফেলেছিল, হিসাবে তা প্রকাশ পায় নি।

বাড়ির তিনখানা ঘরের ভিতরে এত চোরাই মাল ঠেসে রাখা হয়েছিল যে, সেগুলো স্থানান্তরিত করার জন্যে দরকার হলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লরি। এ-ঘরে সে-ঘরে যেখানে-সেখানে ছড়ানো ছিল জড়োয়ার জিনিস।

পুলিস এসেই যে পশুলোমের জামা, সোনার ঘড়ি ও পিন পায়, লিওনার্ড সেগুলো চুরি করেছিল ধরা পড়বার দিনেই।

লিওনার্ড বললে, "চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা নয়। চোর হয়ে আমি ভুল করেছি।

"শহরে বসতবাড়ির বড় অভাব। মাথার উপরে কোন আচ্ছাদন না পেয়ে শেষটা আমরা স্থির করলুম যে, চোরাইমাল দিয়ে নিজেদের বাড়ি নিজেরাই তৈরি করব। আমি যে-সব চোরাইমাল জোগাড় করেছি তার কোনটাই খেলো বা বাজে নয়। সব পয়লা নম্বরের।

"আমি অনেক জড়োয়া গহনা চুরি করেছি বটে, কিন্তু প্রায়ই সেগুলো হাতুড়ির ঘা মেরে চুরমার করে ফেলতুম। এর কারণ চোরাই জড়োয়ার জিনিস বাজারে বেচতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। একবার এক দাসীকে আমি একখানা হীরা দান করেছিলুম, তার দাম হাজার ডলার!

গোয়েন্দা স্টুপসের বাড়িতে আমি চুরি করতে ঢুকেছিলুম না জেনেই। কিন্তু যেই টের পেলুম সেটা পুলিসের বাড়ি তখন সরে পড়তে দেরি করি নি। ওখান থেকে চুরি করা পশুলোমের জামা আর মেডেলগুলো আমি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। পুলিসের বাড়ি অপয়া কারণ সেইদিন থেকেই আমাকে নানারকম দুর্ভাগ্যের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে।

"রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমি দুঃস্বপ্নে শুনেছি পুলিসের পায়ের শব্দ। যাক্, এখন আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হলো,—কখন ধরা পড়ি বলে আর আমাকে ভেবে মরতে হবে না।

আদালতে লিওনার্ডের বিরুদ্ধে আনা হলো পাঁচটি অভিযোগ। ঐ পাঁচটি মামলার জন্যে তার উপরে মোট বিশ বৎসরের কারাবাসের হুকুম হলো।

পুলিস লিওনার্ডের চল্লিশ বছরের বউকেও আদালতে হাজির করেছিল। কিন্তু যখন এই ঘটনার বিবরণ লেখা হয় তখনও তার বিচার শেষ হয় নি। সেই মামলার ফলাফলের উপরেই নির্ভর করেছে চোরাই বাড়ির ভবিষ্যৎ।

তিন নম্বরের ঘর

এক

বেড়াতে এসেছি। পুরী। আমি আর শচীন দুই বন্ধু।

সমুদ্রের গায়ে একটি হোটেল ছিল—"সাগর-পুরী।" শচীন আগে আর একবার এই হোটেলে এসে উঠেছিল। এবারেও সে আমাকে নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হলো।

"সাগর-পুরী"র ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তাঁর হোটেলের কোন ঘরই খালি নেই।

শচীন বললে,—"মশাই, আমি আপনাদের পুরোনো খদ্দের। কিন্তু এখানে যখন ঠাঁই নেই, তখন আমাকে বাধ্য হয়েই অন্য হোটেলে যেতে হবে।"

ম্যানেজার বললেন,—"এবারকার পুজোর মরসুমে পুরীর কোন হোটেলেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। যাবেন কোথায়?"

শচীন হতাশ ভাবে বললে,—"তা হলে উপায়?"

ম্যানেজার খানিক ভেবে বললেন—"আপনি যখন পুরোনো খদ্দের, তখন উপায় একটা করতে পারি। কিন্তু একটু কষ্ট হবে।"

শচীন বললে,—"হোক কষ্ট। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে চেনা জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন সরছে না।"

ম্যানেজার বললেন,—"আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছোট এক-খানা কুঠরী আছে। সেখানে থাকতে পারবেন?"

শচীন বললে,—"খুব পারব।"

ম্যানেজার বললেন,—"তবে আসুন।"

একখানা কয়লা রাখবার কুঠরীর মতো খুব ছোট্ট ঘর। সমুদ্রের ধার, তবু সেখানে আলো-হাওয়া ঢোকে না। তার বদলে সর্বদাই

সেখানে রান্নাঘরের নানারকম গন্ধ, ধোঁয়া আর উত্তাপ এসে ঢোকে।

বৈকাল হতে-না-হতেই শচীনের সহ্যশক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। মাথা নেড়ে বললে,—উঁহু, এ অসম্ভব। আমরা কেউ ইঁট কি পাথর নই। এখানে থাকলে মারা পড়ব।"

আমি বললুম,—"তাহলে কোথায় যাবে?"

শচীন বললে,—"যেখানে মানুষ থাকে। গেল-বারে এই হোটেলের সব-চেয়ে ভালো ঘরে আমি ছিলুম। এবারেও সেই ঘরে থাকতে সাধ হচ্ছে।"

আমি বললুম,—"তোমার সাধ চাঁদ ধরবার সাধের মতো। এ-সাধ মিটবে না, কারণ সে ঘর এখন অন্য লোকের দখলে।"

শচীন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে,—"সেই তো হচ্ছে সমস্যা!"

তখন বেলা সাড়ে-পাঁচটা, উপর থেকে চা-পান করবার জন্যে ঘণ্টার আওয়াজ এলো।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"চল, খানিকক্ষণ ভালো ঘরে গিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে আসি!"

দুই

খাবার ঘরের জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘের পর মেঘ জমেছে।

চা-পান শেষ হবার আগেই সারা আকাশ মেঘের কাজলে এমন কালো হয়ে গেল যে, তার ছায়ায় সমুদ্রের গায়ে নীল-রঙের একটুও চিহ্ন রইল না। চারিদিকে অকাল-সন্ধ্যা নেমে এলো, তারপরেই বাজের বাজনা আর বিজলীর রোশনাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি শুরু।

টেবিলের ধারে বসে যাঁরা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন, একে একে তাঁদের অনেকেই অদৃশ্য হলেন। আমরা দুজন ছাড়া আরো যে-তিনজন লোক তখনো স্থান ত্যাগ করলেন না, তাঁদের

একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন সওদাগরী অফিসের মাঝবয়সী বড়বাবু, আর একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন স্কুলের বুড়ো মাস্টার মশাই এবং আর একজন হচ্ছেন কলকাতার কোন কলেজের নব্য-ছাত্র।

জল-ঝরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম,—"এমনি বাদলার দিনে ভূতের গল্প বেশ জমে।"

নব্য ছাত্রটি নাক সিঁটকে বললেন,—"আমি ভূত মানি না।"

মাঝবয়সী বড়বাবু বললেন,—"আমি ভূত মানি। ভূতকে ভয় করি। আমার বুকের ব্যামো আছে,—ভূতের গল্প শুনলে বুক ঢিব্, ঢিব্ করে।"

বুড়ো মাস্টার মশাই বললেন,—"আমি ভূতের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসি। কিন্তু সত্যি ভূতের গল্প।"

শচীন এতক্ষণ কি-যেন ভাবতে ভাবতে অপলক চোখে বড়বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। এখন হঠাৎ—মুখ খুলে বললে,—"আমি একটা খুব সত্যি ভূতের গল্প বলতে পারি। এ-ভূতটাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু উনি যে ভূতকে ভয় করেন—তার ওপরে ওঁর নাকি আবার বুকের ব্যামো!"

বড়বাবু বুকে হাত দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, অনেক দিনের ব্যামো। সত্যি ভূতের গল্প শুনলে হয়তো ভিরমি যাব।"

নব্য ছাত্রটি বাঁকা চোখে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আমি ভূত মানি না,—কিন্তু সময় কাটাবার জন্যে ভূতের গল্প শুনতে রাজি আছি।"

মাস্টার মশাই বললেন,—"ভোটে গল্প শোনার লোকই বেশি হলো। আপনার সত্যি ভূতের গল্পটি বলুন।"

চাকর ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। বড়বাবু হতাশ চোখে একবার সকলের মুখের পানে তাকিয়ে, চেয়ার টেনে একেবারে আলোর কাছে সরে গিয়ে বসলেন।

শচীন গল্প বলতে লাগল। আকাশও তখন মেঘ-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির গল্প ভালো করে জমিয়ে তুলেছে!

তিন

"গল্পের নায়ক হচ্ছি আমি। কিন্তু গল্পের ঘটনাস্থলের নাম আমি বলব না। সত্যি ভূতের গল্পে ঘটনাস্থলের নাম বলতে নেই। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, এই গল্পের ভূতটিকে দেখেছিলুম এই হোটেলেরই মতন আর একটা হোটেলে।"

বড়বাবু চমকে উঠে বললেন, "তাই নাকি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেবারেও আমি পুজোর সময় বেড়াতে বেরিয়ে সেই হোটেলে গিয়ে উঠেছিলুম। আমি যে ঘরখানি পেলুম সে-খানি বেশ বড়-সড়। তার পাঁচটা জানলা আর দুটো দরজা। ঘরখানি হোটেলের দোতলায়, আর ঠিক সিঁড়ির ডান পাশে।"

বড়বাবু বিড় বিড় করে বললেন,—"হোটেলের দোতলায়, সিঁড়ির ডান পাশের ঘর—"

—"হ্যাঁ। ঘরের ভিতরকার বর্ণনাও একটু দিতে হবে—সত্যি গল্প কিনা! দক্ষিণ দিকে ছিল একখানা লোহার খাট। আর একদিকে দুটো দেয়াল-আলমারি। আর একদিকে ছিল চৌকো আয়না-বসানো একটা 'ড্রেসিং-টেবিল'। তার সামনে একখানা কাঠের চেয়ার। সে ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারও ছিল। একটা দরজার মাথায় কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাড়া আর কোথাও কোন ছবি ছিল না।"

মাস্টার মশাই অধীরভাবে বললেন,—"ভূত কোথায় মশাই, ভূত কোথায়? এত ঘরের বর্ণনা কেন?"

—"যদিও ঘটনাস্থলের নাম বললুম না, তবু ঘরের বর্ণনাটা শুনে রাখুন। বিদেশের কোন হোটেলে এ রকম ঘর দেখলে আগে থাকতেই সাবধান হতে পারবেন।……এখন শুনুন। সে ঘরখানার ভিতরে

দিনের বেলাটা আমার দিব্যি আরামে কেটে গেল। কিন্তু ঘরের ভেতরে সন্ধ্যার অন্ধকার যেই নেমে এলো,—অমনি কেন জানিনা, আমার মনটা কেমন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করতে লাগল! সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অজানা ভয় পা টিপে টিপে সেই ঘরের ভেতরে এসে ঢুকে পড়ল। যেন অদৃশ্য একটা বিভীষিকা ছায়ার মতন আমার পিছনে ফিরতে লাগল। যেন দেখা যাচ্ছেনা এমন দুটো স্থির আড়ষ্ট চোখ ড্যাব্ ড্যাব্ করে আমার পানে তাকিয়ে রইল তো তাকিয়েই রইল!

আমি ভীতুলোক নই, তবু কিছুতেই মন থেকে এই ভয়-ভয় ভাবটা তাড়াতে পারলুম না। মনকে প্রবোধ দিলুম, অন্যমনস্ক হবার জন্যে বার-বার চেঁচিয়ে গান গাইতে লাগলুম, কিন্তু মন আমার শান্ত হলো না। তখন তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ে এই অজ্ঞাত ভয়টাকে ভোলবার চেষ্টা করলুম।

ঘুম আমাকে সব ভুলিয়ে দিলে বটে—কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। গভীর অন্ধকারের ভিতরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল! জেগে উঠেই বুঝলুম, আমার ঘুম স্বাভাবিক ভাবে ভাঙেনি। ঘরের ভিতরে একটা কিছু বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে—এই কথাটাই তখনি আমার মনে হলো!

শচীন এইখানে থামল। বাইরে তখন অবিরাম চলেছে বজ্রের হুঙ্কার, সমুদ্রের গর্জন, বৃষ্টিধারার কান্না ও ঝোড়ো হাওয়ার হাহাকার। দমকা বাতাস মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরেও এসে ঠাণ্ডা জলের ছিটে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

মাস্টার মশাই রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন,—"ওকি মশাই, এমন জায়গায় এসে থামলেন কেন?"

বড়বাবু দুই চোখ মুদে বললেন,—"আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে!"

ছাত্রটি বললেন—"আমি ভূত মানি না।"

শচীন আবার আরম্ভ করলে,—"কোথাও একটি পাতা-নড়ার শব্দও নেই এবং রাত করছে ঝাঁ ঝাঁ! আগেই বলেছি, আমার ঘুম ভাঙল

গভীর অন্ধকারের ভিতরে। কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, সে অন্ধকার কালো অন্ধকার নয়, সে যেন আলোময় অন্ধকার। কারণ ঘরে বাতি জ্বলছিল না, খোলা জানলা দিয়ে একটুও চাঁদের কিরণ আসছিল না, তবু অন্ধকারের ভিতরেই বায়স্কোপের ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঘরের সেই 'ড্রেসিং-টেবিল'টা! স্তম্ভিত ভাবে দেখলুম, টেবিলের আয়নার সামনে, আমার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারের উপরে বসে আছে একজন লোক! আয়নার ভিতরে তার মুখও আমি দেখতে পেলুম—সম্পূর্ণ অচেনা মুখ! তার নাকের তলায় দুর্গা-ঠাকুরের অসুরের মতন মস্ত বড় গোঁফ আর তার ভয়ঙ্কর দুটো চোখ

সেই খুর দিয়ে নিজের গলা সে নিজেই কাটছে

যেন জ্বলন্ত ভাটার মতো! তার ডান হাতে একখানা চকচকে খুর,—আর সেই খুর দিয়ে নিজের গলা সে নিজেই কাটছে! হঠাৎ ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক দৃশ্যটা আবার মিলিয়ে গেল! ঘর আবার অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন ড্রেসিং টেবিলের দিক থেকে আমার বিছানার

দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে! আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, একলাফে বিছানা ছেড়ে নেমে, কোনরকমে দরজা খুলে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেলুম!

পরের দিন সকালে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম, সেই হোটেলের তিন নম্বরের ঘরে একজন লোক আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার আমার কাছে কোন মতেই সে কথা স্বীকার করলে না!"

বড়বাবু হঠাৎ চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চিঁ চিঁ করে বললেন,—"আমার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। এই রে, আমি ভিরমি যাব।"

মাস্টার মশাই আর নব্য ছাত্রটি ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"দেখচি ওঁর সামনে ভূতের গল্প বলা আমার উচিত হয় নি।"

চার

রাত তখন সাড়ে নয়টা। আমি আর শচীন আমাদের অন্ধকূপে বসে আছি, এমন সময় হোটেলের একটা চাকর এসে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললে,—"ম্যানেজারবাবু দিলেন।"

কাগজে ম্যানেজারবাবু লিখেছেন:

"হোটেলের তিন নম্বরের ঘর হঠাৎ খালি হয়েছে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিন নম্বরের ঘরে উঠে আসতে পারেন।"

শচীন দুষ্টুমির হাসি হাসতে হাসতে বললে,—"এ আমি আগেই জানতুম!"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কেমন করে?"

শচীন বললে,—"হোটেলের দোতলায়, সিঁড়ির ডানপাশের ঐ তিন নম্বরের চমৎকার ঘরখানিতে আমি গেলবারে এসে থেকে

গিয়েছি। আজ দুপুরেও ও-ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসেছি, ও-ঘরের আসবাবগুলো ঠিক আগেকার মতোই সাজানো আছে। ঐ ঘরেই বড়বাবু ছিলেন।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, তুমি একটি আস্ত গাড়ল! এতক্ষণেও এটা বুঝলে না যে, বড়বাবুকে তাড়াবার জন্যেই আমার ভূতের গল্পে তিন-নম্বরের ঘরের বর্ণনা স্থান পেয়েছে?"

—"তাহলে তোমার সত্যি ভূতের গল্পটা—"

—"একেবারে গাঁজাখুরি।"

সূত্র কুত্র

সাধারণত গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখকরা কাল্পনিক গোয়েন্দাদের এমন সর্বশক্তিমান করে তোলেন যে, সত্যিকার গোয়েন্দা তাঁদের কাছে হেরে যান পদে পদে। অথচ অনেক সময়ে সত্যিকার গোয়েন্দাদের কার্যে এমন চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা অতুলনীয় বলা চলে অনায়াসেই।

কাল্পনিক গোয়েন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা হচ্ছেন 'শার্লক হোম্‌স্।' যে সব তুচ্ছ '**clue**' বা সূত্র, সরকারী—অর্থাৎ সত্যিকার গোয়েন্দাদের দৃষ্টি নাকি এড়িয়ে যায়, শার্লক হোম্‌স্ সেগুলির সাহায্যেই তালেবর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে দস্তুরমত বাহাদুরি দেখাতে পারেন।

কিন্তু সূত্র না পেলে? শার্লক হোম্‌স্ হন নিতান্ত নিঃসহায়। কিন্তু সূত্র না পেলেও সরকারি গোয়েন্দারা অন্ধকারের মধ্যেও যে আলোকের সন্ধান পেতে পারেন, নিম্নলিখিত সত্য কাহিনীটি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

ঘটনার কাল, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। স্থান, জার্মানীর বার্লিন শহর।

দুই

বার্লিনের রাজপথের উপরে একখানা প্রকাণ্ড সাততলা-উঁচু অট্টালিকা। তার ফটক (বা সদর দরজা) থাকে দিনে রাতে সব সময়ই বন্ধ। ফটকের গায়ে আছে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার চাবি। কেউ ডাকতে এলে সেই চাবি টিপতে হয়। তখন ফটকের গায়ে একটি ছোট পার্শ্ব-দরজার একখানা পাল্লা খুলে যায়। ভিতর থেকে দ্বারবান

আগে উঁকি মেরে আগন্তুককে সন্দিগ্ধ চোখে পরীক্ষা করে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে আগন্তুককে সেই পার্শ্ব-দরজা দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।

কিন্তু তখনও যাকে ডাকতে আসা হয়েছে, তাঁর দেখা পাওয়া সহজ হয় না। যে ভৃত্যের উপরে থাকে Lift বা উত্তোলন-যন্ত্রের ভার, সে আগে যথাস্থানে গিয়ে খবর নিয়ে আসে, আগন্তুককে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা? গৃহস্বামী সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম ও উদ্দেশ্য শুনে সম্মতি না দিলে আগন্তুককে বিদায়গ্রহণ করতে হয় ধুলোপায়েই।

এ বাড়ির বাসিন্দারা পুলিসের সন্দেহভাজন নন, তবু এতটা কড়াক্কড়ির কারণ কি? এখানে বাস করেন এমন সব ব্যক্তি, যাঁদের উপরে ছোঁ মারবার জন্যে অপরাধীরা সর্বদাই ওৎ পেতে থাকে।

এইখানেই রাস্তা থেকে চারতলা উপরে সাতখানা ঘরওয়ালা একটা "ফ্ল্যাট" ভাড়া নিয়ে থাকেন ডাঃ কর্ণস্টফ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ রত্ন-বিশেষজ্ঞ, বিখ্যাত জহুরীদের জন্য রত্ন পরীক্ষা করাই তাঁর কাজ। তাঁর কাছে সর্বদাই থাকে নানা শ্রেণীর মহামূল্য রত্ন।

ডাঃ কর্ণস্টফ চিরকুমার। তাঁর নেই কোন দোসর। একজন বেয়ারা ও একজন পাচক তাঁর গৃহস্থালীর কাজ করে বটে, কিন্তু তারা হচ্ছে ঠিকা লোক। রাত্রে তাদের বিদায় করে তিনি স্বহস্তে নিজের দরজা বন্ধ করে দেন।

তিন

এক সকালে বেয়ারা ও পাচক এসে কড়া নেড়ে নেড়ে হয়রান হয়ে পড়ল, তবু ডাঃ কর্ণস্টফের ঘরের দরজা খুলল না।

ভয় পেয়ে তারা থানায় খবর দিলে। পুলিস এসে দেখলে, ভিতরে ঢুকবার অন্য কোন উপায়ই নেই। তখন বাধ্য হয়ে তারা ভেঙে ফেললে দরজা। ভিতরে প্রবেশ করে দেখা গেল ভয়াবহ দৃশ্য।

ডাঃ কর্ণস্টফ নিহত! ঘরের মেঝের উপরে তাঁর মৃতদেহ পড়ে

রয়েছে, তাঁর কপালের উপরে কেউ কোন ভোঁতা জিনিস দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করেছে, কিন্তু অস্ত্রটার খোঁজ পাওয়া গেল না।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সেই চারতলা-উঁচু ঘরের ভিতরে গবাক্ষপথে প্রবেশ করাও অসম্ভব এবং কেউ প্রবেশ করলেও জানলার চৌকাঠের আশেপাশে ধূলার উপরে তার পদচিহ্ন পাওয়া যেত। কোথাও কারুর হাতের আঙুলেরও ছাপ নেই। বাড়ির তাবৎ লোকজন ও দাসদাসীর কুলজী ও পূর্ববৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হলো। ঘাঁটির পাহারাওয়ালাও সে রাত্রে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখেনি। খুনের উদ্দেশ্যও খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ ঘরের ভিতর থেকে একখণ্ড রত্নও অদৃশ্য হয়নি এবং ডাঃ কর্ণস্টফ হচ্ছেন অজাতশত্রু।

এ মামলার ভার পেলে কাল্পনিক গোয়েন্দাদের শিরোমণি শার্লক হোম্‌স্ পর্যন্ত তাঁর সহচরকে ডেকে হতাশ ভাবে বলতেন, "ওয়াটসন, কোন সূত্রই নেই যে! আমি হার মানলুম!"

চার

কিন্তু বার্লিনের সরকারি পুলিস হার মানতে নারাজ! তারা বললে, "কোন সূত্র নেই? বহুৎ আচ্ছা! তাহলে এ মামলার কোন সূত্রই নেই, এইটেই হচ্ছে প্রধান সূত্র!"

সত্যিকার গোয়েন্দা মাথা ঘামিয়ে বললেন, "খুঁজে দেখ সেই সব অপরাধীকে, যারা ঘটনাস্থলে কোন সূত্রই রেখে যায় না।"

পুলিসের সবাই জানে, এক এক শ্রেণীর অপরাধী এক এক বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করে। জার্মান পুলিসের কাছে আছে দুই কোটি কার্ড। এক এক কার্ডে আছে এক এক অপরাধীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ—কে কোন্ শ্রেণীর অপরাধী এবং কে কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করে, এই সব কথা।

গোয়েন্দা বললেন, "ডাঃ কর্ণস্টফকে যে খুন করেছে, সমস্ত সূত্র লুপ্ত করে দেবার কৌশল সে জানে। দুই-চারি দিনে এমন কৌশলী

হওয়া যায় না। সুতরাং সে যে পুরাতন পাকা অপরাধী, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। পুলিসের record বা নথি খুঁজলে নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাওয়া যাবে।"

নথি হাতড়াতে হাতড়াতে একটি ঘটনা পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ডার্মস্টাডট্ শহরে একটি দুর্ভেদ্য বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছিল। চোর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল ছাদের উপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে।

বার্লিনের পুলিসও ধরলে এই সূত্রের খেই। কর্ণস্টফের সাত-তলা বাড়ির ছাদের উপরটা তারা পরীক্ষা করতে গেল। য়ুরোপের অধিকাংশ বাড়ির গড়ানে ছাদের উপরের ধোঁয়া বেরুবার চিম্‌নি—এখানেও তাই ছিল। দেখা গেল, চিম্‌নির গায়ে রয়েছে ঘষড়ানির চিহ্ন! পুলিস সেটা দড়ির দাগ বলেই স্থির করলে।

কিন্তু একে কর্ণস্টফের বাড়ির কোন দিকেই অন্য কোন বাড়ি নেই, তার উপরে এই অট্টালিকাখানা হচ্ছে সাততলা উঁচু। নীচে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে কেউ কি মানুষের ভার সইতে পারে, এমন মোটা দড়ি ছাদের উপরে যথাস্থানে নিক্ষেপ করতে পারে?

পুলিসই এই সমস্যা-সমাধানের ভার গ্রহণ করলে।

প্রথমে তারা একগাছা সরু ফিতার ডগায় একখানা পাথর বেঁধে নিলে। বার-কয়েক চেষ্টার পর রাস্তা থেকে ছুঁড়ে সেই ফিতাগাছা ফেলা হলো ঠিক ছাদের চিমনির উপরে। তারপর চিমনিকে বেষ্টন করে সেই ফিতাগাছ পাথরের ভারে ঢালু ছাদের উপর দিয়ে আবার রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর সেই ফিতার সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে ছাদের উপরে তুলে আবার রাস্তায় নামিয়ে আনা হলো। তারপর সেই দড়ির সাহায্যে একজন গোয়েন্দা ছাদের উপরে গিয়ে উঠল।

তখন পুলিসের মানসনেত্রের সামনে জেগে উঠল জনৈক চোরের আবছা-আবছা মূর্তি। সে পরের বাড়ির ভিতরে অনধিকার প্রবেশ

করবার জন্যে এক নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। খুব সম্ভব পূর্বজীবনে তার এমন কোন পেশা ছিল, যার জন্যে তাকে কাজ করতে হোত খুব উঁচু জায়গায় উঠে। হয়তো সে ছিল রাজমিস্ত্রী বা ঐ-রকম আর কিছু।

পাঁচ

সেইরকম কোন চোরের সন্ধানে আবার নথি-পত্র ঘাঁটা শুরু হলো। পাওয়া গেল ঐ শ্রেণীর দশ জন দাগী আসামীর সন্ধান। তাদের মধ্যে দুইজন মৃত; তিনজন জেল খাটছে এবং পাঁচজন স্বাধীন।

পুলিস খোঁজখবর নিয়ে দুইজনকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দিলে। বাকি রইল তিনজন এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে একজনকে নিয়ে গোয়েন্দারা মাথা ঘামাতে লাগল।

তার নাম জোহান। সে আগে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। পরে ধরে চুরি-ব্যবসায়। বয়স ঊনত্রিশ বৎসর। হামবার্গ শহরের এক বাড়ির তিনতলা ঘরে ঢুকে চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে এবং জেল খাটে। মুক্তি পেয়ে এখনো সে অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ছাড়েনি।

পুলিস জোহানকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

কিন্তু এক ছোকরার সন্ধান পাওয়া গেল, নাম তার ফ্রিট্জ। বয়স আঠারো বৎসর। সে এখনো জেলে যায়নি বটে, কিন্তু দাগী অপরাধীরা তাকে দিয়ে প্রায় ফাই-ফরমাশ খাটিয়ে নিত। প্রকাশ পেলো জোহানের সঙ্গে তার ছিল খুব দহরম-মহরম। পুলিস তারই পিছু ধরলে।

একটা কফিখানা ছিল, সেখানে আড্ডা দিত যত চোর আর বদমাশ। দেখা গেল, ফ্রিট্জ রোজই কফিখানার একটা পিছনকার ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে এবং খানিক পরে আবার বেরিয়ে আসে।

পুলিসের একটা চর একদিন মাতলামির ভান করে ফ্রিট্জের পিছু পিছু সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঘরের মধ্যে নেই জনপ্রাণী!

কফিখানার মালিক হাঁ হাঁ করে তেড়ে এলো—"ও ঘরে তুই কেন রে? মেরে গতর চূর্ণ করে দেব তা জানিস?"

খানিক পরে দেখা গেল, ফ্রিট্জ আবার সেই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো!

ছয়

তখন ফ্রিট্জকে ধরে শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ।

—"কে আছে ও ঘরে? কোথায় সে লুকিয়ে আছে?"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফ্রিট্জ বললে, "আমি জেলে যাব তবু বলব না! তাহলে সে আমাকে খুন করবে!"

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে গোয়েন্দারা গেল সেই ঘরের ভিতরে। তন্ন তন্ন করে খোঁজবার পর আলমারির তলায় মেঝের উপরে পাওয়া গেল একটা কাটা-দরজা। তার তলায় চোরকুঠরি!

—"কে আছ ওখানে? সাড়া দাও!"

কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। একখানা মই আনিয়ে পাহারা-ওয়ালারা নীচে নামতে লাগল।

কিন্তু তারপরেই রব উঠল—"পালাও, পালাও!"

পাহারাওয়ালারা হুড়মুড় করে উপরে উঠে মেঝের উপরে পড়ে বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল!

—"ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?"

—"গ্যাস! গ্যাস!"

নতুন একদল পাহারাওয়ালা এলো অনতিবিলম্বে। তাদের সকলেরই মুখে গ্যাসের মুখোশ। তারা ইলেকট্রিক টর্চ জ্বেলে আবার চোরকুঠরির ভিতরে নামতে লাগল। প্রতিপদেই তাদের আশঙ্কা, এই বুঝি কোন মরীয়া আততায়ী রিভলভার থেকে গুলিবৃষ্টি করে!

সেখানে পাওয়া গেল যাতনায় কুঁকড়ে পড়া একটা মানুষের দেহ

কিন্তু কেউ রিভলভার ছুঁড়লে না। সেখানে পাওয়া গেল যাতনায় কুঁকড়ে-পড়া একটা মানুষের দেহ। তারও মুখে গ্যাসের মুখোশ।

দেহটাকে উপরে তুলে আনা হলো। মুখোশের তলায় ছিল জোহানের মুখ! মারাত্মক ক্লোরিণ গ্যাসের সাহায্যে সে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল; কিন্তু পারলে না। কারণ তার মুখোশটা ছিল ছ্যাঁদা।

জোহান বাঁচল না। কিন্তু মারা পড়বার আগে স্বীকার করলে নিজের অপরাধ। ডাঃ কর্ণস্টফের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই সে নাকি তাঁকে খুন করতে বাধ্য হয়। তারপর ভয় পেয়ে কিছু চুরি না করেই সে পালিয়ে আসে।

এক

প্রথম দৃশ্যের যবনিকা-অন্তরাল ভেদ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেটুকু দৃশ্যপট ভেসে উঠতে দেখা গেল, তাতে কোন আনন্দ-মুখর উৎসাহ-দীপ্তির বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ নেই, কোন ভয়াবহ বিভীষিকার নির্মম-নগ্ন পদক্ষেপও বুঝি চোখে পড়ে না ; কেবল একটা সন্দিগ্ধ আশঙ্কার ছায়া-সঞ্চরণ অনুভব করা যায় কিন্তু কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায় না কিছু। বহু-সংশয়িত একটা গূঢ় জিজ্ঞাসা যেন অশরীরী প্রেতের মতো অস্পষ্ট রহস্যের অন্ধকার গবাক্ষদ্বারে বারে বারে অলক্ষ্যে হানা দিয়ে চলে যায়, আর, আকাশ বাতাস অন্ধকার, যেন কোন নিগূঢ় চাপা আতঙ্কে অন্তরের অন্তস্তলে থেকে থেকে শিউরে ওঠে !

মহানগরী কলকাতার উত্তর-অঞ্চলের ঐ যে স্বল্প-আলোকিত অন্ধ গলি ; বাইরের পৃথিবী অজস্র তরঙ্গভঙ্গে উদ্দাম স্রোতোবেগে বয়ে চলেছে ; কিন্তু এখানে এসে আছড়ে পড়ে ব্যাহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় ব্লাইণ্ড-লেনে সামান্য একটু আবর্ত সৃষ্টি করে। এই অন্ধ-গলিতে জনশব্দশূন্য একখানা বিরাট পুরোনো বাড়ি,ছোট্ট কপাটওয়ালা দরজাটা খুললেই মনে হয় কোন বুভুক্ষু বিবর বুঝি লোলুপ জিঘাংসায় হাঁ করে সব কিছু আকর্ষণ করতে চায়। নীচের নিস্তব্ধ স্যাঁতসেঁতে

ঘরের জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন পাতালপুরীর দুর্গম সুড়ঙ্গ পথের নির্দেশ দেয়। কোলাহল-মুখর সন্ধ্যার কলকাতা এই অন্ধ-গলিতে ঐ বোবা দরজাটার চৌকাঠে যেন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে মরে গিয়েছে।

বাড়িখানা দোতলা, নীচের ঘরে কেউ থাকে না; উপরেও যদিবা কেউ থাকে তাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। দোতলায় ভিতর দিকের কোন একখানা সুসজ্জিত হল ঘর। ঘরটা অন্ধকার, একটা দেওয়াল-ঘড়ির একঘেয়ে টক্-টক্ শব্দ অশ্রান্ত কালপ্রবাহের সূচনা দিচ্ছে মাত্র। এই সমূহ মূর্ছাহত আবেষ্টনীর মধ্যেও কোথাও যেন এখনও প্রাণ আছে, ঐ টক্-টক্ একটানা শব্দ যেন তারই বিমূঢ় স্পন্দন। ঘরের প্রতিটি টেবিল চেয়ারে, আয়না আলমারিতে, ড্রয়ার দেরাজে, সমস্ত আসবাব-পত্রে কত জটিল ষড়যন্ত্র কুটিল চক্রান্ত অসংখ্য গুপ্তনাগিনীর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে—হাতলে-পায়ায় রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরতে-পরতে! কত গূঢ় অভিসন্ধি ক্রূর সংকল্পে বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে চাপা আক্রোশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, ঘরের নির্বাক কড়ি-বরগা জানলা দেওয়াল ভিন্ন কেউ তার সাক্ষ্য বহন করে না।

ঘরখানা অন্ধকার, পিচের মতো ভারী অন্ধকার। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে। মানুষ তো? তবে কি অন্ধকার নিঃশ্বাস ফেলে? না, আর কিছু? মেঝের উপর একটু খস্ করে জুতোর সংঘর্ষ হলো। আচম্বিতে সুইচ টেপার শব্দের সঙ্গেই বিজলী আলো সমস্ত ঘরটাকে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মূর্ছা ভেঙ্গে দিল। চোখ মেলতেই দেখা গেল উৎকণ্ঠিত চিন্তায় ভ্রূ-যুগল সঙ্কুচিত করে একটা লোক দেওয়ালে ঘড়ির দিকে তাকালো; এবং দৃঢ় নিবদ্ধ চিবুকের মধ্যে থেকে চাপা নিশ্বাসে একটা গম্ভীর 'হুঁ' শব্দ করে রেডিওর চাবিটার দিকে হাত বাড়ালো। বোবা বাড়িটা চমকে উঠে রেডিওর কথায় মুখর হয়ে উঠলো। একমাত্র শ্রোতা—স্বনামধন্য পান্নালাল, নিজের চিন্তা থেকে রেডিওর অভিনয়ে মন নিবিষ্ট করবার

চেষ্টা করছে। রেডিওর পালায় শ্রীরাধিকার সঙ্গে কথা কইছে চন্দ্রাবলী :

রাধিকা

শোনো শোনো চন্দ্রাবলী তন্দ্রামাখা কুন্দকলি,
বৃন্দাবন-চন্দ্র আজি নাই বৃন্দাবনে,
মন্দবায়ু গন্ধহারা, কোকিল যে ছন্দহারা
নিরানন্দ ঘন মেঘ ঢাকে চন্দ্রাননে।

চন্দ্রাবলী

কেষ্ট ভারি দুষ্ট সুজন কষ্ট দিয়ে হাসে
তারে ভালোবাসবে যে সে চোখের জলে ভাসে।

শ্রীরাধিকার হাহাকার আর চন্দ্রাবলীর সান্ত্বনা রেডিওতে বেজে চলেছে,—শ্রোতা পান্নালালের কানে যেন তা প্রবেশ করছে না। তার মুখে উদ্বিগ্নতার ছায়া! কোন বন্য চিন্তা ঝোড়ো পাখার ঝাপটা মেরে মেরে যাচ্ছে তার মনে। সে উৎকীর্ণ হয়ে আছে, তবু রেডিওর পালা তাকে যেন ঠিক আকর্ষণ করছে না। রেডিও চলছেই :

রাধিকা

মথুরায় কত মধু পেয়েছ জানি না, শুধু
বিধুর হৃদয়ে করি বৃথা হাহাকার।
এত জপি শ্যাম নাম তবু মোরে বিধি বাম,
রাধা রাধা বলে বাঁশী সাধে নাকো আর!

চন্দ্রাবলী

ভেবো না ছার বাঁশীর কথা, কী আছে তার মূল্য?
এবার থেকে বাজবে বেসুর যখন তোমায় ভুললো!

উত্তেজিত পান্নালাল উঠে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো—অধৈর্য ত্রস্ত! বন্ধ জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরে

একবার অস্থির-ঔৎসুক্যে কী নিরীক্ষণ করলো। আবার গিয়ে বসে পড়লো। পাশে রেডিওতে তেমনি শোনা যাচ্ছে ঃ

রাধিকা

আর তো যমুনা কূলে জলকে যাব না ভুলে,
কলসী ভাসায়ে দেবো, নেই যে কানাই!
ঘন ঘোর বরষায় বায়ু করে হায় হায়,
মোর আঁখিবারি-কথা কাহারে জানাই?

চন্দ্রাবলী

ছাড়াছাড়ি হলো যখন আজ থেকে দাও আড়ি,
রাত বারোটা বাজলো, বোধ হয়, যাই চলো ভাই বাড়ি।

রাধিকা

দুটি আঁখি, দুটি নীলা...............

অতিষ্ঠ ও বিরক্তভাবে পান্নালাল ঘট্ করে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। আপন মনেই বললো ঃ

—"ধ্যেৎ, রাধার সেকেলে কান্না আর ভালো লাগে না! কিন্তু শেষ কথা দুটি ভালো লাগলো। 'দুটি আঁখি—দুটি নীলা! হ্যাঁ, নীলা—নীলা!' তবে দুটি নীলা বড় বাড়াবাড়ি, একটি মাত্র নীলা পেলেই আমি বেঁচে যাই!—শুধু একটি—একটি মাত্র নীলা?"

বলতে বলতে পান্নালাল কেমন যেন বিমর্ষ বিহ্বল হয়ে যায়। কোন সুদূর দুর্গম বিভীষিকার মধ্যে যেন তার উৎকণ্ঠিত কল্পনা অভিযান করে। ...বাইরে থেকে দরজায় মৃদু করাঘাত হলো। শিকারী বিড়ালের মতো সে সতর্ক-তৎপর হয়ে ওঠে, চোখ দুটো তার দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। আর একবার দরজায় শব্দ হতেই আত্মস্থ কণ্ঠে প্রশ্ন করে পান্নালাল ঃ —"কে?"

আগন্তুকের উত্তর শোনা যায় ঃ—"আমি শোহনলাল হে!"

পান্নালাল স্বাভাবিক হয়ে বললো ঃ—"ভিতরে এসো।"

ভিতরে প্রবেশ করলো শোহনলাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পান্নালালের মুখে চেয়ে যেন কিছু পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করলো, পরমুহূর্তেই জিজ্ঞাসা করলো ঃ—"আমায় ডেকেছ ?"

পান্নালাল ঃ—"হ্যাঁ। বোসো। কথা আছে।"

শোহনলাল ঃ—"তোমার মুখে ভাবনার রেখা কেন ?"

উৎকণ্ঠিত পান্নালাল একবার ঘড়ির দিকে তাকালো, চিন্তিত স্বরে বললো ঃ

—"রাত নটা বাজছে। চুনীলাল আর হীরালাল এখনও এসে পড়লো না! একটা জরুরী কাজে তাদের কলকাতার বাইরে পাঠিয়েছি। ট্রেনের সময় তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে!"

শোহনলাল ঃ—"তোমার জরুরী কাজ মানেই তো বিপদের কাজ! হয়তো তারা কোন বিপদে পড়েছে।"

পান্নালাল ঃ—"বিপদ ? হুঁ, অসম্ভব নয়! কিন্তু তাদের বিপদে যে আমারও বিপদ!"

শোহনলালের কাছে কথাগুলো দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। সে সরাসরি বলে ঃ

—"দেখো পান্নালাল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। আগে সব কথা খুলে বলো দেখি।"

পান্নালাল শোহনলালের মুখে তার প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কী চিন্তা করে, পরমুহূর্তেই কল্পনায় রহস্যময় ব্যাপারটার সমস্তটুকু পর্যালোচনা করে নেয়। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কোন দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতার মধ্যে নিজেকে হয়তো হারিয়ে ফেলে। তারপর গম্ভীর বিজ্ঞতায় ঠোঁটের বিস্ফারণে আর চোখের সঙ্কোচনে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে পান্নালাল স্থির মনস্থ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে ঃ

—"আচ্ছা, খুব সংক্ষেপেই বলছি শোনো। ......সাঁওতাল-পরগণার এক পাহাড়ে, গুহার মধ্যে অদ্ভুত এক দেবতা আছে। সাঁওতালীরা অনেক ভূতকে পূজা দেয়। এ দেবতাটিও হচ্ছে একটি

ভূত। যে সে ভূত নয়, দস্তুর মতো দুষ্ট ভূত। রঙ করা কাঠে গড়া বারো ফুট উঁচু সেই মূর্তি, তার বীভৎস মুখের দিকে তাকালেই বুকের রক্ত ভয়ে একেবারে জমাট বেঁধে হিম হয়ে যায়। মূর্তিটা তুচ্ছ কাঠে গড়া বটে, কিন্তু তার গলার মালায় আছে একখানা আশ্চর্য নীলা, ওজনে নাকি দেড়শো ক্যারেট!"

শোহনলালের চোখ দুটো যেন শামুকের চোখের মতো ঠেলে উপর দিকে খাড়া হয়ে উঠে! অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বিস্ময় বিস্ফোরণ করেঃ

—"দে-ড়-শো-ও ক্যারেট! বলো কি হে?...ফরাসী গভর্ণমেণ্ট একবার বাংলাদেশ থেকে একখানা একশো ক্যারেটের নীলা কিনে ছিল, তারই দাম যে এক লক্ষ দু-হাজার টাকা!"

পান্নালাল:—"তা হলে এ নীলাখানার দাম কত হবে, আন্দাজ করে দেখো!"

শোহনলাল:—"গরিব সাঁওতালীরা এতো দামী নীলা কোত্থেকে পেলে?"

পান্নালাল: —"তা কেউ জানে না। ঐ ভূত-দেবতাটি হচ্ছে অতি প্রাচীন ভূত—বয়স তার তিনশো বছর হবে। সাঁওতালীদের বিশ্বাস, তাদের দেবতা ঐ নীলা নিয়েই পরলোক থেকে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য নীলাখানার কথা তারা কারুর কাছে প্রকাশ করে না, দৈবগতিকে আমি জানতে পেরেছি।"

শোহনলাল:—"বুঝেছি। রতনেই রতন চেনে! —জানতে পেরেই নীলাখানা চুরি করবার জন্যে চুনীলাল আর হীরালালকে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

কৃতবিদ্য পান্নালাল ঈষৎ আত্মপ্রসাদের হাসির সঙ্গে বলে:

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। ওদেরই পাঠিয়েছি, এসব কাজে ওরা দুজন কি রকম ওস্তাদ, জানো তো?"

পান্নালালের কথার পিঠে পিঠে তৎক্ষণাৎ শোহনলাল কথা কয়ে ওঠে। তোষামোদের আকারে যেন একটু শ্লেষ মিশিয়েই সে বলে:

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ তা আর জানিনে? জানি বৈকি, তারাই তো তোমার ডান হাত, বাঁ হাত। তাদের দৌলতেই তো কলকাতার পথে পথে তোমার চার চারখানা মোটর ছুটোছুটি করে, আর তোমার দরজায় মোসাহেবের ভিড় হয়!"

ঘাড় নাড়তে নাড়তে পান্নালাল সংশোধন করেঃ

—"তোমার কথা ঠিক হলো না শোহনলাল! তারা আমার সৈন্য, আমি তাদের সেনাপতি। বুদ্ধি জোগাই আমি!"

কথাবার্তা ব্যক্তিগত বিষয়ে সংক্রামিত যাতে না হয়, শোহনলাল সেদিকে সতর্ক। নীলারকৌতূহলে আগের কথায় ফিরে এসেসে বলেঃ

—"সে কথা সত্য। কিন্তু পান্নালাল, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, চুনীলাল আর হীরালাল সে নীলাখানা চুরি করবে কেমন করে? সাঁওতালীরা অমন বহুমূল্য রত্ন তো অরক্ষিত অবস্থায় পথে ফেলে রাখবে না!"

পান্নালাল শোহনের আশঙ্কা দূর করে দিয়ে বললোঃ

—"হ্যাঁ শোহনলাল, নীলাখানা বেওয়ারিস মালের মতো প্রায় অরক্ষিত অবস্থাতেই আছে। সাঁওতালীদেরও ভিতরে হয়তো লোভী লোকের অভাব নেই, কিন্তু ঐ ভুতুড়ে দেবতাকে তারা ভয় করে যমের মতো। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ঐ নীলা চুরি করবে তার সর্বনাশ হবে!"

শোহনলালের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যায়; প্রশ্ন করেঃ

—"এমন বিশ্বাসের কারণ?"

পান্নালাল চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল, সোজা হয়ে উঠে উৎসাহ ভরে বললোঃ

—"তবে শোনো। অনেক কাল আগে নাকি একজন লোভী সাঁওতালী ঐ নীলাখানা চুরি করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। তার পরের দিনই ভুতুড়ে দেবতার মূর্তিও অদৃশ্য হয়। কিন্তু দুদিন পরেই সকলে অবাক হয়ে দেখলে, তাদের দেবতা আবার নিজের জায়গায়

এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার গলার মালায় ঝুলছে সেই নীলা, আর নীলার নীল গায়ে রক্তের রাঙা দাগ !"

শোহনলাল শিউরে ওঠে, তবু অবিশ্বাসের স্বরে প্রশ্ন করে :

—"রক্তের দাগ ? তার মানে ?"

পান্নালাল :—"তার মানে, দেবতা নাকি স্বশরীরে গিয়ে চোরকে বধ করে হারানো রতন নিয়ে ফের ফিরে এসেছিলেন ।"

শোহনলাল অবিশ্বাসপূর্ণ তাচ্ছিল্যে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয় :

—"যত সব গাঁজাখুরি গল্প !"

পান্নালাল দ্বিগুণ উদ্যমে যেন শোহনের বিশ্বাস-উৎপাদনের চেষ্টা করে আবার বলে :

—"শোনো, আরও একটা গল্প আছে, যদিও তাতে গাঁজার গন্ধ বেশি নেই। আর একবার রাতে আর একটা চোর গুহার ভিতরে ঢুকেছিল। কিন্তু গুহার ছাদ থেকে মস্ত একখানা পাথর খসে তার মাথায় পড়ে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে, চোরের মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর তার হাতে রয়েছে সেই সর্বনেশে নীলা ! সাঁওতালীদের মত হচ্ছে, দেবতাই পাথর ছুঁড়ে তার দফা রফা করে দিয়েছিলেন ।"

এই ধরনের গল্পে শোহনলালের বিরক্তি একেবারে উগ্র হয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য বক্তব্য থেকে সে বক্তার উপরই যেন বিশ্বাস হারায়। প্রশ্ন ছলে তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতটা নিক্ষেপই করে শোহনলাল :

—"এসব রূপকথায় তুমি বিশ্বাস করো ?"

শাণিত হাসির বিদ্যুৎ স্ফুরণে পান্নালাল বিনা বাক্যেই যেন এই বক্রোক্তির জবাব দেয়। ক্ষণপরে অবিচলিত ভাবে বলে পান্নালাল :

—"আমি করি না, তবে সাঁওতালীরা করে। কোন চোরই তাই আর ও-মুখো হয় না। রাত্রে গুহার মুখে পাহারা দেয় সাঁওতালী এক পুরুত—একেবারে একলা। চুনীলাল আর হীরালাল অনায়াসেই তার চোখে ধুলো দিতে পারবে ।"

এতক্ষণে নীলার প্রসঙ্গে এক রকম নিরুৎসাহ প্রকাশ করেই শোহনলাল যেন অন্য কাজের কথায় তৎপর হয়ে উঠে বলে :

—"হুঁ, সব তো বুঝলুম। কিন্তু তুমি হঠাৎ আমাকে স্মরণ করেছ কেন ?"

পান্নালাল :—"তুমি একে জহুরী, তার উপরে চোরাই মাল বিক্রী করতে ওস্তাদ। তুমি ছাড়া যে আমার গতি নেই।"

ওস্তাদ ব্যবসাদার শোহনলাল, বাজপাখির মতো কোন সুযোগই সে হারাতে দেয় না,—প্রখর তৎপরতায় যেন পান্নালালের প্রস্তাবে একটা ছোঁ মেরে প্রশ্ন করে :—"ধরো, নীলাখানা যদি আমি দেড় লাখ টাকায় বেচে দিতে পারি, তা হলে আমার কী পাওনা হবে ?"

পান্নালাল :—"দশ পার-সেণ্ট।"

শোহনলাল :—"মোটে পনেরো হাজার টাকা ? —উহুঁ, তা হয় না। এসব কাজে পদে পদে বিপদ। আমি পঁচিশ হাজার টাকা চাই।"

পান্নালাল :—"শোহনলাল, সে সব কথা যথা সময়ে হবে। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল দাও কেন ? আগে চুনীলাল আর হীরালালকে আসতে দাও।"

শোহনলালের লাভ করার লোভ তার ব্যবসাদারী সতর্কতাকেও ছাড়িয়ে গেছে,—হুঁশিয়ার পান্নালালের কাছে তা উলঙ্গ নির্লজ্জতায় প্রকাশ হয়ে পড়লেও পান্নালালের ভর্ৎসনায় সে লজ্জা বোধ করে না বরং সপ্রতিভ ভাবে যেন পান্নালালের নীলা প্রাপ্তির সম্ভাবনাকেই অভিশম্পাত করে জানায় :

—"কিন্তু তারা কি আর আসবে ? —হয় তারা নীলা নিয়ে উধাও হয়েছে, নয় কোন বিপদে পড়েছেই পড়েছে।"

ঈষৎ উৎকর্ণ হয়েই হঠাৎ পান্নালাল উল্লাস ভরে বলে ওঠে :

—"হুর্‌রা ! —তোমার দুটো অনুমানের একটাও সত্যি নয় ! সিঁড়ির উপর আমি হীরালালের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি ! —জয় মা কালী।"

অতি দ্রুত পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে! —ধনুকের ছেঁড়া ছিলার মতো পান্নালাল চেয়ার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দরজার দিকে যেন ছিটকে এলো। বাইরে থেকে দড়াম করে ঘরের দরজা খুলে গেল। ঝড়ের ঝাপটার মতো আছড়ে পড়লো হীরালাল ঘরের মধ্যে —পান্নালালের পায়ের কাছে। পান্নালাল ও শোহনলাল তাকে ধরে তুলতে গেল। ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখ দুটো কপালে তুলে কোন রকমে উচ্চারণ করে হীরালাল ঃ

—"পান্নাবাবু! —পান্নাবাবু! —জ—ল!"

সংজ্ঞাহীন হীরালাল অসাড় নিস্পন্দ হয়ে ভারী পাথরের মতো ওদের হাত থেকে নীচে স্খলিত হয়ে পড়লো। শোহনলাল জল আনতে ছুটলো। —মুহূর্তের অবকাশ! ক্রূর বিদ্যুৎ ভঙ্গীতে পান্নালাল হীরালালের হাতের মুঠো ও জামার পকেটগুলো সতর্ক ক্ষিপ্রতায় হাতড়ে দেখলো। ··শোহনলাল জল এনে চোখে মুখে দিতে লাগলো। পান্নালাল সহজভাবেই বলে ঃ

—"সেনস্ নেই! চলো, একে ধরাধরি করে শোবার ঘরে বিছানার উপর নিয়ে চলি। মাথার কাছে টেবিল-ফ্যান্‌টা চালিয়ে দাও। —ওর জ্ঞান না ফিরলে তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, কী হয়েছে আর কী-ই বা হতে চলেছে। তবে ইতিমধ্যে যদি—"

এই বলতে বলতেই পান্নালাল তাড়াতাড়ি সামনের দরজাটা বন্ধ করে চাবী ঘুরিয়ে দিলে। তারপরে ত্রস্ত পায়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো রিভলভার বের করে কার্টিজগুলো একবার ঘুরিয়ে দেখে নিলো এবং কোমরের দুই ধারে দুটোকে গুঁজে নিয়ে শোহনলালের সঙ্গে মিলে হীরালালকে ধরাধরি করে শোবার ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

দুই

দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘূর্ণাবর্তে ঘটনাস্রোত দুর্বার বেগে এসে জমা হচ্ছে, তার ভয়াল তরঙ্গের পুচ্ছে পুচ্ছে মরণের উন্মত্ত তাড়না, মানুষের

লোভোন্মত্ত জীবনকে যেন নিষ্ঠুর টানে কোন অন্ধ অতলে তলিয়ে নিতে চায়! আশঙ্কার ছায়ারা বুঝি আতঙ্কের কায়ারূপে মূর্ত হয়ে হো-হো-হো করে হেসে উঠছে—তাদের পৈশাচিক হাসি। ভয়াবহ বিভীষিকার নির্মম-নগ্ন অমোঘ পদক্ষেপে মানুষের শত আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ ক্ষুদ্র প্রাণ বুঝি দলিত মথিত হয়ে যায়। কোন শক্তি এর প্রতিরোধ করবে? এ যে সর্বনাশী নীলার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা!

শোবার ঘরখানি অপেক্ষাকৃত ছোট। বিছানায় পড়ে রয়েছে হীরালাল—আতঙ্ক-আচ্ছন্ন জ্ঞানহীন। বন্ বন্ করে তার শিয়রে ঘুরছে ইলেক্ট্রিক ফ্যান্। হীরালালের চেতনার প্রতীক্ষায় তার দুই পাশে দুই চেয়ারে বসে রয়েছে নির্বাক পান্নালাল ও শোহনলাল—মুখে চোখে তাদের একই উদ্বেগের কালো ছায়া।

অবশেষে হীরালাল চোখ মেলে চাইলো—দৃষ্টিহীন শূন্য চাহনি। কোন অদৃশ্য আতঙ্কের ভাম্পায়ার যেন শরীরের সমস্ত রক্তটুকু শুষে নিয়ে তাকে একেবারে শুকনো ফ্যাকাশে করে ফেলে গেছে। তার সম্পূর্ণ চেতনা ফিরতেই সে আবার অস্থির হয়ে ওঠে—কোন করাল নিয়তি তাকে যেন আবার অনুসরণ করেছে—পলায়নে পঙ্গু সে, অসহায় ভাবে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলো। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থান সে একবার দেখে নিলো এবং একটু আশ্বস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে উঠলো ঃ—"পান্নাবাবু!"

পান্নালাল ঃ—"কী ব্যাপার হীরালাল? আবার অত হাঁপাচ্ছ কেন?"

হীরালাল ঃ—"ওঃ, অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি—ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি!"

পান্নালাল ঃ—"সে কী?"

হীরালাল ঃ—"হ্যাঁ। আমি আসবার আগেই কলকাতার পুলিস চুরির খবর পেয়েছে। নিশ্চয় ওখানকার পুলিস তারে খবর পাঠিয়েছে। হাওড়ায় তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কি করে যে তাদের

ফাঁকি দিয়েছি, তা আর বলবার নয়।·········ও, আগে এক গেলাস জল !"

পান্নালাল নিজেই তাড়াতাড়ি জল এনে তার মুখের কাছে ধরে বললে ঃ—"এই নাও।"

জল গেলাসটা এক নিঃশ্বাসে পান করে হীরালাল আবার যেন প্রাণ ফিরে পেলো। গভীর তৃপ্তির উচ্ছ্বাস তার মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে আসে ঃ

—"আঃ, বাঁচলুম ! যা তেষ্টা পেয়েছিল।"

পান্নালাল যথেষ্ট অপেক্ষা করেছে ! হীরালালের জামার পকেটে নীলা নেই সে দেখেছে। তবে কি নীলা চুনীলালের কাছে ? কিন্তু চুনীলালও তো আসে নি। আসল সংবাদ এখনও সবই রহস্যময়। হীরালাল জল পান করে বিছানার উপর উঠে বসলো। তার সুস্থতা লক্ষ্য করে পরের প্রশ্নেই জিজ্ঞাসা করে পান্নালাল ঃ

—"তা হলে নীলাখানা পেয়েছ ? কই সে নীলা আমায় দেখাও তাকে দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে আছি।"

কথা বলতে বলতে অধীর আগ্রহে পান্নালাল তার হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। হীরালাল তার অধৈর্য ও অশোভন লোভ লক্ষ্য করে। পান্নালালের প্রতি একটা উৎকট ঘৃণা তার অন্তঃস্থল থেকে উদ্গারিত হয়ে আসে। সে নির্বাক দৃষ্টিতে পান্নালালের দিকে তাকিয়ে থাকে। পান্নালাল কী ভেবে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে ঃ

—"তবে কি নীলাখানা চুনীলালের কাছে আছে ? চুনীলাল কোথায় ?"

কঠিন স্বরে হা-হা করে হেসে ওঠে হীরালাল,—নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয় ঃ

—"চুনীলাল এখন কোথায় আছে জানি না !"

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠে পান্নালাল বলে ঃ

—"জানো না !"

হীরালাল ঃ—"না পান্নাবাবু। স্বর্গের দরজা তো সে খোলা পাবে না, হয়তো এতক্ষণে সে নরকের দিকে যাত্রা করেছে।"

ক্রুদ্ধ স্বরে পান্নালাল তার অধৈর্য প্রকাশ করে ঃ

—"হীরালাল, আমি হেঁয়ালি ভালোবাসি না। আগে আমি জানতে চাই, নীলাখানা পেয়েছ কিনা ?"

হীরালাল ঃ—"পেয়েছি—পেয়েছি পান্নাবাবু !"

আশ্বস্ত হয়ে পান্নালাল যেন অনুমতি দেয় ঃ "তা হলে এইবারে সব খুলে বলো।"

হীরালাল ঃ—"শুনুন তবে। কাল অমাবস্যার রাত গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে গা ঢেকে আমরা দুজনে গুহার দরজার কাছে গেলুম। চারিদিক একেবারে নিঝুম—গাছের পাতারা পর্যন্ত নিঃসাড়। তারি মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেবল গুহার দরজায় সাঁওতালী পুরুতের নাক ডাকার আওয়াজ। চুনীলাল এক লাফে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পুরুতের গলা টিপে ধরে এ জন্মের মতো তার নাক ডাকা বন্ধ করে দিলে।...তারপর দুজনে গুহার ভিতর ঢুকলুম। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার গুহা। ঢুকেই কেন জানি না, আমাদের গা ছম্-ছম্ করতে লাগলো! চুনীলাল তো এগুতেই চায় না, আমার গুঁতো খেয়ে তবে এগুলো! কিন্তু—'টর্চ' জ্বেলেই দেখলুম, সেই ভীষণ ভূত-দেবতার ভয়ঙ্কর মুখে দুটো ড্যাব্‌ডেবে আগুন-চোখ দপ্-দপ্ করে জ্বলছে !"

এতক্ষণ শোহনলাল নীরব শ্রোতা হিসেবে এদের কথোপকথন শুনছিল। এইবার জোর দিয়ে বলে উঠলো ঃ

—"অসম্ভব ! কাঠের মূর্তি, চোখ জ্বলবে কেমন করে ?"

পান্নালালও শোহনলালের অবিশ্বাসে যোগ দেয় ঃ

—"ভয়ে তোমরা কী দেখতে কী দেখেছ !"

হীরালাল ঃ —"হতে পারে।" তারপর শুনুন, বেজায় উঁচু সেই মূর্তিটা, তার গলা আমাদের নাগালের বাইরে। চুনীলাল ভয়ে

কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের উপরে চড়ে মূর্তির গলার হার থেকে কোন রকমে নীলাখানা ছিঁড়ে নিলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভয়ানক চেঁচিয়ে উঠে আমার কাঁধ থেকে ঠিকরে পড়ে গেল। টর্চের আলো

চুনীলাল মাটির উপরে ছট্‌ফট্‌ করছে আর তার পাশে পড়ে রয়েছে নীলাখানা।

ফেলে দেখি, চুনীলাল মাটির উপরে ছট্‌ফট্‌ করছে আর তার পাশে পড়ে রয়েছে নীলাখানা। মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখি, তার গা বেয়ে মস্ত একটা সাপ ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করতে করতে নেমে আসছে! আমি আর দাঁড়ালুম না, নীলাখানা তুলে নিয়ে তীরের মতো ছুটে পালিয়ে এলুম!”

কথাগুলো বলতে বলতে হীরালাল উত্তেজনায় জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলো। একদৃষ্টে সে পান্না ও শোহনলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের সামনে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের পুনরাভিনয় যেন ভেসে ওঠে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে ঃ—"ওঃ!"

পান্নালাল ঃ—"নরকে যাক চুনীলাল! সে নীলাখানা কোথায়? এখনি দাও সেই নীলা আমার হাতে! আমি তাকে এখনি চাই!"

কোঁচার খুঁটে বাঁধা ছিল নীলাখানা—পেটের কাছে অতি সাবধানে গোঁজা। সেটা খুলতে খুলতেই বলছে হীরালাল ঃ

—"এই নিন আপনার নীলা।"

হীরালালের হাত থেকে এক-রকম ছোঁ মেরেই নীলাখানা নিয়ে পান্নালাল নীরবে অনেকক্ষণ ধরে উলটে-পালটে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে কেমন যেন হয়ে যায় পান্নালাল। সে ভুলে যায় সকল উত্তেজনা সমস্ত আতঙ্ক বিভীষিকা! —হীরালালের বীভৎস কাহিনী তার কাছে স্বপ্নে-শোনা গল্প হয়ে গেছে—! চুনীলালের মৃত্যু, হীরালালের পিছনে পুলিসের অনুসরণ, এখানকার অবস্থানে তাদের আসন্ন বিপদের সম্ভাব্যতা সমস্তই সে বিস্মৃত হয়। অপলক আবিষ্ট নেত্রে সে চেয়ে থাকে নীলাখানার দিকে। এই কি নীলার সম্মোহন? —এই মোহের পথেই কি নীলা ডেকে আনে সর্বনাশ মানুষের লোভী জীবনে? কে জানে!

শোহনলালও আগ্রহ সহকারে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল নীলাখানা। মুগ্ধ স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে ঃ

—"আশ্চর্য নীলা! এর তুলনা নেই!"

পান্নালাল আর চোখ ফিরাতে পারে না। কী এক ঐন্দ্রজালিক মায়ার দ্যুতি নীলার নীল অঙ্গে দুলে দুলে উঠছে। পান্নালালের গলা দিয়ে যেন অন্য কেউ কথা বলে। নীলার সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে পরিপূর্ণ অভিভূত আবেগে বলে ওঠে ঃ

—"আহা-হা, আশ্চর্যই বটে! নীল-পদ্ম, নীল-আকাশ, নীল-

সাগরের রঙ এর কাছে ম্লান হয়ে যায়!”

ওস্তাদ ব্যবসাদার শোহনলাল স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে, এবং বলে :

—“তোমার কবিত্ব রাখো পান্নালাল। নীলাখানা আমার হাতে দাও, ওর কত দাম হবে দেখি।”

মোহগ্রস্ত আবিষ্ট পান্নালাল যেন উন্মাদ অপত্য-স্নেহে নীলাখানা বুকে চেপে ধরে বলে :

—“এ নীলা আমার আর বেচবার ইচ্ছে নেই!”

শোহনলাল ও হীরালাল উভয়েই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে, পান্নালালের ক্ষেপাটে কথাটা যেন অনুধাবন করার চেষ্টা করে। স্থিরসংকল্প পান্নালাল দৃঢ় চিবুক সংবদ্ধ করে বজ্রমুষ্টিতে নীলাখানা চেপে ধরে ওদের দিকে সেনাপতির আদেশের ভঙ্গীতে শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

শোহনলাল :—“সে কি, আমার পঁচিশ হাজার টাকা মাঠে মারা যাবে?”

হীরালাল :—“ও নীলা না বেচলে আমার টাকা দেবে কে? ওর জন্যে চুনীলাল মরেছে, আমিও যমের দরজা থেকে ফিরে এসেছি।”

পান্নালাল :—“তোমাকে তিন হাজার টাকা বখশিস দেবো।”

হীরালাল :—“তিন হাজার টাকা। ও নীলার কত দাম হবে শোহনলাল বাবু?”

শোহনলাল :—“দেড় লাখও হতে পারে।”

হীরালাল :—“আর আমি পাবো তিন হাজার টাকা! পান্নাবাবুর দয়ার সীমা নেই!”

শোহনলাল :—“পান্না, ও-নীলা তোমাকে বেচতে হবেই। আমাকে না-হয় পনেরো হাজার টাকাই দিও।”

পান্নালাল ওদের কথায় যেন কানই দেয় না। ক্রমেই তার অন্তরের তলদেশ থেকে সমস্ত চিন্তা সংকল্প, দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী,

—সমস্তই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে এক অদ্ভুত পৈশাচিক নির্মমতায় যেন রূপান্তর গ্রহণ করে। দুর্দম্য অধৈর্য বুঝি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তার নিষ্ঠুরতম আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করাতে চায়। তবু নিজেকে সম্বরণ করে পান্নালাল। দৃঢ় গাম্ভীর্যে সে উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হলো। ওরা দুজনও পান্নালালের পশ্চাতে উঠে দাঁড়ালো। পান্নালাল চলে যায় দেখে শোহনলাল বলে :

—"পান্না, তোমার টিকি আমার কাছে বাঁধা। জানো, আমি তোমার সর্বনাশ করতে পারি ?"

উত্তেজনার আতিশয্যে হীরালাল ঝট্ করে পান্নালালের বাঁ হাতখানা ধরে ফেলে বলে :

—"পান্নাবাবু, আমিও ও-নীলার সমান ভাগ চাই।"

ধৈর্যের শেষ সীমান্তে পান্নালাল—কোন অলক্ষ্য হিংস্র নিয়তি যেন অবিমৃষ্য ক্ষিপ্রতায় তাকে ঠেলে দেয় এক চরম সমাধানের পথে ! দুই চোখে আগুনের ঝলক তুলে বলে পান্নালাল :

—"হুঁ। শোহনলাল করবে আমার সর্বনাশ, আর হীরালাল চায় সমান ভাগ ! তা হলে আমার উত্তর হচ্ছে এই !"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই চকিতে রিভলভার বের করে দুবার ছুঁড়লে পান্নালাল। দুটো জ্বলন্ত গুলি দুজনের দাবী ঠাণ্ডা করতে যথেষ্টই —পান্নালাল তা জানে। শোহন ও হীরালাল আর্তনাদ করে সশব্দে আছড়ে পড়ে গেল। পান্নালাল এক পৈশাচিক হাসি হেসে উঠলো —আপন মনেই পুনরাবৃত্তি করে :

—"হুঁ, ইনি করবেন আমার সর্বনাশ, আর উনি চান আমার সমান ভাগ !"···

অবজ্ঞাভরে আরও কী বলতে যাচ্ছিল পান্নালাল ; কিন্তু হঠাৎ তার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। বাড়ির দরজায় একখানা মোটর এসে দাঁড়ানোর শব্দ হলো। সচমকে বিভ্রান্ত স্বরে পান্নালাল বলে :

—"ও কার মোটরের শব্দ !"

নীচে সদর-দরজায় দমাদম পদাঘাতের শব্দ এসে পান্নালালের কানের পরদাই যেন ভেঙে ফেলতে চায়। উৎকণ্ঠিত স্বরে সে বলে ওঠে : —"ও কারা দরজায় লাথি মারে ?"

নীচে কে চীৎকার করে বলছে :

—"দরজা খোলো, দরজা খোলো ! নইলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলবো !"

পান্নালাল সন্ত্রস্ত হয়ে জানলার খড়খড়ি তুলে কিছুটা অনুমান করবার চেষ্টা করে। জানলা খুললেও বাড়ির ঠিক নীচে কিছু দেখা যায় না। শুধু কথাগুলো আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তা থেকেই সে সভয়ে বলে ওঠে : —"পুলিস !"

সদর দরজায় পদাঘাতের পর পদাঘাত ! আর সেই সঙ্গে পান্নালালের চেতনার উপরে যেন কেমন একটা ভারী বিভ্রান্তির প্রলেপ কে লেপে দিচ্ছে। সমস্ত ঘরের বাতাস যেন প্রতিধ্বনি করে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলছে একটা অমানুষিক কণ্ঠের বিকট ও তীব্র স্বর, কোথায় যেন একটা পৈশাচিক অট্টহাস্য হা-হা-হা-হা করে পান্নালালের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে সে চীৎকার করে ওঠে :

—"ও কে ? ও কে অমন করে হাসছে !"

দরজায় পদাঘাতের শব্দ আর ঐ বিকট অট্টহাসি যেন আরও নিকটে, আরও জোরে, আরও নিষ্ঠুরভাবে তাকে ঘিরে ফেলতে আসছে। পান্নালাল ছিটকে বাড়ির ভিতর দিকের দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো।

তিন

তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমিকায় সেই অন্ধ বাড়ির বন্ধ ঘরে ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে মুমূর্ষুর আর্তনাদ — লোভলোলুপ দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুর অরাজকতা বয়ে গিয়েছে ঘরখানার মধ্যে

দিয়ে। টেবিল, চেয়ার, বিছানা ওলট পালট বিপর্যস্ত। শোহনলাল ও হীরালালের অবিন্যস্ত দেহ রক্তাক্ত মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

ঘরের আবদ্ধ পরিসরে একটা অশুচি আবহাওয়া যেন চারিদিকের দেওয়ালে মাথা কুটে ফিরছে, কোন পাপাত্মার অনুশোচনা তা নয়—অন্তিমকালে জীবনভিক্ষার দুর্বল প্রার্থনাও নয়। শোহনলাল ও হীরালাল বহু মরণাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথাটা ভালো করে জানে যে তাদের দুর্ধর্ষ জীবনের ইতি একদিন এমনি করেই টানতে হবে। তবু পৃথিবী থেকে যাওয়ার আগে পান্নালালের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়া তাদের চাই-ই। আসন্ন মরণের যন্ত্রণার চেয়ে তীব্র প্রতিশোধ-স্পৃহা তাদের সারা দেহের পেশী-তন্ত্রী কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তুলছে। ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে যেন দুরাত্মার প্রতি দুরাত্মার আক্রোশ আছাড় খেয়ে পড়ছে। এদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যে প্রতিহিংসার বিষবাষ্প স্ফুরিত হচ্ছে, তাই যেন ঘরের আবহাওয়াটাকে আরও ভারাক্রান্ত, আরও অশুচি করে তুলেছে।

শোহনলালের দেহকুণ্ডলীর ভিতর থেকে একটা অস্ফুট গোঙানি যেন কোন অদৃশ্য সর্বশক্তিমান বিচারকের কাছে নালিশ জানাচ্ছে। —মানুষের কানে তার কোন অর্থ ধরা পড়ে না, তবু ভাবটা বুঝা যায়। ইহজগতের মেয়াদী আয়ু তার পূর্ণ হয়ে এলো, প্রতিহিংসা বুঝি আর এখানে নেওয়ার সময় হবে না। এই শরীরে যে কাজ শেষ হলো না, অন্য কোন অশরীরীর কাছে তাঁর রেশ পৌঁছে দেওয়ায় হয়তো সান্ত্বনা আছে। তাই হয়তো সে নালিশ জানাচ্ছে ঘরের বাইরের আকাশের কাছে। ঘরের জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা ভেদ করে তার গোঙানি সাতনলী ফলার মতো ক্রমশই আকাশ চিরে উপরে উঠছে। ওদিকে সদর দরজায় তেমনি দমাদম আওয়াজ হচ্ছে; আর মাঝে মাঝে যেন পাহাড়ে পাঁজরা ফাটিয়ে বিকট শব্দে ফেটে ফেটে পড়ছে একটা হা-হা-হা অ হাসি।

শোহনলালের রক্তাক্ত দেহ তখনও ছট্‌ফট্ করছে ; কিন্তু হীরালাল সম্পূর্ণ মৃতবৎ। হঠাৎ যেন তার দেহ নড়ে উঠলো,—পাখি আকাশে উড়ে যেতে তার আশ্রয়-শাখায় যেমন দোলা লাগে তেমনি। কিন্তু পান্নালালের প্রাণবিহঙ্গ তার দেহশাখার আশ্রয় ছেড়ে শূন্যে পক্ষবিস্তারের কোন লক্ষণই দেখালো না। বরং তীরের চকচকে ফলার মতো তূণাবরণ ভেদ করে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ধীরে ধীরে খুললো ; প্যাট-প্যাট করে চারিদিকটা একবার দেখে নিলো এবং তার চিরকালের অভ্যাস মতো পরিহাসপক্ক ভাষায় বললো :

—"পান্নাবাবু তো পগার পার ! এইবারে আমাকেও গাত্রোত্থান করতে হবে ! ওহে শোহনলালবাবু, চোখ তো মুদে আছেন, কিন্তু পটল তুলেছেন, না আমারই মতন কপট-মৃত্যু ?"

পাথর-চাপা অনুভূতির মধ্যে শোহনলালের চেতনা যেন সমাধি-গ্রস্ত ছিল। দেহের যন্ত্রণাটাকে মনে হচ্ছিল বুঝি নরকদূতের সাঁড়াশীর কামড়ে-ধরা টান। বহু যোজন দূর থেকে যেন হীরালালের কথা তার কানে ভেসে এসে লাগছে। শরীরখানায় একটা আপ্রাণ মোচড় দিয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে এবং চোখ মেলতেই যেন তার পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে আসে। —সে উত্তর দেয় :

—"হীরালাল, আমার আর কোন আশাই নেই। আমার আঘাত সাংঘাতিক।"

হীরালাল :—"কিন্তু পান্নাবাবুর গুলিতে আহত হয়েছে কেবল আমার পাঞ্জাবির হাতা ! তার চোখে ধুলো দেবার জন্যেই এতক্ষণ আমি মড়ার মতন পড়ে ছিলুম !"

হীরালাল ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসলো। শোহনলাল যেন সারা দেহখানা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে একটা পূর্ণ-জ্যা টঙ্কার তুলবার চেষ্টা করেই মচ্ করে ভেঙে পড়ে,—আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার দিয়ে ওঠে : —"ওঃ বড় যাতনা ! ...বড় যাতনা !"

কিছুক্ষণ নিঃস্পন্দ থেকেই আবার মাথা তোলে শোহনলাল—

আহত সাপের ফণা তোলার মতো। লাল চোখ দুটো ঠিক্‌রে দিয়ে কাটা-কাটা ভাষায় ফাটা-ফাটা আওয়াজ তুলে বলে :

—"কিন্তু ... কিন্তু সয়তান পান্না কি পালাতে পারবে ?"

হীরালাল :—"খুব পারবে ! বাড়ির-পিছন দিকে একটা গুপ্তদ্বার আছে যে ! পুলিস সদরে যে রকম লাথির উপর লাথি চালাচ্ছে, আমাকেও এখনি সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।

হীরালাল আহত নয়, সে তার পূর্ণজীবন নিয়ে এখনও নিরাপদ হতে পারে—এই সংবাদে শোহনলাল অস্বাভাবিক ভাবে আস্বস্ত হয়ে উঠলো ! কিন্তু হীরালাল গাত্রোত্থান করে দেখে অসহায় ভাবে সে অনুরোধ জানাতে চায় :

—"না না হীরালাল, যেও না !"

হীরালাল তার কাতর নিষেধের কোন অর্থ খুঁজে পায় না, তার ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহের দিকে একটা বক্রদৃষ্টি হেনে হো-হো করে হেসে ওঠে হীরালাল। সে মনে করে, যে মরছে, অপরের বেঁচে থাকাটা হয়তো তার অসহ্য, তাই বলে এখন ওঁর শুশ্রূষা করতে বসে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে সেও মরবে নাকি ! সে টেবিলের কাছে গিয়ে একখানা কাগজ টেনে নেয়। শোহনলাল আবার কাকুতি জানায় :

—"এখনি যেও না হীরালাল, শোনো। আমার তো শিয়রে মৃত্যু, কিন্তু মরবার আগে আমি শুনে যেতে চাই, তুমি এই-শয়তানির প্রতিশোধ নিতে পারবে কিনা ! —চুপ করে রইলে কেন হীরালাল ? —কাগজে কী লিখছ ?"

হীরালাল : —"আপনি বলবার আগেই প্রতিশোধের ব্যবস্থা করছি।"

এতক্ষণে সে বুঝতে পারে কেন শোহনলাল তাকে ছাড়তে চায় না। এতক্ষণে যেন শোহনের প্রতি তার অনুকম্পা হয়, শ্রদ্ধা জাগে। মৃত্যু-যন্ত্রণাও এদের যদি বা সহ্য হয়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হওয়ার

জ্বালা বুঝি একেবারেই অসহ্য। এই বৃত্তিটুকুর পরিচয়ে হীরালাল শোহনলালের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে অবশ্যই। শোহনের কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সে একটু বসে ; সতর্কভাবে খেয়াল রাখে বাইরে পুলিসের দরজা ভাঙার আওয়াজ ; অস্থির ভাবে তাকে বলে শোহনলাল :

—"হীরালাল, আমার চোখে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসছে! —শীঘ্র বলো, কী ব্যবস্থা করছ?"

হীরালাল : —"শুনুন, পান্নাবাবু নিশ্চয় তার স্ত্রীর কাছে গেছে। কাগজে সেই ঠিকানা লিখে পুলিসের জন্যে টেবিলের উপরে রেখে গেলুম। এ ঠিকানা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

শোহনলালের যন্ত্রণা-কাতর মুখেও যেন হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু নিমিষেই ভুরু কুচকিয়ে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে :

—"সে যদি সেখানে না যায়?"

নিস্পৃহ ভাবেই উত্তর দেয় হীরালাল :

—"তা হলে তার বরাত ভালো! অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমি তো আর লড়তে পারবো না!"

শোহনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পরমুহূর্তেই আতঙ্ক-স্ফীত চোখ দুটোকে হীরালালের দিকে তুলে ধরে প্রশ্ন করে :

—"কিন্তু হীরালাল তুমি শুনেছ?"

হীরালাল : —"কী?"

শোহনলাল : —"সেই ভয়ানক হাসি?"

হীরালাল : —"শুনেছি। বোধ হয় পুলিসের কেউ হেসেছে।"

শোহনের গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যায়। আরও ক্ষীণ চাপা কণ্ঠে বলে :

—"না হীরালাল, সে হাসি মানুষের নয়!"

হীরালাল : —"তা হলে যমদূত বোধহয় আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে!"

শোহনলাল যন্ত্রণা চেপে এতক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিল। তার যে জীবন তাতে মৃত্যুর সময়ে কারো সহানুভূতি বা অশ্রুজল সে কামনা করতে পারে না—করেও না। তবু হীরালালের কথায় তার বুকের কোথায় বুঝি একটু আঘাত লাগে। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে :

—"হীরালাল! প্রাণ যায়! মরবার সময়ে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, না ঠাট্টা করছ?"

হীরালাল :—"ঠাট্টা করছি শোহনলালবাবু! আমাদের কাছে জীবন আর মরণ দুই-ই যে মস্ত-বড় ঠাট্টা! যে ব্যবসা ধরেছি, আমাকেও যে এইভাবে মরতে হবে! কিন্তু সেদিন আমি হাসতে-হাসতেই মরবো!"

জীবন আর মরণ দুই-ই যাদের কাছে মস্ত-বড় ঠাট্টা তারাই পারে অকাতরে জীবনের রাশ আলগা করে দিতে—সুপথে অথবা কুপথে। মাঝে যদি থাকে কোথাও মরণের খাদ তা তারা লাফিয়ে পারও হতে পারে অথবা তাতে চিরকালের সমাধি রচনাও করতে পারে। হীরালালের দুর্ধর্ষ দস্যু-জীবনে এইখানেই মনে হয় তার সত্যোপলব্ধি আছে; পরিণাম না ভেবে এপথে সে আসেনি, মৃত্যুর আশঙ্কা তার চলার পথে বহুবার উত্তুঙ্গ পূর্ণচ্ছেদের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সে তার সতর্ক উপস্থিত-বুদ্ধিতে বারে-বারেই এড়িয়ে এসেছে, আর মনে মনে হেসেছে—জীবনের প্রতি—মৃত্যুর প্রতি পরিহাসের হাসি। তাই হীরালাল যখন বলে সে হাসতে হাসতেই মরবে তখন মনে হয় না সে কিছু বাড়িয়ে বলে। কিন্তু শোহনলাল? — সে তো আসন্ন মৃত্যুমুখে, সে কি সত্যই কাঁদছে? হাঁপাতে হাঁপাতে সে উত্তর দেয় :

—"আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও হাসতে হাসতে মরতে পারি হীরালাল — যদি পান্না ধরা পড়ে!"

বাহিরে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হলো। চমক ভেঙে হীরালাল বলে ওঠে :

—"ঐ সদর-দরজা ভেঙে পড়লো! আপনি এখন মরুন, আমি এখন পালাই! পরে নরকে একদিন আবার দেখা হবে।"

দ্রুত পদশব্দ তুলে প্রস্থান করে হীরালাল বাড়ির কোথায় গুপ্তদ্বার আছে সেই দিকে। শোহনলাল অন্তিমকালে শেষ দুই-চারিটি মুহূর্ত মাত্র ভিক্ষা চায়,—অন্তত পুলিসের লোক তার ঘরে না আসা পর্যন্ত তার শেষ নিশ্বাস যেন না বের হয়। —ঐ তো সিঁড়ির উপর বহু লোকের ত্রস্ত জুতোর শব্দ শোহনের কানে আসছে! —মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের আয়ু, সে-কি এতই বেশি?

সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে তার চোখের সামনে বয়ে এলো কুজ্ঝটিকার ঝড়,—অন্ধকারের ঢেউ-এর বন্যা নিঃশব্দে ডুবিয়ে দিল তার সামনের টেবিল চেয়ার খাট আয়না। পৃথিবীর যত ভিন্ন অর্থের ভিন্ন-ভিন্ন গোটা-গোটা শব্দ—সব যেন গুঁড়িয়ে একটা তরল মিক্শ্চার করে কে তার কানের পরদায় ঢেলে দিচ্ছে। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঝিমঝিম করে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। শোহনলালের সারা অস্তিত্ব কোন অমোঘ আকর্ষণে চেতনার নিস্তরঙ্গ অতলে নিঃশব্দে তলিয়ে যায়। সে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে চায়—জীবনের শেষ পরিধিকূলে সে আরও দু-একটি মুহূর্তের আশ্রয় পেতে চায় — তা হলেই সেও হীরালালের কথামত হাসতে হাসতেই মরতে পারে।

পুলিসের লোক প্রায় উঠে এসেছে।—তাদের হৈ-চৈ যেন শব্দের সরীসৃপ,—দুর্বার হিংস্রতায় ফণা মেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে দমকা ঝড়ের মতো প্রবেশ করলো পুলিশের ইনস্পেক্টার। আসার মুখেই যেন আচমকা ইলেক্ট্রিকের শকে থমকে গিয়ে ইনস্পেক্টার বলে ওঠে :

—"এ কি! ঘরের ভিতর যে রক্তারক্তি কাণ্ড! —কে তুমি? —কে তুমি?"

নিবে যাওয়ার আগেই বুঝি একবার জ্বলে উঠলো শোহনলালের

চেতনা। সমস্ত শক্তি কণ্ঠে এনে ক্ষীণস্বরে সে টেনে টেনে বলে ঃ

—"আর পরিচয় দেবার সময় নেই। আসামী পান্নালাল আমাকে মেরে গুপ্তদ্বার দিয়ে পালিয়েছে ! —ঐ টেবিলে তার ঠিকানা !"

ইনস্পেক্টারের পিছনে আরও অনেকে ঘরে ঢুকলো। ভিতরের দৃশ্যে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ! ঝট্ করে ইনস্পেক্টার কাগজখানা হাতে তুলে নিয়েই বলে ঃ

—"কাগজে লেখা আছে—'দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেন'।—পান্নাবাবু নীলা নিয়ে সেইখানে পালিয়েছে।"

শোহমলাল শুধু এইটুকু শুনবার জন্যেই তার শেষবিন্দু শক্তি দিয়ে যেন তার শেষ নিশ্বাসটুকু স্থগিত রেখেছিল। প্রতিহিংসার চরম চরিতার্থতায় তার দুর্বল মুখেও যেন একটা ক্ষীণ হাসির অতি সূক্ষ্ম রেখা খেলে গেল। পরম পরিতৃপ্তিতে একবার 'আ-আঃ' শব্দ করেই সে একেবারে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল। সাব-ইনস্পেক্টার বললো ঃ

—"স্যর, লোকটা বোধহয় মরে গেল !"

ইনস্পেক্টার ঃ —"মরুক্ গে, ভদ্র-গুণ্ডা পান্নালালের আড্ডায় সাধুলোক মরতেও আসে না, কলকাতার আর একটা আপদ দূর হলো। কিন্তু মরবার আগে লোকটা আরো দু-একটা কথা কয়ে গেলেই পারতো !"

সাব-ইনস্পেক্টার ঃ —"হ্যাঁ স্যর, এমন করে মরা বড়ই অন্যায় স্যর ! এখন আমরা কী করবো ! এ আড্ডার মালিক পান্নালালকে জানি, কিন্তু আবার কোথায় তার দেখা পাবো ?"

ইনস্পেক্টার ঃ —"চলো, দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনে গিয়ে তো আগে দেখাই যাক্।"

যাওয়ার আগে পুলিসের দলবল তন্ন-তন্ন করে সারা বাড়িখানা তল্লাসি করলো। তাদের ঈপ্সিত বস্তু কোথাও নেই। শোহনলালের

মৃত দেহখানা নেড়ে-চেড়ে একবার পরীক্ষা করলো এবং তারপর সেই রক্তমাখা লাসের পাহারায় দু-একজনকে রেখে তারা সকলেই প্রস্থান করে—পান্নালালের উদ্দেশ্যে চন্দ্রমোহন লেনে। শোহনলালের অশরীরী আত্মা হয়তো তখনও তার সদ্যত্যক্ত দেহের শিয়রে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

চার

চতুর্থ দৃশ্যে অবশ্যম্ভাবীকে প্রতিরোধ করবার সমস্ত আয়োজন বুঝি পান্নালাল গড়ে তুলেছে। বিজয়গর্বে সে আজ ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে বলা যেতে পারে। তবু সে ভুলতে পারে না তার দুর্ধর্ষ জীবনের এই প্রথম দুর্বলতার আতঙ্ক। আর কখনও এমন হয়নি; মানুষের বিরুদ্ধে শত-শত ষড়যন্ত্র সে বারে-বারে সৃষ্টি করেছে; জয় হোক, পরাজয় হোক, দুর্বলতা তাকে কোনদিন এমন করে ছেয়ে ফেলেনি। নির্মম প্রত্যয়ে সে পদক্ষেপ করে—অব্যর্থ আঘাতে সে ছিনিয়ে নিয়ে আসে মানুষের সতর্কসঞ্চিত ধন-সম্পদ! বারে-বারে সে ব্যাহত করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রতিটি অভিযান! আজও সে শেষ পর্যন্ত তাই-ই করলো, কিন্তু সে-বিজয়গর্বের অনুভূতি তার আজ নেই। এখনও তার মনের দিগন্তে যেন রূঢ় গাম্ভীর্যে আতঙ্কের কালো মেঘ ঘনঘটায় বিদ্যুৎ হেনে যাচ্ছে। দুর্বল মস্তিষ্কের বিকারের মতো ক্ষণে ক্ষণে পান্নালাল এখনও শিউরে ওঠে। কানে বাজে সেই প্রতিধ্বনি —শূন্যতার অট্টহাসির প্রতিধ্বনি—হা-হা-হা-হা!

চন্দ্রমোহন লেনে দশ নম্বর বাড়ির সম্মুখ-অংশ এত রাত্রেও আলোকিত,—সরকারি রাস্তার গ্যাসের আলো এখানে সারারাত্রি অন্ধকারকে আসতে দেয় না। বাড়ির ভিতরের অংশ অন্ধকার—শুধু উপরের ঘরের একটা জানালার ফাঁক দিয়ে একটু ক্ষীণ আলোর রেখা চোখে পড়ে। ভিতর এবং বাইরে একটা নির্দোষ গার্হস্থ্য আবহাওয়া —পাপের আতঙ্ক, লোভের উত্তেজনা কোন-কিছুকে এখনও কলুষিত

করেনি। কিন্তু পান্নালাল যেখানে আসছে—পান্নালাল যেখানে আশ্রয় নেবে—পান্নালাল যেখানে সেই নীলা গোপন রাখতে চাইবে সেখানকার নিষ্কলুষ শান্তি কি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজ করতে পারবে? নীলার মোহে পান্নালাল মুগ্ধ, লোভে অন্ধ,—আর নীলা তার পিছনে নিয়ে আসছে আগুনের উপপ্লব, সব পুড়িয়ে ছারখার করবে, তবু নিবৃত্তি মানবে না। দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনের নির্বিরোধ গার্হস্থ্য পরিবেশের হয়তো কোনো কিছু নিষ্কৃতি পাবে না—হয়তো-বা সে-আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে এলো।

পান্নালাল হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে—যেন জলে ডোবা কোন জাহাজের নাবিক এসে ডাঙায় উঠলো। অকূলের মাঝে কূল পেয়ে আপন মনেই সে বলে :

—"যাক্, মানে মানে ফাঁড়া বোধহয় কেটে গেল, নিজের বাড়িতে এসে পড়েছি। এখানকার ঠিকানা জানে খালি হীরালাল—কিন্তু সে আর কথা কইবে না! —ওরে রামু—"

রামু সংসারের চাকর, অদূরেই কোথায় ঘুমিয়ে ছিল, প্রভুর এক ডাকেই সাড়া দেয় :

—"আজ্ঞে, বাবু!"

পান্নালাল : —"গিন্নীমা কোথায়?"

রামু : —"শোবার ঘরে, বাবু!"

পান্নালাল : —"আচ্ছা, তুই সদর বন্ধ কর!"

পান্নালাল সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো। নিজের মনের আলোড়ন-বিলোড়ন যতদূর সম্ভব চেপে রেখে সহজ ভাবেই সে একটা বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকলো।

পান্নালালের স্ত্রী প্রভা আগেই তার গলার স্বর শুনেছে—কিন্তু ঘর থেকে নেমে নীচে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। যেমন এতক্ষণ ছিল তেমনি খাটের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বুকের উপর একখানা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করছিল। দাম্পত্য জীবনের প্রথমদিকেই তার এ

শিক্ষা হয়েছে যে অহেতুক ঔৎসুক্য যেন সে পারতপক্ষে না দেখায়, তার স্বামীর রহস্যময় গতিবিধির প্রতি যেন সে কোনরূপ কৌতূহল পোষণ না করে। আগে হয়তো সে পীড়া অনুভব করতো কিন্তু এখন দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ততায় এটা তার স্বাভাবিক ভাবেই গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই নিতান্ত সাংসারিক ব্যাপার ছাড়া অন্য সব-কিছুতে প্রভা বাহ্যত অনেকটা নিস্পৃহ অসংশ্লিষ্ট ভাব দেখায়।—এটা এখন তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে হবে।

তবু আজ পান্নালালের সঙ্গে তার অনেক কথা জানতে ও জানাতে ইচ্ছে করছে। সে এতক্ষণ যে মানসিক অবস্থায় কাটিয়েছে তা তার স্বামীকে না জানিয়ে সে পারবে কেমন করে? সে এতক্ষণ যেন পান্নালালেরই অপেক্ষা করছিল; কিন্তু রাত তিনটের আগে যার বাড়ি ফেরা অভ্যাসবিরুদ্ধ তাকে এগারোটার আগেই আশা করা বাতুলতা। কিন্তু সেই পান্নালাল সত্যিই এত আগে বাড়ি ফিরলো দেখে প্রভা মনে মনে একটু বিস্মিত হলো। কী মেজাজে যে পান্নালাল আসছে কে জানে। প্রভা জানে, স্বামী আর যেখানে যাই করুক, তার কাছে অন্তত সে সদয় ও স্নেহপ্রবণ। বহু আদর-আব্দার সে সহ্য করে, কিন্তু মাঝে মাঝে যেন তাকে আর ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় না। না, আজ সে আশঙ্কা নেই। প্রভা দেখলো পান্নালাল যেন একটু বেশি তৎপর হয়েই সোজা তার কাছে উঠে আসছে। তার বুকের মধ্যে যে দুর্ভাবনার ভারি পাথর চেপে ছিল তা ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। সে বইটা পাশে রেখে খাটের উপর উঠে বসলো। মুখে কৃত্রিম হাসি মাখিয়ে নিয়ে পান্নালাল ঘরে ঢুকেই বলে:

—"এই যে প্রভা, জেগে আছো? কী বই পড়ছো?"

আপাতত নির্লিপ্ত ভাবেই উত্তর দেয় প্রভা:

—"এই যে-বই ভালো লাগছে না।"

হাসতে হাসতে কৌতূহল প্রকাশ করে পান্নালাল:

—"ভালো লাগছে না, তবু পড়ছো?"

অধিকতর নির্লিপ্ত ভাবেই যেন প্রভা বলে ঃ

—"উপায় কি ? ঘুম না হলে কড়িকাঠ গোনার চেয়ে যে-কোনো বই পড়া ভালো।"

পান্নালাল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। অনেকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। প্রভা তার মুখের চেহারা ও সাধারণ হাবভাব নিরীক্ষণ করতে থাকে, এবং একটু অভিমানের সুরেই প্রশ্ন করে ঃ

—"কিন্তু তোমার ব্যাপার কী বলো দেখি ? রাত এগারোটা না বাজতেই তোমার আবির্ভাব, বন্ধুদের আসর বুঝি জমলো না ?"

পান্নালাল কঠিন হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঃ

—"এ প্রশ্ন কেন ?"

প্রভা ঃ—"তোমার মুখ দেখে।"

পান্নালাল যেন নরম হয়ে পড়ে ! উৎসুক হয়ে বলে ঃ

—"আমার মুখে কী দেখছ প্রভা ?"

প্রভা ঃ—"ভয় আর দুশ্চিন্তা।"

নাটকীয় রীতিতে একটা কৃত্রিমতার শুষ্ক হাসি হাসতে থাকে পান্নালাল এবং টেনে টেনে বলে ঃ

—"চোখের ভ্রম !—তোমার চোখের ভ্রম !"

প্রভা ঃ—"ভুল হলো গো! তোমার মুখের পানে তাকিয়ে আমার কখনো চোখের ভ্রম হয় না।"

পান্নালাল ঃ—"দুনিয়ায় ভয় কাকে বলে জানি না। আর হঠাৎ দুশ্চিন্তাই বা আমায় আক্রমণ করবে কেন ?"

প্রভা ঃ—"জ্যোতিষ-শাস্ত্র জানলে সে-কথা বলে দিতে পারতুম।"

পান্নালাল ঃ—"তুমি ও-বিদ্যাটা জানো না বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু দেখো প্রভা, আমাকে নিয়ে অতো বেশি মাথা ঘামিও না।"

প্রভা ঃ—"মাথা ঘামানোর অধিকার বোধ করি আমার ছিল, তবে

তুমি আমার কাছে চিরকাল রহস্যময়ই থাকলে !"

'রহস্যময়' কথাটা পান্নালালের কোথায় যেন তীরের মতো লাগে—সবিস্ময়ে সে পুনরুক্তি করে ঃ

—"রহস্যময় !"

প্রভা ঃ—"হ্যাঁ, রহস্যময়। আমার কাছে তুমি যেন শিলমোহর করা খাম। সামনে থাকলেও বুঝতে পারি না, তোমার ভিতরে কী আছে ! আমার আড়ালে তুমি কী করো, কোথায় থাকো, কিছুই জানি না। এত টাকা পাও কোথা থেকে, তাও বুঝি না। আমার কাছে তুমি রহস্যময়, এটা যে আমার কত বড় দুর্ভাগ্য তা যদি তুমি জানতে ! খালি তুমি নও, আজ থেকে দেখছি, এই বাড়িখানাও রহস্যময় হয়ে উঠেছে !"

পান্নালালের সমস্ত দেহের মধ্যে অলক্ষ্যে যেন তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে যায়। দ্বিগুণমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে ঃ

—"বাড়িখানা রহস্যময় হয়ে উঠেছে ! কী বলছ ?"

প্রভা ঃ—"হ্যাঁ, তাই। তুমি ঠাট্টা করবে বলে এতক্ষণ আমি বলিনি, কিন্তু আমার ঘুম না হওয়ার কারণই হচ্ছে তাই।"

অন্তরের তলদেশে উদ্বিগ্নতার ঢেউ পান্নালালকে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল করে তুলেছে। বাইরে গম্ভীর স্বরে সে বলে ঃ

—"প্রভা, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।"

প্রভা ঃ—"শোনো, তুমি তো কোনোদিনই শেষ রাতের আগে বাড়ি ফেরো না, কাজেই রাত দশটার সময় আমি শুয়ে পড়ি। আজও বিছানায় গিয়ে শুয়েছি, হঠাৎ শুনলুম, পাশের ঘরে কে ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে !"

সচমকে পান্নালাল বলে ওঠে ঃ

—"কী বললে ? ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলে ?"

প্রভা ঃ—"হ্যাঁ, ঠক্-ঠক্ ঠক্-ঠক্ ঠক্-ঠক্—ঠিক যেন দু-খানা কাঠের পা ও-ঘরে চলে চলে বেড়াচ্ছে !"

রুদ্ধশ্বাসে পান্নালাল আবার বলে :

—"কাঠের পা ?"

প্রভা :—"হ্যাঁ, কাঠের পা।"

পান্নালাল :—"তারপর ?"

প্রভা :—"উঠে পড়ে ও-ঘরে গেলুম। দরজার শিকল বাইরে থেকে তোলা ছিল। কিন্তু ঘরের ভিতরে কেউ নেই।"

পান্নালাল :—"শব্দটা ?"

প্রভা :—"থেমে গেছে। দরজা বন্ধ করে আবার এ-ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আবার সেই শব্দ! আবার ও-ঘরে গিয়ে দেখি, কেউ নেই—শব্দও থেমে গেছে। আবার এ-ঘরে এলুম—আবার সেই চলন্ত কাঠের পায়ের শব্দ! বলো, এর পরেও কারুর চোখে আর ঘুম আসে ?"

পান্নালাল নিজেকে সামলে নেয়। অন্তরের উত্তেজনা একেবারে গোপন করবার চেষ্টা করে। অন্তত প্রভার কাছে তার দুর্বলতা সে ধরা দিতে চায় না—কারুর কাছেই না। সে সমস্ত ব্যাপারটা যেন উড়িয়ে দিয়েই বলে :

—"তোমার শুনবার ভুল প্রভা।"

প্রভা জোর দিয়ে বলে :

—"অসম্ভব।"

পান্নালাল :—"নইলে এ হচ্ছে ইঁদুরের কীর্তি।"

প্রভা :—"ও সন্দেহ আমারও হয়েছে। কিন্তু সে যে খুব ভারি পায়ের আওয়াজ! ঠিক যেন মস্ত-বড় একটা দেহ ও-ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল!"

পান্নালাল।—"ঐটেই তোমার ভ্রম। কই, এখন তো আর কোনো শব্দ হচ্ছে না।"

বিষয়টা যেন তর্কের দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। প্রভা আর কোন জবাব খুঁজে পায় না। অতএব তাকে শেষ পর্যন্ত

পান্নালালের কথাতেই সায় দিতে হলো—সত্যিই তো এখন কেন সে-শব্দ আর হচ্ছে না? প্রভা বলে:

—"তাও তো বটে। তাহলে মানতে হয়, আমারই ভ্রম হয়েছে।"

প্রভার কথায় যেন পান্নালাল কানই দেয় না। তার দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠলো, প্রভার দৃষ্টি তা এড়ায় না। অসতর্ক ভাবে সে আবার বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কপাল কুঁচকে কী ভাবতে ভাবতে অনেকটা যেন আপন মনেই সে বলে:

—"কি আশ্চর্য, আজ আমাদের দুজনেরই শুনবার ভুল হয়েছে।—তুমি শুনেছ কাঠের পায়ের শব্দ, আর আমি শুনেছি বিকট অট্টহাসি!"

যে মানসিক উত্তেজনার স্রোত পান্নালাল অন্তরের তলদেশে জোর করে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে চেয়েছিল তা হঠাৎ উঁচু ঢেউ তুলে প্রভার সামনে ভেঙে পড়লো। প্রভা আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে:

—"অট্টহাসি? কখন?"

পান্নালাল সন্ত্রস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি নিজেকে আবার সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে:

—"না, না, —কী বলতে কী বলছি! —এ্যা—হাসি-টাসি কিছুই আমি শুনিনি!"

এই ভাবান্তর প্রভা লক্ষ্য করে এবং বলে:

—"আবার তুমি রহস্যময় হয়ে উঠলে?"

এ বিষয়ে পান্নালাল আর কোন কথা বলা পছন্দ করছিল না। সে প্রভাকে আদেশ করে বলে:

—"আচ্ছা, যাও প্রভা, ঘুমোও-গে যাও।" ...কথা শেষ না হতেই পান্নালাল কিসের শব্দে চমকে উঠে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে:

—"কিন্তু, —কিন্তু ও কী?"

প্রভা একটা চিৎকার দিয়ে পান্নালালের গা ঘেঁষে সরে আসে। পাশের ঘরে আবার ঠক্-ঠক্ ঠক্-ঠক্ করে কাঠের আওয়াজ, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর শোনা যাচ্ছে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে প্রভা বলে:

—"ওগো শুনছ ? —ওটা কি আমার শুনবার ভ্রম ? না, ইঁদুরের কীর্তি ?"

পান্নালাল তাকে অভয় দিয়ে বলে ঃ

—"আচ্ছা দাঁড়াও প্রভা, আমি এখনই দেখে আসছি।"

এই বলে সম্পূর্ণ আত্মস্থ সাহসে সে বেরিয়ে গেল। কোমরের বাঁদিক থেকে বের করে নিল অটোমেটিকটা, সেফটি বোতাম টিপে নিয়ে শক্ত মুঠোর মধ্যে সেটা বাগিয়ে ধরে ঢুকলো গিয়ে পাশের ঘরে। কাঠের পায়ের শব্দ তখন কোন শূন্যে যেন মিলিয়ে গেল। পান্নালাল দেখলো, সত্যই সে ঘরে কেউ নেই। সেখান থেকে সে চেঁচিয়ে বলে ঃ

—"প্রভা, এ ঘরে কেউ নেই! শব্দ কি এখনও শুনতে পাচ্ছ ?"

উচ্চকণ্ঠে তেমনি কাঁপতে কাঁপতেই প্রভা উত্তর দেয় ঃ

—"না—আ—আ !"

পান্নালালের দুঃসাহসী রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠে। সে বিস্মিত হলেও আতঙ্কের লেশ পর্যন্ত আর তার মনে এখন নেই! উপরন্তু কেমন যেন একটা দুর্দমনীয় কৌতূহল জাগে সব ব্যাপারটা খোলাখুলি ভাবে জানতে। সে আবার বলে ঃ

—"তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো প্রভা। আমি আজ এই ঘরেই থাকবো।"

প্রভার সারা দেহ তখনও ভয়ে ছম্-ছম্ করছে। তবু সে দ্বিরুক্তি করে না। অভিমান করা বৃথা—তার মূল্য পান্নালালের কাছে হয়তো বা কোনদিনই নেই। পান্নালালের কথা মানেই আদেশ। প্রভাকে একলাই থাকতে হবে এই ঘরে। সে জানে, বিপদে বা সম্পদে পান্নালাল যা ইচ্ছা করবে তা থেকে তাকে সে বিরত করতে পারে না। সে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল। তারপর বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়লো।

নিয়তিই হয়তো প্রত্যক্ষ জীবনের নেপথ্য-নায়িকা, —কিন্তু

পান্নালাল বোধহয় জানে না বা জানতে চায় না, কার কটাক্ষ-সঙ্কেতে তার জীবনের গতি তারই অলক্ষ্যে কোন অনিবার্য পথে নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে।

পাঁচ

পঞ্চম দৃশ্যের মূর্ছাহত নিশীথ নগরীর বুকের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে রক্তমাখা কালো ঘোড়ার পিঠে কালো মরণ-দূত। তার কুটিল ভ্রূকুটি বিক্ষেপে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। তার নিষ্ঠুর করস্পর্শে কত দম্ভ, কত ধৃষ্টতা, কত শত ঔদ্ধত্যের উচ্চ চূড়া নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে লোষ্ট্রসম নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অন্তিম যবনিকার ক্ষুধার্ত জঠরে।······ পান্নালাল কি কান পেতে শুনছে সেই দূরাগত ঘোড়ার খুরের শব্দ, —তার দশ নম্বর চন্দ্রমোহন লেনের সম্মুখে প্রলয়ঙ্কর হ্রেষাধ্বনি?

পাশের ঘরে প্রবেশ করার পর পান্নালালের কেমন জিদ চেপে যায়, সে তার সমস্ত আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে প্রতিপক্ষকে যেন সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করতে প্রস্তুত। সামনা সামনি যে-কোন প্রত্যক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে তিলমাত্র ভয় পায় না—একথা সত্য। পুলিসকে সে কোনদিন পরোয়া করেনি, যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তার কারসাজি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে। আজ তবে তার এতো আশঙ্কা কিসের? আধিভৌতিক চক্রান্তে সে বিশ্বাস করে না, তবু তার দুঃসাহসী আত্মচেতনার ভিত্তিমূলে হয়তো ছিল কোন দুর্বলতার ছিদ্রপথ; —তাই ঘটছে তার ক্ষণিকের বিভ্রান্তি। অবশ্য আতঙ্কে আত্মহারা হওয়ার মতো উত্তেজনা সে এখনও অনুভব করেনি। তাই নিজের ঘরে প্রবেশ করেই যখন সে দেখলো কোন চলমান কাঠের মূর্তি কোথাও নেই, শব্দও থেমে গেছে, তখন ব্যাপারটা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না। সে স্থির-সংকল্পে ঘরের মাঝখানে একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসলো, —শেষ পর্যন্ত এ রহস্যের সমাধান সে করবেই। মন ঘুরে-ফিরে ঐ একই চিন্তায় ডুবে যায়।

—সেই অট্টহাসি, এই কাঠের পায়ের শব্দ, সাঁওতালীদের দেবতা সম্বন্ধে জনশ্রুতি। আপন মনেই পান্নালাল বলে ঃ

—"সেই সাঁওতালী ভূত-দেবতা! তার কাঠের মূর্তি নাকি সচল হয়ে পলাতক নীলা-চোরকে হত্যা করে নীলা কেড়ে নিয়ে আসে! নীলা চুরি করতে গিয়ে চুনীলাল মরেছে সাপের কামড়ে, কিন্তু হীরালাল নীলা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কাঠের ভূত তখন বাধা দিতে পারে নি! —আরে এটা তো জানা কথাই, কাঠের মূর্তি কখনো জ্যান্ত হয়?"

পান্নালাল নিজেই নিজেকে বুঝিয়ে মনের সংশয় দূর করবার চেষ্টা করে। বিচার-বিশ্লেষণের অতীতে কোন অপ্রাকৃতিক ঘটনায় জন্ম-সংস্কারের বশে বুকের তলায় হয়তো সংশয় জাগে, হয়তো তার দোষী মন অতর্কে চমকে ওঠে, বিস্মিত হয়, কিন্তু কোন ভৌতিক কিংবদন্তীতে পূর্ণ বিশ্বাস সে কোনদিনই করে না।

কিছুপরে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে দরজাটা বন্ধ করলো এবং পকেট থেকে নীলাখানা বের করে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো। বসে বসে সে দেখছে নীলার ঐশ্বর্য—নীল বর্ণের দীপ্তি চোখের সামনে মহাসমারোহে দুলিয়ে তুলছে কুহক-বৈচিত্র্য। স্ফটিক অঙ্গ বেয়ে গলে গলে পড়ছে স্নিগ্ধ নীল দ্যুতি,—যেন নীল বরফের টুক্‌রো। কত লোকের লাল রক্তে স্নান করেও এই নীলা আজ অম্লান নীল! কত তস্করের লোভ অসংযত হয়েছিল ঐ রূপের মোহে —ঐ মোহিনী সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কত দস্যু প্রাণ নিয়েছে কত পুরোহিত মন্দির-রক্ষীর ; —কিন্তু এত করেও কোন তস্কর বা কোন দস্যু নীলার অধিকার পায়নি, পেয়েছে শুধু রহস্যময় মৃত্যুর অব্যর্থ অপঘাত। ...পান্নালালের ষড়যন্ত্রে এবারেও চুনীলালের হাতে মন্দির-পুরোহিত আর সর্পাঘাতে চুনীলাল প্রাণ হারিয়েছে—ঐ নীলার জন্যে ; ঐ নীলার জন্যেই তার রিভলভারের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো মোহনলাল আর হীরালালকে! এখন আর কেমন করে

কোনপথে পান্নালাল এই নীলার অধিকারে বঞ্চিত হবে? —পুলিস? …পুলিস তো তাকে ধরতে আসেনি। হীরালালের অনুসরণেই ও-বাড়িতে তারা হানা দিয়েছিল। পান্নালালই যে নীলা চুরি করেছে, এমন প্রমাণ তারা কোথায় পাবে? শোহন ও হীরালালের হত্যার জন্য পুলিস তাকেই সন্দেহ করবে? করুক না! এমন কত গণ্ডা হত্যার জন্যে সে তো কতবারই পুলিসের সন্দেহ অর্জন করেছে। তার গতিবিধির হদিস মিলাবে এমন পুলিস এখনও জন্মায়নি। ও-ঠিকানার গুণ্ডাদলপতি আর এ-ঠিকানার সাংসারিক কর্তা যে ভিন্ন নামে একই লোক—এ তথ্য কেউই জানে না। এই কথা বা এই ঠিকানা যে জানতো সে হীরালাল; তার মুখ তো সে বন্ধ করেই এসেছে। তবে আর কে আছে, যে এই নীলা —যা তার নির্জন ঘরের মধ্যে, তার চোখের সামনে, তার হাতের উপরে ধরা রয়েছে—তা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? —সেই আকাশ-চেরা অট্টহাসি? —এই ঠক্-ঠক্ কাঠের পায়ের শব্দ? —অশরীরী প্রেতের অনুসরণ? অবাস্তবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে বাস্তব স্বার্থ ত্যাগ করতে পান্নালাল কেন, কোন মানুষই সহজে পারে না।……তবু তার হাত দুটো কেঁপে উঠলো! হাতের উপর নীলার স্নিগ্ধ স্ফটিক দীপ্তি যেন ক্রুদ্ধ পাবকশিখার মতো জ্বলে উঠলো, —নীলা তো নয়, যেন অগ্নিদেবের রুষ্ট আঁখির তারা, নীল শিখার বিচ্ছুরণে পান্নালালের সব কিছুকে বুঝি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। পান্নালালের সারা দেহে শিহরণ তুলে শিরায় শিরায় যেন গুপ্ত সরীসৃপের দল একসঙ্গে বিচরণ করে গেল। সে ধীরে ধীরে নীলাখানা আবার তার পকেটে রাখলো; এবং চৌকি থেকে উঠে ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলো। চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে সে আবার আপন মনেই প্রশ্ন করে:

—"তাই তো, আজকের এ-সব ব্যাপারের অর্থ কী! কে তখন অট্টহাসি হাসলে? —এ-ঘরে থেকে-থেকে কাঠের পায়ে চলে বেড়াচ্ছেই বা কে?…"

অনেকক্ষণ পান্নালালের এমনি করেই কাটে! কোন রহস্যের কোন সমাধানই সে খুঁজে পায় না। এতক্ষণ পর্যন্ত কোন ঠক্-ঠক্ শব্দও শোনা গেল না, কোন অট্টহাসিও কেউ হাসলো না। যত সময় যাচ্ছে এই দুই রহস্যের গুরুত্বও পান্নালালের কাছে কমে আসছে। সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে উন্মুখ যে তার আশঙ্কা অমূলক, ভিত্তিহীন আশঙ্কায় সে কোন মিথ্যা বিভীষিকার আতঙ্ক ভোগ করছিল।

ক্রমেই মনটা তার হালকা হয়ে আসে। নিজের জন্যে তার হাসতে ইচ্ছে করে—তার মনের মধ্যে এত বড় দুর্বলতা কেমন করে বাসা বেঁধে ছিল। ঘরের বাতাসকে উদ্দেশ্য করেই সে যেন কৌতুকভরে বলে :

— 'ওহে বাপু কেঠো ভূত! তুমি আর-একবার তোমার অট্টহাসি হাসো দেখি, আর-একবার ঘট-ঘটিয়ে চলে বেড়াও দেখি। তুমি যদি সত্য হও, যদি জ্যান্ত হয়ে আমাকে দেখা দিতে পারো, তাহলে এখনি তোমার সাধের নীলা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। এই দেখো তোমার নীলা আমার পাঞ্জাবির ডান পকেটে রয়েছে! পারো তো জোর করে কেড়ে নাও!...হা-হা-হা-হা, কাঠের মূর্তি যদি জ্যান্ত হতো, তাহলে পৃথিবী যেতো উলটে! যত সব আজগুবি কথা!"

পান্নালালের স্বগত প্রলাপের মাঝে হঠাৎ তার ঘরের দরজায় যেন কে আঘাত করলো। পান্নালাল 'কে রে' বলে চমকে ওঠে!

বাইরে থেকে আস্তে আস্তে রামু উত্তর দিল :

—"আমি, হুজুর!"

পান্নালাল যেন আশ্বস্ত হয়, দরজাটা খুলে জিজ্ঞাসা করে :

—"কী রে রমু?'

অত্যন্ত চাপা গলায় সভয়ে রামু বলে :

—"হুজুর, পুলিস!"

সচমকে পান্নালাল বলে :

—"পুলিস! কোথায়?"

রামু ঃ—"বাড়ির চারিদিকে। তারা বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে, হুজুর!"

সদর দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারার শব্দ আসছে। পান্নালালের মনে হচ্ছে, ঠিক কিছুক্ষণ আগেই যেমন ও-বাড়িতে হয়েছিল, এখানেও যেন তারই পুনরাভিনয় ঘটছে। রামু বললো ঃ

—"ঐ শুনুন হুজুর, তারা বাড়িতে ঢুকতে চায়। দরজা কি খুলে দেবো?"

পান্নালাল গম্ভীর ভাবে কী চিন্তা করলো এবং রামুর দিকে মুখ তুলে কঠোর স্বরে বললো ঃ

—"না!"

রামু ঃ—"ওরা যে দরজা ভেঙে ফেলবে!"

পান্নালাল ঃ—"ফেলুক! তুই গিন্নীর ঘরের দরজার বাইরে থেকে শিকল তুলে দে! পুলিস দেখলে গিন্নি ভয় পাবে। —যা।"

রামু 'যে আজ্ঞে' বলেই ছুটে গেল—গিন্নীমার ঘরের দিকে। প্রভা এতক্ষণ ঘুমে অচেতন। তার ঘরে বাইরে থেকে শিকল বন্ধ হলো, সে এ-সব ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলো না।

পান্নালাল এই প্রথম যেন পুলিসের কাছে সহায়হীন বলে নিজেকে ভাবতে পারলো। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে দমাদম আওয়াজ আর চিৎকার—বিরাম নেই। একটু ভাববারও সময় যদি সে পেতো! মনের মধ্যে এক-একটা চিন্তা আকাশে বিদ্যুৎ হানার মতো সর্বদিক ক্ষণিকের আলোকে ভাসিয়ে তুলেই অনন্ত অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আজকে সন্ধ্যা থেকে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা একেবারে খাপছাড়া—প্রত্যেকটাই অচিন্ত্যপূর্ব বিচিত্র। ভয়াবহ-তায় কোনটাই কম নয়। বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন প্রকারের উপদ্রব বহন করে তার দিকে ছুটে আসছে। যেন ডার্বি ঘোড়ার রেস্ চলেছে তার এক রাত্রির জীবনের উপর দিয়ে—ভ্রূক্ষেপহীন নির্দয় গতিতে আসছে আশঙ্কা—আতঙ্ক—বিভীষিকা—রোমাঞ্চকর পরিহাস। এদের প্রতি-

বোধ করা অসাধ্য ; কোন সমস্যারই সমাধান আর নেই। তাই সে নিজে নিজেই বিড়-বিড় করে বলে :

"পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছে—এ বাড়ি থেকে পালাবার গুপ্তপথ নেই! ...হুঁ! তাহ'লে আমার লীলাখেলা ফুরুবার সময় হয়েছে! ...কিন্তু পুলিস এ-বাড়ির ঠিকানা পেলে কোথায়?—আমি ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের জীবন যাপন করি ; এ-বাড়ির উপরে পুলিসের সন্দেহ হলো কেন? এখানকার ঠিকানা জানতো খালি হীরালাল, কিন্তু সে তো এখন যমের বাড়িতে!"

পান্নালাল এখনও জানে না যে তার গুলিতে হীরালাল মরেনি। যদি তা জানতো, যদি তেমন সন্দেহও তার হতো, তাহলে হয়তো সে পুলিসের হাতে নিজের ঘরের মধ্যে অন্তত এমন করে বন্দী হতো না। যাই হোক, পান্নালালের দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক জীবনে এই দুর্দান্ত ভুলের আর কোন নিরাকরণ হবে না। এই অবস্থায় সে যদি জানতেও পারে যে হীরালাল মরেনি, সে-ই এ-বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ করার মূল, —তাহলেও সে এখন নিরুপায়। পান্নালাল কেমন যেন মরীয়া হয়ে ওঠে। অনেক দিন অপরের জীবন নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা সে খেলেছে,—আজ নিজের জীবনটা দিয়ে তেমনি খেলাই সে করবে। প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় স্বীকার যদি করতেই হয় তবে অহিংস নির্বিরোধ পন্থার চেয়ে সহিংস্র প্রতিরোধ অধিকতর সম্মানকর। প্রাণ তো এমনি করেই যাবে—আজ যদি সেইদিন এসেই থাকে তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। তাই এই সব দুর্বোধ্য ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ আলোচনা সে মন থেকে একরকম মুছে ফেলে নিতান্ত মরীয়া হয়েই নিজের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যেন নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললো :

—"যাক, এখন ও-সব ভেবে লাভ নেই—এ কাঠের ভূত নয়, জ্যান্ত পুলিস! —ঐ ওরা বুঝি সদর দরজা ভেঙে ফেললে। আমিও এখন ঘরের দরজা বন্ধ করি—প্রাণ থাকতে আত্মসমর্পণ করবো না!"

এই বলেই সশব্দে পান্নালাল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ও-দিকে সদর দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজের পরই সিঁড়ি বেয়ে সশস্ত্র পুলিসের দলবল দ্রুত পদশব্দ তুলে উপরে উঠে আসছে। বারান্দার উপরে উঠে রামুকে দেখেই ইনস্পেক্টার জিজ্ঞাসা করে ঃ

—"এই ! কে তুই ?" রামু ঃ —"আমি চাকর, হুজুর ?"

ইনস্পেক্টার ঃ —"তোর বাবু তো পান্নালাল ?"

রামু ভ্যাবাচেকা খেয়ে আমতা আমতা করতে লাগলো ঃ

—"আজ্ঞে ন-না, —হ্যাঁ হুজুর—কী লালবাবু ?"

ইনস্পেক্টার ঃ—"বুঝেছি ! তোর যে বাবু সে কোথায় ?"

রামু ঃ —"ও-ওই ঘরে হুজুর !"

ইনস্পেক্টার সদলবলে গট্-গট্ করে পান্নালালের ঘরের দিকে এগোলো। ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ দেখে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে ইনস্পেক্টার বললে ঃ

—"পান্নালাল, আর লুকোচুরি মিছে, দরজা খোলো !"

ঘরের ভিতর থেকে পান্নালালের দৃঢ় কণ্ঠ সুস্পষ্ট শোনা গেল ঃ

—"দরজা আমি খুলবো না।"

ইনস্পেক্টার ঃ —"তাহলে দরজা ভেঙে ফেলবো।"

পান্নালাল ঃ —"যে এ-ঘরে ঢুকবে, তাকে আমি গুলি করে মেরে ফেলবো !"

ইনস্পেক্টার আদেশ দিল ঃ —"এই জমাদার ! —এই সেপাই ! ভেঙে ফেলো দরজা ! দেখি কে কাকে গুলি করে !"

দরজার উপরে দুম্-দাম্ শব্দে ভারি লাথি পড়তে লাগলো। প্রত্যেক আঘাতে সমস্ত বাড়িখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিরীহ নিরুপদ্রব এই পল্লী ত্রস্ত চকিত চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাড়ির বাইরে লোকজন ভিড় করে জমছে—তাদের বিস্ময় আর চাপা কোলাহলে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এই সব হৈ-চৈ ছাপিয়ে আচম্বিতে ঘরের ভিতরে জাগলো এক সুদীর্ঘ অট্টহাস্য—হা-

হা-হা-হা-হা! ইনস্পেক্টার চমকে উঠে প্রশ্ন করে ঃ

—"কে হাসে অমন করে?"

সাব-ইনস্পেক্টার ঃ—"স্যর, স্যর, আসামী ভয়ে পাগল হয়ে গেছে স্যর!"

ইনস্পেক্টার ঃ —"পাগলেও কি অমন করে হাসে?"

হঠাৎ ঘরের ভিতর জাগলো একটা তীব্র আর্তনাদ। ঘুমন্ত রাত্রির পঞ্জরে যেন কোন গুপ্ত ছুরি অতর্কিতে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল! আর সারা প্রকৃতি বুঝি মর্মান্তিক আতঙ্কে তীব্র তীক্ষ্ণ দীর্ঘস্বরে চিৎকার করে উঠলো। ইনস্পেক্টার বিস্মিত কণ্ঠে বলে ঃ

—"ও কী যন্ত্রণার চিৎকার!"

সাব-ইনস্পেক্টার দরজায় কান পেতে থেকে বললো ঃ

স্যর, স্যর, সাপ স্যর, মস্ত গোখরো সাপ!

—"স্যর, স্যর, দরজায় কান পেতে আমি কী শুনছি জানেন?"

ইনস্পেক্টার ঃ—"কী শুনছ?"

সাব-ইনস্পেক্টার ঃ—"কে যেন কাঠের পা ফেলে খট্-খট্ করে ছুটোছুটি করছে!"

ইনস্পেক্টার ঃ…"ছুটোছুটির নিকুচি করেছে! ভাঙো দরজা!"

আবার পদাঘাতের পর পদাঘাত! হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো। দেখা গেল পান্নালাল মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকেই সাব-ইনস্পেক্টার চিৎকার করে ওঠে ঃ

—"স্যর, স্যর, সাপ স্যর, মস্ত গোখরো সাপ!"

ইনস্পেক্টার ঃ—"তাই তো!—মেরে ফেলো, মেরে ফেলো—গুলি করে মেরে ফেলো!"

দম্-দম্ শব্দে উপর্যুপরি রিভলভারের গুলি বৃষ্টি হলো; জানালার সার্সিগুলো ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়লো। সমস্ত গুলিই ব্যর্থ হলো। সাব-ইনস্পেক্টার বললো ঃ

—"সাপটা মরলো না স্যর, জানলা দিয়ে পালালো!"

ইনস্পেক্টার ঃ —"তোমাদের হাতে একটুও টিপ নেই!"

সাব-ইনস্পেক্টার ঃ—"আজ্ঞে, আপনিও তো রিভলভার ছুঁড়েছিলেন স্যর!"

ইনস্পেক্টার ঃ—"এখন তর্কের সময় নয়, ও-দিকে চেয়ে দেখো, আসামীকে বোধহয় সাপে কামড়েছে!"

সাব-ইনস্পেক্টার ঃ—"বোধহয় কি, কামড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে! দেখুন, মড়ার মতো পড়ে রয়েছে, ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে! সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রক্তারক্তি!"

ইনস্পেক্টার ঃ—"আগে ওর জামা-কাপড় খুঁজে দেখো নীলাখানা পাওয়া যায় কিনা।"

সাব-ইনস্পেক্টার পান্নালালের মৃতদেহটা নেড়ে-চেড়ে খুঁজে দেখতে দেখতে বলে ঃ

—"না স্যর, নীলা নেই! এর পাঞ্জাবির ডান-পকেটটা কে জোর করে টান মেরে ছিঁড়ে নিয়েছে!"

ইনস্পেক্টার ঃ —"ছেঁড়া-পকেটটা ঐ তো মেঝের উপর পড়ে রয়েছে! দেখো, দেখো ওর ভিতরে নীলা আছে কিনা?"

সাব-ইনস্পেক্টার :—"উহু, নেই স্যর !"

ইনস্পেক্টার : —"তাহলে রাস্কেল পান্নালাল নিজেই নিজের পকেট ছিঁড়ে নীলাখানা রাস্তায় ফেলে দিয়েছে !"

হঠাৎ সমস্ত উত্তেজনা ছাপিয়ে রাত্রির আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাড়ির বাইরে আবার সেই অট্টহাসির শব্দ উঠলো—তীব্র পৈশাচিক হাসি—হা-হা-হা-হা !

ইনস্পেক্টার :—"আবার সেই হাসি, এবারে বাইরে! —আশ্চর্য !"

সাব-ইনস্পেক্টার : —"ও ভূতের হাসি স্যর !"

ইনস্পেক্টার : —"ভূত ! হুঁঃ ! —আইন ভূত মানে না। দৌড়ে যাও, কে হাসছে ধরে নিয়ে এসো ! হয়তো ঐ বেটাই নীলা চুরি করে সরে পড়েছে !"

ইনস্পেক্টার ও দু-জন কনস্টবল্ ভিন্ন আর সকলে ছুটে নীচের দিকে অগ্রসর হলো ! ···অট্টহাসি ক্রমে দূর থেকে আরও দূরে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই সব হৈ-চৈ উত্তেজনার মধ্যে প্রভা তার বন্ধ ঘরে ঘুম থেকে জেগে চিৎকার করে উঠে কখন মূর্ছিত হয়ে পড়লো কেউ তা জানতেও পারলো না। ইনস্পেক্টার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়ের কাছে মেঝের উপর পান্নালালের অন্তিমশয্যা। তার জন্যে কোন চোখে একবিন্দু অশ্রুপাত হলো না, কোন বুকে একটু ব্যথার আঁচড়ও পড়লো না—একটা সন্তপ্ত নিশ্বাসের পাত্রও সে বুঝি নয় !

আকাশের পরপার থেকে যেন আরও দু-একবার সেই বিকট হাসির প্রতিধ্বনি কানে এসে বাজে তারপর একেবারে মিলিয়ে যায়। —আর সেই নীলা ? —কে জানে, হয়তো সুদূর সাঁওতাল-পরগণার পর্বত-গুহায় সেই অদ্ভুত প্রেত-দেবতার বারো ফুট উঁচু কাঠের মূর্তির গলায় সে-সর্বনাশা নীলা এতক্ষণ আবার দুলিয়ে তুলছে তার সর্বনাশা সম্মোহনী দীপ্তি—তার নীল গায়ে রাঙা রক্তের দাগে এখনও হয়তো পান্নালালের দেহের উত্তাপ হারায়নি।

এখন যাঁদের দেখছি

আমাদের দল

সে আজ তেতাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। আমাদের যে নিজস্ব দলটি সর্বপ্রথমে গড়ে উঠেছিল শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীঅমল হোম, শ্রীচারুচন্দ্র রায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে, তাঁরা প্রত্যেকেই আজ সাহিত্য ও ললিত কলার বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতলাভ করেছেন—এমন ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না। এথেকেই প্রমাণিত হবে, আমাদের সেই বন্ধুসভার কোন সভ্যই কেবল সাময়িক খেয়ালে মেতে সাহিত্য ও শিল্পকে অবলম্বন করেন নি, চিত্তের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে এবং সাহিত্য ও শিল্পের উচ্চাদর্শের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রেখেই তাঁরা অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন সাধনামার্গে।

আমি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে হাতমক্স করছি, স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় তখন “জাহ্নবী” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে কাগজখানি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর স্বর্গীয় সুধাকৃষ্ণ বাগচী আবার নব পর্যায়ের “জাহ্নবী” প্রকাশ করতে থাকেন এবং তাঁর পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখনীচালনা করবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেন। নামে সুধাকৃষ্ণই “জাহ্নবী”র সম্পাদক হলেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল না সম্পাদকের উপযোগী মনীষা।

সেই সময়ে পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন প্রভাত, অমল, সুধীর ও প্রেমাঙ্কুর প্রভৃতি। প্রত্যেকেই তরুণ, আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট এবং প্রভাত, অমল ও সুধীর তখনও বিদ্যালয়ে ছাত্র-জীবন যাপন করছেন। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যের আবর্তে। বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার চেয়ে সাহিত্যজগতের লেখা এবং পড়ার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি।

"জাহ্নবী" ছোট কাগজ। এবং তার কার্যালয় ও আমাদের বৈঠকও আয়তনে বড় ছিল না। কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যে সব বিষয় নিয়ে (কখনো কখনো উত্তপ্ত) আলোচনা চলত, তার মধ্যে থাকত এদেশী এবং বিদেশী সাহিত্য ও শিল্পের তাবৎ বিভাগ।

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে তখন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভূরি ভূরি দানের অভাব ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে থেকেই নূতন যুগের তিনজন কবিও—যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ ও করুণানিধান—ধীরে ধীরে আরোহণ করছিলেন খ্যাতির সোপানে। কিন্তু নূতন যুগের মান রাখতে পারেন এমন একজন প্রতিভাবান কথাশিল্পীর অভাব অনুভব করতেন সকলেই। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত থেকে রবীন্দ্র-নাথ উপন্যাস রচনার জন্যে অবসর পেতেন অল্প—যদিও অন্যান্য বিভাগের মতো কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান শিল্পী এবং সে গৌরব থেকে আজও কেউ তাকে বিচ্যুত করতে পারেন নি। লোকসাধারণের মানসক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে তাঁর দান অমৃতায়মান হলেও চাহিদা হিসাবে অপ্রচুর ছিল। মন বলত—"আরো চাই, আরো।" কিন্তু কত দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাত জোড়া, একান্তভাবে একদিক নিয়ে নিযুক্ত থাকবার সময় তাঁর কই ?

ঠিক এই সময়েই "যমুনা" পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হতে লাগল "রামের সুমতি",

"চন্দ্রনাথ", "পথনির্দেশ" ও "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি বড় গল্প ও উপন্যাস। তার কয়েক বৎসর আগে (১৩১৪ সালে) "ভারতী" পত্রিকায় "বড়দিদি" নামে শরৎচন্দ্রের একটি পুরাতন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারেই। সুতরাং অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, "ভারতী"র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন নি।

এর অল্পদিন পরেই "যমুনা"র কর্ণধার স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। আমিও গিয়ে হাজির হলুম "যমুনা"র বৈঠকে। তারপর আমাদের দলের বাকি কয়জনও আসন পাতলেন সেই আসরেই। তারপর ক্রমেই আমাদের দল বৃহত্তর হয়ে উঠতে লাগল। কারণ "যমুনা"র মজলিসে ওঠা-বসা করতেন স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রসময় লাহা, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়, স্বর্গীয় মোহিত-লাল মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক। তারপর নৈবেদ্যের উপরে চূড়া সন্দেশের মতো "যমুনা"র আসরে এসে আসীন হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিছুকাল পরে আমাদের দল পুষ্ট হয়ে উঠল অধিকতর। দলের নূতন বৈঠক বসতে লাগল "ভারতী" কার্যালয়ে। আগেকার কেহই দলছাড়া তো হলেনই না, উপরন্তু প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সুকুমার রায়চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বর্গীয় মনীষিগণও শোভাবর্ধন করতেন আমাদের দলের মধ্যে। আসতেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও নজরুল ইসলাম। আসতেন চিত্রশিল্পী শ্রীঅসিত-কুমার হালদার ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং নাট্যাচার্য শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী এবং স্বর্গীয় নাট্যশিল্পী রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মোট কথা, তখন আমাদের দলের মতো শক্তিশালী

বৃহৎ ও বিখ্যাত দল বাঙলা দেশের আর কোথাও ছিল না এবং তারপর আজ পর্যন্ত তেমন দল আর গঠিত হয়নি। চুম্বকের দিকে যেমন লৌহের আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের সেই দলের দিকে তেমনি আকৃষ্ট হোত সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিক ও শিল্পীর দৃষ্টি। সেখানে আসন লাভ করবার জন্যে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করতেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পেতেন না সকলেই।

যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বয়সে যখন অতি তরুণ ছিলেন, তাঁর তখনকার মনের কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ "(ভারতীর) ইলেকট্রিক চায়ের কেটলীর চারিদিকে যে সাহিত্য-পরিবার গড়িয়া উঠে, বাঙলা সাহিত্যের জীবনে তাহা একটি নূতন সাহিত্যিক অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে। * * * আমি জানি একটি কিশোর মনে "ভারতী"র এই সজ্ঘ কি সুন্দর পরিকল্পনার খোরাক জোগাইত! প্রয়োজনবাদের সাগরের মধ্যে সেই সজ্ঘটুকু সুন্দরের মন্দির বলিয়া মনে হইত। একদল লোক—একই অনুভূতি তাহাদের, একই সাধনা তাহাদের, একই প্রতিবন্ধক তাহাদের, একই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ। বাঙলার সাহিত্যজীবনে এই মৈত্রী-সাধনার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা যাঁহারা বাঙলা-সাহিত্যের ভিতরের সহিত সামান্য পরিচিত তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।"

আমাদের দলের পরে সাহিত্যসমাজে উল্লেখযোগ্য আর একটি মাত্র নূতন দল আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা হচ্ছে "কল্লোল"এর দল। আমাদের দলের তুলনায় তা অনেক ছোট হলেও উল্লেখযোগ্য, কারণ তার ভিতর থেকে দেখা দিয়েছেন কয়েকজন নূতন ও শক্তিশালী সাহিত্যিক। যে দল নূতন সাহিত্যিক গড়তে পারে না, তার সার্থকতা অল্প। আমাদের দল কোনদিনই গতানুগতিক ছিল না। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তা অভিনন্দন দিতে পারত। সেই জন্যেই আমাদের দলেরও কয়েকজন "কল্লোল" পত্রিকার লেখকশ্রেণীভুক্ত হতে ইতস্তত করেন নি। পরে যথাসময়ে "কল্লোল"এর দল নিয়েও আলোচনা করব।

কিন্তু আমাদের দল আর নেই। দলের অধিকাংশই আজ স্বর্গত। "যাঁদের দেখেছি" শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তাঁদের অনেকেরই কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। বাকি যাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আজও বিদ্যমান আছেন তাঁরাও হয়েছেন জরাগ্রস্ত, যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত; দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত থেকে কেউ আর কারুর খবর বড় রাখতে পারেন না, হয়তো সমুজ্জ্বল অতীতের স্বপ্ন দেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন। তাঁদেরও কয়েকজনের কথা বর্তমান নিবন্ধমালায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আরো কারুর কারুর কথা এখনো বলা হয়নি। সেই কথা বলে আমাদের দলের প্রসঙ্গ শেষ করব।

"জাহ্নবী" কার্যালয়ে আমাদের দল গড়ে ওঠবার কয়েক বৎসর আগেই শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার বয়স তখন ষোল-সতেরোর বেশি হবে না। প্রভাতের আরো কম। আমি তখন কোন কোন ছোট কাগজের লেখক এবং আমার রচিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও যন্ত্রস্থ হয়েছে—নাম তার "আমাদের জাতীয় ভাব।" বঙ্গবিভাগের পরে সারা দেশে তখন শুরু হয়েছে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন এবং তখনকার অধিকাংশ যুবকের মতো আমিও সেই আন্দোলনে মেতে উঠেছি। তখন সরকারী বাগানগুলিতে বৃটিশ-সিংহকে বাক্যবন্দুকের বুলেটের দ্বারা ঘায়েল করবার জন্যে প্রতিদিন বৈকালেই অগণ্য সভার আয়োজন করা হোত এবং আর সকলকার মতো আমিও ছিলুম সে সব সভার একজন নিয়মিত শ্রোতা।

বিডন বাগানে টহলরাম নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নেতৃত্বে প্রত্যহই হোত সভার অধিবেশন। তিনি বাঙলা জানতেন না, কিন্তু ইংরেজীতে "Curzon and Curzonians" -এর বিরুদ্ধে যে সব গরম গরম বচন ঝাড়তেন, জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি হোত অত্যন্ত শ্রবণরোচক। টহলরামের পর সেখানে আরো কেউ কেউ বক্তৃতা দিতেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রভাত ছিলেন অন্যতম। বয়সে তখন

তাঁকে কিশোর বলাই চলত, কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর মুখের উপরে বিরাজ করত দাড়িগোঁফের গভীর অরণ্য। এবং সেই বয়সেই তিনি জনসভায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন অকুতোভয়ে।

কেমন করে আমরা দুজনেই যে দুজনের দিকে আকৃষ্ট হলুম তা আর স্মরণে আসে না। তবে এইটুকু আমার মনে আছে যে, আমার রচিত পুস্তকখানি তিনি সভার শ্রোতাদের মধ্যে হাতে হাতে বিক্রয় করবার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, কারণ টহলরাম হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে সমস্ত ভেস্তে দিলেন। কারুর কারুর মুখে শুনলুম, তিনি ছিলেন ইংরেজদের গুপ্তচর। সম্ভবত মিথ্যা গুজব।

কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রভাতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। কখনো টহলরামের বাসায় তাঁদের কার্যালয়ে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করে আসতুম এবং কখনো তিনি এসে দেখা দিতেন আমার পাথুরেঘাটার বাড়িতে।

তারপর "জাহ্নবী" কার্যালয়ে গিয়ে প্রভাতের আরো কোন কোন বিশেষত্বের সঙ্গে পরিচিত হলুম। অল্প বয়সেই তিনি সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যকে রাখতে পেরেছিলেন নিজের নখদর্পণে। তিনি ছিলেন প্রায় সর্বদর্শী, প্রেমাঙ্কুর তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন "সবজান্তা লরেন্স।" কি সাহিত্য, কি ললিতকলা, কি রাজনীতি, কি ইতিহাস, কি নাট্যশিল্প, কি খেলাধুলো প্রত্যেক বিভাগেই নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাঁর আগ্রহ ছিল উদগ্র। তর্ক এবং গলাবাজিতেও তিনি যে কি-রকম তুখড় ছিলেন, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রসঙ্গে আগেই দিয়েছি তার অল্পবিস্তর নমুনা।

বাঙলাদেশে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অদ্বিতীয় লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন, "জাহ্নবী" কার্যালয়ে এসে এ-খবর সর্বপ্রথমে দেন প্রভাতচন্দ্রই। সে সময়ে এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচার করবার জন্যে প্রভাতের যে বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করেছি তাও

উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠ করে শুনিয়ে আসেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ বিজয়চন্দ্র সেই অভাবিত আবিষ্কারের সংবাদ জানান কবিবর ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে এবং তিনিও শরৎচন্দ্রের অসাধারণ রচনা-চাতুর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। প্রভাতচন্দ্র প্রভৃতির মৌখিক বিজ্ঞাপনের মহিমাতেই শরৎচন্দ্রের নাম প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রভাতচন্দ্র চিরদিনই মুখফোড়। যত বড় লোকই হোন, কারুর যুক্তিহীন উক্তিই তিনি সহ্য করতে একান্ত নারাজ। আমি যখন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "মর্মবাণী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, সেই সময়ে তাঁর কার্যালয়ে বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, "রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন। তোমরা দেখে নিও, আমি এবারে যে উপন্যাস লিখব, "ঘরে-বাইরে"র চেয়ে ওজনে তা একটুও কম হবে না।"

প্রভাতচন্দ্র অমনি তাঁর মুখের উপরে বলে বসলেন, "সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এখনো শেষ হয়নি, আর আপনার উপন্যাস এখনো লেখাই হয়নি। তবু এমন কথা আপনি কি করে বলছেন!" শরৎচন্দ্র কোন যুৎসই জবাব দিতে পারলেন না এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয়নি। তাঁর পরের উপন্যাসের নাম "গৃহদাহ"। তা "ঘরে-বাইরে"র সমকক্ষ হতেও পারেনি, বরং তার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চিত্রিত একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট অনুকরণ। শরৎচন্দ্র একখানি পত্রে নিজেই সেই অনুকরণকে চুরির নামান্তর বলে স্বীকার করেছেন!

আমি বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি, উচ্চশ্রেণীর সাংবাদিক ও সম্পাদকের যে সব গুণ থাকা উচিত, প্রভাতচন্দ্রের মধ্যে ছিল তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তিনি নিজের উপযোগী ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাননি, নানা বৈঠকে লক্ষ্যহীনের

মতো বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ও তর্কাতর্কি করে এবং কাঁড়ি কাঁড়ি বই পড়ে জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছেন। তারপর পরিণত বয়সে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম হয়ে সাংবাদিকের কাজ শুরু করেন এবং তারপর দৈনিক "ভারত"এর সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই নিজের কর্তব্যপালন করেছিলেন। কিন্তু পরে "ভারত" নিষিদ্ধ পত্রিকায় পরিণত ও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বোধ করি পত্রিকা সম্পর্কীয় কোন কারণের জন্যেই কিছুকাল তাঁকে কারাবরণও করতে হয়।

রাজনীতি নিয়ে তিনি কিশোর বয়স থেকেই মাথা ঘামিয়ে এসেছেন এবং প্রাচীন বয়সে বিধান সভার সভ্যপদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বেও যোগদান করেছেন।

আজও প্রভাতচন্দ্রের প্রকৃতি, কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি একটুও পরিবর্তিত হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হয়, তাঁর দুর্দান্ত আকার, এলোমেলো পাকা চুল ও ঘন দাড়িগোঁফের মধ্যে ফিরিয়ে পাই সেই নবীন ও পুরাতন প্রভাতচন্দ্রকেই।

আমাদের দলের আরো কিছু

যে সময়ে আমাদের দল গঠিত হয়, তখন বাঙলা ভাষা উচ্চশ্রেণীর অনুবাদ-সাহিত্যে বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না। "সাহিত্য" প্রভৃতি পত্রিকায় মাঝে মাঝে মোপাসাঁ প্রমুখ দুই-তিনজন গত যুগের লেখকের ছোটগল্প প্রকাশিত হোত, এবং তখনকার কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী লেখক (দীনেন্দ্রকুমার রায় ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) নিম্নতর শ্রেণীর বিলাতী গল্পকে মৌলিক বলে চালিয়ে দিতে ইতস্তত করতেন না।

অনুবাদ হচ্ছে সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ। অনুবাদ-সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার খুলেই ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা আজ এতটা বেড়ে উঠেছে। একমাত্র তার মাধ্যমেই আমরা পরিচিত হতে পারি পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যের সঙ্গে। বিভিন্ন দেশীয় সাহিত্যের আদর্শ চোখের সামনে এনে রাখলে বাঙলা সাহিত্যের আদর্শও যে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে, এ বিশ্বাস ছিল আমাদের বরাবরই।

কিন্তু বাঙলাদেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখকই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি সদয় ছিলেন না। এমন কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকও অনুবাদের সার্থকতা স্বীকার করতেন না। অনুবাদ করতে দেখলে আমাকে তিনি ভৎর্সনা করতেন। বলতেন, "অনুবাদ করার মানেই হচ্ছে পণ্ডশ্রম করা।" অথচ মজা এই, সাহিত্য-জীবনের পূর্বার্ধে তিনি নিজেই দুইখানি বড় বড় ইংরেজী উপন্যাস বাঙলাভাষায় তর্জমা করেছিলেন।

"জাহ্নবী"কে কেন্দ্র করে আমাদের দল যখন গড়ে ওঠে, তখন প্রথম থেকেই আমরা অনুবাদ-সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দি। তখনকার য়ুরোপের নানা দেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের

রচনার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলুম। কিন্তু কেবল তাঁদের রচনা পাঠ করেই আমরা তৃপ্তিলাভ করতে পারতুম না। ভালো জিনিস যেমন আর পাঁচজনকে খাইয়ে সুখ হয়, বাঙালী পড়ুয়াদের কাছে তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস নিবেদন করবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহ ছিল যথেষ্ট।

অনতিবিলম্বেই যাঁদের নিয়ে আমাদের দল বৃহত্তর হয়ে ওঠে, সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন ঐ একই মতাবলম্বী। সে যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁরা উপহার দিয়েছেন বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ যত কবিতার অনুবাদ করেছেন, এদেশের আর কোন কবি তা করেন নি। কিন্তু কেবল পদ্য নয়, গদ্যানুবাদেও তাঁর দান আছে। মৌলিক রচনাতেও যে পূর্বোক্ত লেখকরা প্রচুর কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, এ-কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁদের কেহই অনুবাদকে পণ্ডশ্রম বলে মনে করতেন না। তাঁরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন নিজেদের নাম কেনবার জন্যে নয়, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যেই। এ বিভাগে আমাদের দলের অবদান অতিশয় উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যে পথে অগ্রণী হয়েছিলেন, আজ সেখানে দেখা দিয়েছেন বহু নবীন পথিক। আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের ভাণ্ডার তাই ক্রমেই অধিকতর পুষ্ট হয়ে উঠছে।

আগেই বলেছি শ্রীঅমলচন্দ্র হোম যখন আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়সেও ছিলেন প্রায় কিশোর। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি ছিল বিস্ময়কর। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের হাটে নিত্য ছিল তাঁর আনাগোনা। এবং আসরে আসীন হয়ে যখন তিনি সাহিত্য ও ললিতকলার বিবিধ বিভাগ নিয়ে নিজের মতামত জাহির করতেন, তখন পাওয়া যেত তাঁর প্রভূত মনীষার পরিচয়। বিদ্যালয়ে পড়তে

পড়তে সাহিত্যের আবর্তে গিয়ে পড়লে গুরুজনদের দ্বিতীয় রিপু যে শান্ত থাকে না, নিজের জীবনেই তার প্রমাণ পেয়েছি। অমলচন্দ্রও যে গুরুজনদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন, বন্ধু-বান্ধবদের মুখেই শুনেছি এ কথা। কিন্তু সাহিত্যের নেশা হচ্ছে আফিমের মৌতাতের মতো; ধরলে আর ছাড়ান পাবার উপায় থাকে না। অমলচন্দ্রও সাহিত্যচর্চা ও আমাদের দল ছাড়তে পারেন নি। "জাহ্নবী"র আসর থেকে উঠে গিয়ে বসেছেন "ভারতী"র বৈঠকে—এবং চিরদিনই বন্ধুরূপে নির্বাচন করেছেন সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি এবং তখনও আমাদের আলাপ্য বিষয় হোত কেবল সাহিত্য ও শিল্পই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজেকে সাহিত্যিক নয়, সাংবাদিক বলেই মনে করতেন। "প্রবাসী"র জন্যে লিখতেন কেবল বিবিধ সংবাদ। কিন্তু সাহিত্য বিচারে যে তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল, সম্পাদকরূপে সেটা তিনি বিশেষভাবেই প্রমাণিত করে যেতে পেরেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রথম জীবনে গুটিকয় ছোট গল্প রচনা করেছিলেন, কিন্তু আজ আর বাজারে তার চাহিদা নেই। আর আছে তাঁর কিছু কিছু চুটকি সমালোচনা, তারও কোন স্থায়ী মূল্য নেই। অথচ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম। কিন্তু তিনি যে ছিলেন কত বড় রসবেত্তা, তাঁর "সাহিত্য" সম্পাদনার মধ্যেই আছে তার অতুলনীয় প্রমাণ। এক একজন লোক সাহিত্য সৃষ্টি না করেও সাহিত্য-সমাজে মধ্যমণির মতো বিরাজ করতে পারেন।

অমলচন্দ্রকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা চলে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যবোদ্ধা, সাহিত্য ও চারুকলা নিয়ে মুখে মুখে অনর্গল আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এবং রচনাশক্তিতেও তিনি বঞ্চিত নন। কিন্তু নিজের রচনা নিয়েই সময় কাটাবার দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক নেই। "জাহ্নবী"র জন্যে তিনি কিছু কিছু লিখেছেন বলে মনে পড়ছে। কিন্তু লেখার চেয়ে ভালো করে পত্রিকা

পরিচালনার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। "জাহ্নবী"তে হাতমক্স করে তারপর তিনি যখন "মিউনিসিপ্যাল গেজেট"এর সম্পাদকরূপে দেখা দেন, তখন তাঁর বিশেষ গুণপনা আকৃষ্ট করেছিল সকলের দৃষ্টি। একখানি সাধারণ পত্রিকাকে তিনি করে তুলেছিলেন অনন্যসাধারণ। এবং সুযোগ পেলেই ওর ভিতর দিয়েই তিনি প্রকাশ করতেন সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে নিজের রসগ্রাহিতাকে। "মিউনিসিপ্যাল গেজেট"-এর রবীন্দ্র-সংখ্যা সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে অবিস্মরণীয়। সেই সময়ে আরো অনেকগুলি পত্রিকার রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু "মিউনিসিপ্যাল গেজেট"এর সেই সংখ্যায় সুযোগ্য সম্পাদক সুদক্ষ হাতে যে সব বিচিত্র তথ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন তা হয়েছিল সবচেয়ে উপভোগ্য। অমলচন্দ্র বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, কবি সম্পর্কীয় বহু তথ্যই তাঁর নখদর্পণে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার। কাজেই তাঁকে পরের মুখে ঝাল খেতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর অচলা নিষ্ঠা এবং আমাদের দলের প্রত্যেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূজারী। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও অমলচন্দ্রের সম্পাদনায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়েও তিনি মস্তিষ্ক চালনা করেন এবং সে সম্বন্ধেও নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন একখানি পুস্তিকায়। সাহিত্য-সমাজে তা বিলক্ষণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

এখন তিনি সম্পাদকের গদী ছেড়ে অধিকার করেছেন সরকারী প্রচার-সচিবের আসন। তাঁর পক্ষে খুব গুরুতর ব্যাপার না হলেও এ-পদেরও গুরুত্ব বড় অল্প নয়।

কিশোর, তরুণ ও প্রাচীন অমলচন্দ্র জেগে আছেন আমার চোখের উপরে। তবে আগে তাঁর সঙ্গে যেমন ঘন-ঘন দেখা হোত, এখন আর তা হয় না বটে। কিন্তু কালেভদ্রে দেখা হলেই বুঝতে পারি, অমলচন্দ্রের পরিবর্তন হয়নি। তাঁর একহারা দেহ আজ দোহারা

(মাঝে তেহারাও হয়েছিল) হয়েছে বটে, কিন্তু আজও তাঁর স্বভাব হারিয়ে ফেলেনি তারুণ্যের প্রভাব। অমলচন্দ্র কোন দিন বোধ করি দেহে বুড়ো হলেও মনে বুড়ো হবেন না।

আর একজনের কথা বলে আমাদের দলের প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি হচ্ছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি হচ্ছেন একাধারে সাহিত্যিক, সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশক। সুধীরের আগে বাঙলা-দেশের আর কোন সাহিত্যিক বিখ্যাত প্রকাশকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ছে না, এখন। এই পথে দেখি একাধিক ব্যক্তিকে। অনেকেরই মতে লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের হচ্ছে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক। সুধীরের বেলায় ও-কথা খাটে না।

'জাহ্নবী'র ছোট আসরেই সুধীরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, বোধ করি তিনি তখন সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সেই পাঠদ্দশাতেই সাহিত্যিক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি করেছিলেন লেখনীধারণ। একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর রচনা।

তারপর "জাহ্নবী", "যমুনা", "সঙ্কল্প" ও "মর্মবাণী" পত্রিকা পরে পরে উঠে গেল। এ-সব কাগজের সঙ্গেই সুধীরের ও আমার সম্পর্ক ছিল। একদিন আমরা দুজনে সুকিয়া (এখন কৈলাস বসু) স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময়ে কান্তিক প্রেস থেকে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের আহ্বান করলেন।

মণিলাল বললেন, "স্বর্ণকুমারী দেবী আমার উপরে 'ভারতী'র ভার অর্পণ করতে চান। আপনারা দুজনে যদি আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সে ভার আমি গ্রহণ করতে পারি।"

তাঁর প্রস্তাবে আমরা রাজি হলুম। তারপর নতুন করে আবার "ভারতী" প্রকাশিত হতে লাগল এবং আমাদের দল রূপান্তরিত হলো "ভারতী"র দলে।

সুধীরের পিতৃদেব স্বর্গীয় এম সি সরকার রায় বাহাদুরের একখানি আইন সংক্রান্ত পুস্তকের দোকান ছিল। সুধীরও তখন বি-এ পাস

করে আইন পড়ছিলেন। তারপর হঠাৎ আইনের পড়া ছেড়ে দিয়ে বইয়ের দোকানে গিয়ে বসতে শুরু করলেন। তিনি হচ্ছেন সাহিত্যিক, শুকনো আইনের কেতাব নিয়ে নিযুক্ত থাকতে চাইলেন না। প্রকাশ করতে লাগলেন বাঙলা কথাসাহিত্যের পুস্তক। এ বিভাগে তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম তুখানি বই যথাক্রমে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার দ্বারা রচিত। আজ তিনি ফলাও করে ব্যবসা ফেঁদেছেন, "এম সি সরকার এণ্ড সন্স" হয়ে উঠেছে বাঙলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রকাশক। কিন্তু এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে একমাত্র সুধীরেরই মনীষা, সততা ও অমায়িকতা। আজ পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তি তাঁকে ঠকিয়েছে, কিন্তু কোন লেখককেই তাঁর কাছে ঠকতে হয়নি।

সুধীরের প্রধান কীর্তি "মৌচাক"। ছত্রিশ বৎসর আগে "ভারতী"র আসরে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা যখন "মৌচাক"এর নামকরণ হয়, তখন বাঙলাদেশের খুব কম লেখকই শিশু-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতেন। সুধীরের নির্বন্ধাতিশয়েই গত যুগের ও বর্তমান কালের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখক "মৌচাক"এর মাধ্যমে আমাদের শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। "মৌচাক"এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য স্বর্গীয় লেখকরা। এবং "মৌচাক" আমন্ত্রণ না করলে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল ও স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছোটদের জন্যে কলমই ধরতেন কিনা সন্দেহ! আমাকেও বড়দের আসর থেকে টেনে এনে ছোটদের খেলাঘরে নামিয়েছে ঐ "মৌচাক"ই। তার আসরে এসে আসীন হয়েছেন আজ পর্যন্ত কত বিখ্যাত লেখক, ছোটদের আর কোন পত্রিকা তেমন গর্ব করতে পারবে না।

শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তক "বড়দিদি" কোন পুস্তক-ব্যবসায়ী প্রকাশ করেননি, "যমুনা" সম্পাদক স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল তা ছাপিয়েছিলেন শখ করেই। প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সুধীরই বইয়ের বাজারে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে দেখা দেন। শরৎচন্দ্রের সর্বশেষ পুস্তক "ছেলেবেলার গল্প"ও তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত শরৎ-চন্দ্রের যখন অনটন হয়েছিল, সুধীরই তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমাদের সব সাহিত্যবৈঠক আজ অতীত স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বিদ্যমান আছে কেবল এই "মৌচাক"এর বৈঠক। যদিও তার আগেকার ঔজ্জ্বল্য আর নেই, তবু এখনো যে সে শিবরাত্রির সলতের মতো টিম টিম করে জ্বলছে, এইটুকুই হচ্ছে আনন্দের কথা। কিন্তু সেখানে বিদ্যমান আছেন আগেকার সুধীরচন্দ্রই। সেখানে গেলেই আবার মনের চোখে দেখতে পাই তাঁদের প্রিয় মুখগুলি, জীবনের যাত্রাপথে চলতে চলতে আজ যাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন— শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। মনের চোখে তাঁদের দেখি এবং মনে মনে তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি-রূপে সুধীরচন্দ্র যে চমৎকার অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, তার মধ্যে আছে চিন্তাশীলতা ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য। সুধীরের মাথার কালো চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কলমে আজও ঘুণ ধরেনি।

শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশ

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাঙলা দেশের বিভিন্ন বিভাগে এখনো এমন কয়েকজন প্রতিভাধর বাঙালী বিরাজ করছেন, সমগ্র ভারতে যাঁরা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। যেমন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর।

একটি কারণে শিশিরকুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ও নৃত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বাঙলার বাইরে উল্লেখযোগ্য সাধারণ রঙ্গালয় নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিম ভারতের একাধিক শহরে যে-সব অভিনয় দেখেছি তা রীতিমত হাস্যকর। দক্ষিণ ভারতের অনেক গুণী সাহিত্য, শিল্প ও নৃত্যচর্চায় প্রভূত শক্তি প্রকাশ করেছেন বটে এবং চলচ্চিত্রেও সেখানকার কয়েকজন খ্যাতিমানের নাম করা যায়, কিন্তু আধুনিক কালেও সেখানে দানীবাবু, নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র মিত্র ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় একজন শিল্পীকেও আবিষ্কার করা যাবে না।

এ আমার নিজস্ব মত নয়। কিছুদিন আগে বোম্বাই প্রদেশ থেকে আগত একটি বিদুষী মহিলাকে আমি কলকাতার কোন কোন রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "অভিনয় যে এমন অপূর্ব হওয়া সম্ভবপর, দক্ষিণ ভারতে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে অভিনয়ের যে আয়োজন হয়, এখানকার তুলনায় তাকে অভিনয় বলাই চলে না।" বিশেষভাবে তাঁকে অভিভূত করেছিল শিশিরকুমারের কৃতিত্ব। তাঁকে

তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি আমাদের দেশে যান, তাহলে সর্বত্রই অভিনন্দন লাভ করবেন।"

এবারে আমরা শিশিরকুমারের কথাই বলব। কিন্তু তাঁর গুণপনা ভালো করে বুঝতে হলে কি-রকম পটভূমিকার উপরে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া দরকার।

গিরিশোত্তর কালে প্রায় একযুগের মধ্যে বাঙলা রঙ্গালয়ে এমন একজন নূতন শিল্পীকে দেখা যায়নি, যিনি দ্বিতীয়—এমন কি তৃতীয়—শ্রেণীতেও স্থানলাভ করতে পারেন। গিরিশ-যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে তখনও বিদ্যমান ছিলেন যে কয়েকজন বিখ্যাত নট-নটী, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দানীবাবু, তারকনাথ পালিত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী।

কিন্তু দানীবাবুর তারকা তখন আর ঊর্ধ্বগামী নয়। তিনি ভালো অভিনয় করেন বটে, কিন্তু যারা আগেকার দানীবাবুকে দেখেছিল, তারা তাঁর অভিনয়ের ভিতর থেকে আর কোন নূতনত্ব আবিষ্কার করতে পারত না।

তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীর শক্তি তখনও অটুট ছিল। আমার তো মনে হয়, নাট্যজীবনের উত্তরার্ধেই অপরেশচন্দ্রের নাট্যনৈপুণ্য উঠেছিল অধিকতর উচ্চশ্রেণীতে। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে প্রাকৃতজনরা সে সময়ে দস্তুরমত দলে ভারি হয়ে উঠেছিল। উচ্চ-শ্রেণীর অভিনয়ের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর নাটকের রোমাঞ্চকর ঘাতপ্রতিঘাতই তাদের আকৃষ্ট করত বেশি মাত্রায়।

ওথেলো নাটকে তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরী অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের সহানুভূতির অভাবে সে নাটকের পরমায়ু হয়েছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ইবসেন অবলম্বনে রচিত "রাখীবন্ধন" নাটকেও তারক পালিত ও তারাসুন্দরীর অভিনয় হয়েছিল যার-পর-নাই চমৎকার। কিন্তু সে নাটকও দর্শক আকর্ষণ করতে পারে নি। তারপরেই তারক পালিতও রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ

করেন। কিন্তু তখনকার দর্শকরা অমন উঁচু দরের একজন শিল্পীরও অভাব অনুভব করেছিল বলে মনে হয় নি। আজকাল কাগজে কাগজে নাট্যজগতের রামা-শ্যামার যা-তা খবর প্রকাশ করা হয়; কিন্তু নাট্য-জগতে যাঁর স্থান ছিল ঠিক দানীবাবুর পরেই, সেই তারক পালিত কবে ইহলোক ত্যাগ করেন, সে খবর পর্যন্ত কোন কাগজেই স্থান পায় নি।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। শুনলুম মনোমোহন থিয়েটারে একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়ছে। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলুম। কিন্তু পুরো এক অঙ্ক পর্যন্ত অভিনয় দেখতে পারলুম না—যেমন নিকৃষ্ট নাট্যকারের রচনা, তেমনি প্রাণহীন অভিনয়! দানীবাবু পর্যন্ত নূতন কোন চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা না করে নিজের পূর্বসঞ্চিত পণ্যের (Stock-in-trade) ভিতর থেকে বেছে বেছে যে কলাকৌশলগুলি প্রয়োগ করে গেলেন, তা ঘন ঘন হাততালির দ্বারা অভিনন্দিত হলো বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই ছিল আমার কাছে সুপরিচিত। বিতৃষ্ণা ভরা মন নিয়ে প্রকাশ্যে নাটক ও অভিনয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে প্রেক্ষাগার ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। মজা দেখলুম এই, জনপ্রাণীও আমার বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করলে না।

মনোমোহন থিয়েটারের পরেই লোকপ্রিয় ছিল তখন মিনার্ভা থিয়েটার। সেখানে আমার রচিত একখানি নাটিকা অভিনীত হয়েছিল। সেই সূত্রে আমি প্রায়ই রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে আনাগোনা করতুম। অবিলম্বে একখানি নূতন নাটকের মহলা শুরু হবে শুনলুম। একদিন গিয়ে দেখলুম নূতন পালার আপন আপন ভূমিকা নিয়ে মিনার্ভার দুইজন বিখ্যাত নট পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। একজন আর একজনকে ডেকে বললেন, "ওহে, পার্ট নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তো অমুক পালায় অমুক পার্ট করেছ। এ পার্টটাও তারই মতো। সেই পার্টটার মতো করে এটা ছকে নিলেই চলবে।"

কথা শুনে বিস্মিত হলুম। সত্যিকার অভিনেতারা এক একটি পুরাতন ভূমিকাও নূতন নূতন ধারণা (Conception) অনুসারে প্রস্তুত করে তুলতে চেষ্টা করেন, আর এঁরা পুরাতন ভূমিকার ছাঁচে ফেলেই তৈরি করতে চান নূতন ভূমিকা!

আসল কথা, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনেতার স্বাধীন মস্তিষ্কের সঙ্গে থাকত না অভিনয়ের সম্পর্ক। ধরা-বাঁধা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সকলে কাজ করে যেতেন কলের পুতুলের মতো। যে সব নাটকের চরিত্র, ভাব ও ভাষা হোত সম্পূর্ণ অভিনব, তখনকার বেশির ভাগ অভিনেতার কাছেই তা হয়ে উঠত অত্যন্ত গুরুপাক।

এই জন্যেই নব্য বাঙলার সুধীসমাজের সঙ্গে গিরিশোত্তর যুগের বাঙলা রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার সুযোগ হয়নি। শিক্ষিত ও সুরসিক দর্শকরা যে বাঙলা রঙ্গালয়কে একেবারেই বয়কট করে ছিলেন এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু দলে হালকা ছিলেন তাঁরা এবং দলে ভারি ছিল সেখানে প্রাকৃতজনরাই। প্রায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা রঙ্গালয়ের অবস্থা ছিল অল্পবিস্তর একই রকম। এ অবস্থা যে হঠাৎ পরিবর্তিত হবে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যায়নি তখন পর্যন্ত।

এই সময়ে কলকাতার ওল্ড ক্লাব নামক শৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্টার থিয়েটারে একটি সাহায্য রজনীর আয়োজন হয়। সৌখীন শিল্পীদের উপরে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তবু উপরোধে পড়ে একখানি টিকিট কিনি। শুনলুম য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের শিশিরকুমার ভাদুড়ী "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। প্রফেসররূপে তাঁর খ্যাতি আগেই আমার কানে গিয়েছিল এবং লোকের মুখে মুখে শুনতুম, তিনি নাকি ভালো অভিনয় করেন। কিন্তু অতি-সেকেলে পৌরাণিক নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"-এ একজন আধুনিক অধ্যাপক এমন কি স্মরণীয় অভিনয় করবেন, সেটুকু ধারণায় আনতে পারলুম না।

যবনিকা উঠল। দেখা গেল প্রথম দৃশ্য। গোড়া থেকেই দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত, তারপর ক্রমে ক্রমে যা দেখতে ও শুনতে লাগলুম, আমার কাছে ছিল তা একেবারেই অভাবিত ব্যাপার! সেকেলে নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"কে মনে হলো আনকোরা নতুনের মতো। অভিনেতাদের চেহারাই খালি সুন্দর নয়, প্রত্যেকের ভাব, অঙ্গভঙ্গী, সংলাপ—এমন কি প্রবেশ ও প্রস্থানের পদ্ধতি পর্যন্ত কল্পনাতীত-রূপে অভিনব। কোথাও বহুপরিচিত কৃত্রিম থিয়েটারি ঢং নেই, প্রয়োগকৌশলেও প্রভূত স্বাতন্ত্র্য। এ-রকম উপভোগ্য বিস্ময়ের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না, আমার অবস্থা হলো আকাশ থেকে সদ্য-পতিতের মতো।

আর একটা ব্যাপার সেইদিনই লক্ষ্য করলুম। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় দেখে আসছি। কিন্তু বাঙলা রঙ্গালয়ে কোনদিনই কোন পালাতেই প্রত্যেক নট-নটীকে সমানভাবে একসঙ্গে আপন আপন ভূমিকার উপযোগী অভিনয় করতে দেখিনি। এমন কি যে পালায় গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি অতুলনীয় অভিনেতারা থাকতেন, সেখানেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অপ্রধান ভূমিকাগুলির অভিনয় প্রায়ই হোত নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর। তাই দেখে দেখে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে, কৌতুক বোধ করলেও অসুবিধা বোধ করতুম না। লোকে তখন এক-একজন বিখ্যাত ব্যক্তির উচ্চশ্রেণীর অভিনয় দেখলেই পরিতুষ্ট হোত, ছোট ছোট ভূমিকা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাত না।

কিন্তু "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"এর সেই শৌখীন পুনরভিনয়েই বাঙলা রঙ্গালয়ে প্রথম দেখলুম, নাট্যাভিনয়ে প্রত্যেকেই—এমন কি মূক দৌবারিকটি পর্যন্ত ভূমিকার উপযোগী নিখুঁত অভিনয় করে গেল। এও এক আশ্চর্য অগ্রগতি। শিশিরকুমারের যে কোন নাট্যানুষ্ঠানে আজ পর্যন্ত এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আগে আর কেউ এদিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টি দেননি। কেবল অর্ধেন্দুশেখর এদিকে দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টাও সম্পূর্ণরূপে সুফল প্রসব

করতে পারত না। কিন্তু তাঁরও একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। গিরিশচন্দ্রের উক্তি থেকে জানতে পারি, অনেক সময়ে তিনি বড় বড় ভূমিকাকে অবহেলা করে ছোট ছোট ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"এর সেই অভিনয়ে শিশিরকুমার যে প্রথম শ্রেণীর কলাকুশলতা প্রকাশ করলেন, এতদিন পরে তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা না করলেও চলবে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভেবেছিলুম দেখব কোন নবীন শিক্ষার্থীকে, কিন্তু গিয়ে দেখলুম এক প্রতিভাবান ওস্তাদকে। তারপর সেইদিনই খবর পেলুম, শৌখীন শিল্পীরূপে এই হচ্ছে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয়, অদূর ভবিষ্যতেই তিনি আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করবেন। মন আশান্বিত হয়ে উঠল।

সেদিনকার নাট্যানুষ্ঠানে আরো যাঁদের দেখা পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যেও নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ললিতমোহন লাহিড়ী, ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দৃশ্য-পরিকল্পক) পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়ে নাম কিনে গিয়েছেন। এক দলে এতগুলি গুণীর আবির্ভাব! একালে আর কোন শৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠান এমন গৌরব অর্জন করতে পারে নি।

আমি তখন দৈনিক "হিন্দুস্থান" পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার পৃষ্ঠায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই অভিনব শিল্পী সম্প্রদায়কে অভিনন্দন দান করলুম। তার ফলেই আমি শিশিরকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হই।

অনতিবিলম্বেই "আলমগীর" নাটকের নাম-ভূমিকায় শিশির-কুমারের রঙ্গাবতরণ হলো ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এতদিন সাধারণ রঙ্গালয়কে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন না, সেই বিদ্বজ্জনগণ দলে দলে এসে প্রেক্ষাগৃহকে পরিপূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। যাঁরা কখনো সাধারণ রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন নি, তাঁদেরও দেখা পাওয়া যেতে লাগল কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে। বাঙলা রঙ্গালয়ের জন্যে নূতন এক শ্রেণীর দর্শক তৈরি হয়ে উঠল।

শিশিরকুমারের নাট্যসাধনা

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। মনোমোহন থিয়েটারে, স্টার থিয়েটারে ও মিনার্ভা থিয়েটারে যথাক্রমে অভিনীত হচ্ছে "হিন্দুবীর", "অযোধ্যার বেগম" ও "নাদির শাহ" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক। কি ইতিহাসের দিক দিয়ে এবং কি নাটকত্বের দিক দিয়ে এ-নাটক তিনখানি আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না—সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। তবে প্রধানত স্বর্গীয়া তারাসুন্দরীর অপূর্ব নাট্যনৈপুণ্যের গুণে "অযোধ্যার বেগম" যথেষ্ট পরিমাণেই রসিক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা আছে দেখে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন—"আলমগীর"। এ পালাটির মধ্যে পূর্বোক্ত তিনখানি নাটকের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর ভাব, ভাষা, চরিত্র-চিত্রণ ও অবস্থা-সঙ্কট (situation) থাকলেও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাবলীর মধ্যে এখানি উচ্চাসন দাবি করতে পারে না। যতদূর জানি, পালাটি তখনকার কোন রঙ্গালয়ে পঠিত হয়েছিল, কিন্তু গৃহীত হয় নি। নির্বাচকরা তার মধ্যে কোন সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এই সময়ে ম্যাডানরা বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি খুলে পরদেশীয় আগা হাসারকে অবলম্বন করে "অপরাধী কে?" প্রভৃতি পালা বা ছেলেখেলা দেখিয়ে বাঙালীকে ভোলাতে না পেরে হাবুডুবু খেয়ে থই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উপায় না দেখে তাঁরা (হয়তো মরিয়া হয়েই) প্রবৃত্ত হলেন নূতন পরীক্ষায়। দৃষ্টিপাত করলেন শৌখীন নাট্যজগতের দিকে—সেখানকার নটনায়ক ছিলেন অধ্যাপক শিশির-কুমার ভাদুড়ী। তাঁদের আহ্বানে সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে নবীন

অধ্যাপক শিশিরকুমার প্রথমেই নির্বাচন করলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর" নাটক। নাট্যবোদ্ধা শিশিরকুমারের বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, এই পালাটির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-কৌশল দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মঞ্চস্থ হলো "আলমগীর"। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশোত্তর যুগের বাঙলা নাট্যজগতের অচলায়তনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো সঞ্চারিত হয়ে গেল এক অভাবিত প্রতিভার দীপ্তি। প্রথম থেকেই শিশিরকুমার এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। প্রথম থেকেই সকলে উপলব্ধি করতে পারলে আধুনিক যুগে তিনি হচ্ছেন অতুলনীয়। এবং প্রথম থেকেই বিপুল জনসাধারণ তাঁকে একবাক্যে দান করলে অবিস্মরণীয় অভিনন্দন।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বাঙলা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবেশ (environment)। আগে ছিল সেখানে নিম্নশ্রেণীর গ্যালারীর দেবতাদের প্রভাব ও উপদ্রব, যাদের জন্যে রঙ্গালয় হয়ে উঠেছিল প্রায় ইতরদের আড্ডাখানার মতো। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সেখানে সঙ্কুচিত ভাবে যেতেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রাধান্য ছিল নগণ্য। কিন্তু শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পরে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে গিয়ে দেখতুম, ইতরজনরা আত্মগোপন করেছে কোন অন্তরালে এবং অধিকাংশ আসন অধিকার করে আছেন মার্জিতমুখ বিদ্বজ্জনগণ। কেবল কি ভদ্র পুরুষরা? সেই প্রথম দেখলুম দলে দলে ভদ্রমহিলা উপরতলা ছেড়ে একতলায় নেমে এসে পুরুষদের পাশে নির্ভয়ে বসে অভিনয় দর্শন করছেন। এও ছিল কল্পনাতীত।

"আলমগীর"এর পর "চাণক্য" ও "রঘুবীর"এর নামভূমিকায় শিশিরকুমারের প্রতিভা যে অনন্যসাধারণ, এ সম্বন্ধে কারুর আর কোন সন্দেহই রইল না।

মনোমোহন থিয়েটার তখনও দেওয়ালের লিখন পাঠ করতে পারলে না, কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র

ও অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বাতাস কোন্ দিকে বইছে, সেটা বুঝতে তাঁদের দেরি লাগল না। তাঁরা ধরনা দিলেন শৌখীন নাট্যজগতের আর দুইজন প্রখ্যাত অভিনেতার কাছে—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র। তাঁরাও মিনার্ভায় এলেন এবং লাভ করলেন শিক্ষিত দর্শকের অভিনন্দন।

এদিকে শিশিরকুমার উপলব্ধি করতে পারলেন একটি নিশ্চিত সত্য। পরের চাকরি করে দিন গুজরান করতে তিনি আসেন নি নাট্যজগতে। নাট্যকলার প্রত্যেকটি বিভাগ নিজের নখদর্পণে রেখে কর্তৃত্ব করবার অধিকার না থাকলে নাট্যজগতে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না অখণ্ড, অভিনব সৌন্দর্য। ম্যাডানদের কাছে সে স্বাধীনতা পাবার সম্ভাবনা নেই। তিনি আবার অদৃশ্য হলেন যবনিকার অন্তরালে।

কিছুদিন কাটল চলচ্চিত্র নিয়ে। তাঁর পরিচালনায় দেখানো হলো শরৎচন্দ্রের প্রথম চিত্রকাহিনী "আঁধারে আলো"।

ইতিমধ্যে নবযুগের অগ্রনেতারূপে যে নূতন মার্গের সন্ধান তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তার উপরে দেখা যেতে লাগল নব নব মার্গিককে। তাঁকে হারিয়ে ম্যাডানরা অবলম্বন করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে। তারপর চোখ ফুটল স্টার থিয়েটারের। আর্ট সম্প্রদায়ের পরিচালনায় সেখানে দেখা দিয়ে তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ শিল্পীর দল "কর্ণার্জুন"এর মতো নিতান্ত সাধারণ নাটককেও নিজেদের অভিনয়গুণে অসাধারণ রূপে সাফল্যমণ্ডিত করে তুললেন। বাঙলা রঙ্গালয় যে চায় নব যুগের শিল্পী, শিশিরকুমার সর্বপ্রথমে যদি এ সত্য প্রমাণিত না করতেন, তাহলে আজও হয়তো আমাদের সহ্য করতে হতো বালখিল্যদের অত্যাচার। নির্মলেন্দু আমার কাছে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছিলেন, "শিশিরবাবু আগে না এলে পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেবার সাহস আমাদের হতো না।" সুতরাং শিশির-কুমারকে মাত্র জনৈক ব্যক্তি না বলে একটি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা

যায় অনায়াসেই। এ-কথা হয়তো কারুর কারুর পছন্দসই হবে না, কিন্তু এ-কথা অত্যুক্তি নয়। যে-কোন বাঙলা রঙ্গালয়ের দিকে তাকালেই দেখা যাবে তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্যের দলকে। জেনে বা না জেনে অনেকেই করেন তাঁরই অনুসরণ।

সেটা ঠিক কোন্ বৎসর স্মরণ হচ্ছে না, তবে ১৯২৩ কি ২৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইডেন গার্ডেনে বসে মস্ত এক প্রদর্শনী। কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে শিশিরকুমার আবার সেখানে পাদপ্রদীপের আলোকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পান। তিনি ললিতমোহন লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীরবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেককে নিয়ে গড়ে তুললেন একটি নূতন সম্প্রদায় এবং নাটক নির্বাচন করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'। প্রথমে নির্মলেন্দু লাহিড়ীও সম্প্রদায়ে ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনায় (বোধ করি পিতৃবিয়োগ) শেষ পর্যন্ত অভিনয়ে যোগ দিতে পারেন নি—কেবল একদিন কি দুইদিন শম্বুকের ভূমিকায় মহলা দিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার নাট্যাচার্য ও পরিচালক রূপে শিশিরকুমার অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কাজ করবার ক্ষেত্র পেলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই। ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতেই। অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য হলো এমন উচ্চশ্রেণীর যে, রাত্রির পর রাত্রি ধরে প্রেক্ষাগৃহে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকত না। প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ হয় নি। বেশ বোঝা গেল, সাধারণ রঙ্গালয়ে অল্পদিন অভিনয় করবার পর দীর্ঘকাল চোখের আড়ালে থেকেও শিশিরকুমার জনসাধারণের মনের আড়ালে যান নি। সবাই তাঁকে চায়! তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্থির করলেন দ্বিজেন্দ্র-লালের "সীতা" নিয়ে স্বাধীন ভাবেই আবার দেখা দেবেন সাধারণ রঙ্গালয়ে। ভাড়া নেওয়া হলো আলফ্রেড থিয়েটার।

দুর্ভাগ্যক্রমে "সীতা"র অভিনয়স্বত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল।

কিন্তু শিশিরকুমার হতাশ হলেন না। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে প্রস্তুত করতে লাগলেন রাম-সীতার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নতুন একটি পালা। "সীতা"কে সব দিক দিয়ে অভিনব ও নবযুগের উপযোগী করে তোলবার জন্যে শিশিরকুমার প্রস্তুত হতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল আলফ্রেড থিয়েটারের অভিনয়। সেইটেই হলো কুবিখ্যাত মনোমোহন থিয়েটার তথা পুরাতন দলের পতনের প্রধান হেতু।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। আলমগীরের ভূমিকায় শিশির-কুমারের প্রথম আবির্ভাবের সময়েই লোকের চোখ ফোটে সর্বপ্রথমে। প্রাকৃতজন ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করতে পারে যে, গিরিশোত্তর যুগের অভিনয় এ দেশে আর চলবে না। মনোমোহন ছিল ঐ শ্রেণীর অভিনয়ের প্রধান কেন্দ্র। তারপর শিশিরকুমার গেলেন অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু মনোমোহনের পাণ্ডারা আস্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে না ছাড়তে রঙ্গভূমে প্রবেশ করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী (বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি) ও "কর্ণার্জুন"এর নবাগত শিল্পীবৃন্দ (আর্ট থিয়েটার লিঃ)। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু মনোমোহনও নেববার আগে আর একবার জ্বলে উঠল তৈলহীন প্রদীপের মতো। "বঙ্গে বর্গী" (ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই পালাটির নাম দিয়েছিলেন "বঙ্গে মুর্গী") নামক "অখাদ্য" নাটকও দানীবাবুর লম্ফঝম্প ও তর্জনগর্জনের মহিমায় গ্যালারির দেবতাদের অসামান্য দয়াদাক্ষিণ্য লাভ করে। মনোমোহনের অধঃপতনের মুখে সেই পালাটিই হলো ঠেকোর মতো, তার সাহায্যেই সে আর্ট থিয়েটারের নবাগতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনরকমে সামলে নিতে পারলে। তারপর সে খুললে "আলেকজাণ্ডার"। কিন্তু তরুণ দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় জরাজর্জর দানীবাবুকে কেউ দেখতে চাইলে না। এই সময়েই শিশিরকুমারের পুনরাগমন। ওদিকে আর্ট সম্প্রদায় এবং এদিকে শিশির সম্প্রদায়—দুই দিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, মনোমোহনের নাভিশ্বাস

উঠতে বিলম্ব হলো না। দীপ-নির্বাণের আগে আবার সে খুললে নূতন নাটক "ললিতাদিত্য"। কিন্তু তবু সে বাঁচতে পারলে না। সেখানে আবার নূতন আসর পেতে যবনিকা তুললেন শিশিরকুমার। অভিনীত হলো "সীতা"—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে।

ঐ তারিখটি বাঙলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সোনার হরফে লিখে রাখবার মতো। কারণ "সীতা" নাট্যাভিনয়ে অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের যে সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল, আগে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার অভিনয়ে নূতনত্ব, তার দৃশ্যসংস্থানে নূতনত্ব, তার গানের সুরে নূতনত্ব, তার নৃত্য-পরিকল্পনায় নূতনত্ব। অল্পবিস্তর দুর্বলতা ছিল কেবল নাট্যকারের রচনায়, কিন্তু শিশিরকুমারের অপূর্ব আবৃত্তির ইন্দ্রজালে অভিভূত হয়ে সে দুর্বলতাটুকু সাধারণ দর্শকরা উপলব্ধি করতে পারত না। শ্রেষ্ঠ কবি, শিল্পী, পণ্ডিত, দেশনেতা ও মহারাজা একযোগে "সীতা" নাট্যাভিনয়ের জন্যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছেন প্রশস্তি রচনা। সেই দিন থেকেই বাঙলা নাট্যজগতে এসেছে সত্যকার যুগান্তর এবং সবাই পেয়েছে সম্যকভাবে শিশির-প্রতিভার পরিচয়।

তারপর একে একে অভিনীত হতে লাগল বিচিত্র সব নাটকের পর নাটক—"পাষাণী", "পুণ্ডরীক", "ভীষ্ম", "জনা", "দিগ্বিজয়ী", "ষোড়শী", "সাজাহান", "বিসর্জন", "শেষরক্ষা", "প্রফুল্ল" ও "তপতী" প্রভৃতি এবং প্রত্যেক পালাতেই শিশিরকুমার দেখালেন নূতন প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও নানা ভূমিকার নূতন নূতন ধারণা। তারপরেও কত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন এবং এখনো করছেন, কিন্তু এমনি অসাধারণ তাঁর তারুণ্য যে, এই প্রাচীন বয়সেও তাঁর শক্তি এতটুকু জীর্ণ না হয়ে অধিকতর প্রবল হয়ে পথ কেটে নেয় নব নব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। সে সব কথা এখানে বলা বাহুল্য। আমি আজ তাঁর অভিনয়ের সমালোচনা করতে চাই না, কারণ সে কাজ করেছি বিভিন্ন

পত্রিকায় বারংবার। এখানে দেওয়া হলো কেবল তাঁর কর্মজীবনের একটি রেখাচিত্র।

রঙ্গমঞ্চের উপরে অভিনেতা শিশিরকুমারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছেন সকলেই। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে বাস করেন যে শিল্পী, সাহিত্যরসিক, সংলাপপটু ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, তাঁকে দেখবার ও জানবার সুযোগ হয়নি বাইরের লোকের। এইবারে সেই কথা বলে সাঙ্গ করব বর্তমান প্রসঙ্গ।

নেপথ্যে শিশিরকুমার

শিশিরকুমার যে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করবেন সে কথা তখন পাকা হয়ে গিয়েছে। একদিন বৈকালে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে স্বর্গীয় বন্ধুবর গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায় বসে আছি। গজেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও সামাজিক মানুষ। তখনকার সাহিত্য-সমাজের সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর বৈঠকে প্রত্যহ এসে আসন গ্রহণ করতেন প্রবীণ ও নবীন বহু সাহিত্যিক ও অন্যান্য শ্রেণীর শিল্পী। তিনি ছিলেন সকলেরই "গজেনদা"।

সেইখানেই এসে উপস্থিত হলেন গজেনদার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামগোপাল ঘোষের সঙ্গে শিশিরকুমার, ছাত্রজীবনে ওঁরা দুজনে ছিলেন সহপাঠী। প্রথমেই চিনি চিনি করেও ভালো করে শিশির-কুমারকে চিনতে পারলুম না, কারণ তার আগে তাঁকে একবারমাত্র দেখেছিলুম "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাট্যানুষ্ঠানে অভিনেতার ছদ্মবেশে।

কিন্তু তাঁর চেহারা যে আমার দৃটি আকর্ষণ করল, সে কথা বলাই বাহুল্য,—তাঁর মূর্তি আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার কারণ কেবল দৈহিক সৌন্দর্য নয়, শিশিরকুমারেরও চেয়ে সুপুরুষ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে যে ধী, প্রতিভা ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আছে, সাধারণত তা দুর্লভ। দেখলেই মনে হয়, মানুষটি গুণী অনন্যসাধারণ।

আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলুম। কথা আরম্ভ করলেন তিনি সাধারণভাবেই। বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'এর যে সমালোচনা বেরিয়েছে, শুনলুম সেটি আপনার লেখা। আমার ভালো লেগেছে।"

জবাবে কি বলেছিলুম মনে নেই। "আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম"—হয়তো বলেছিলুম এই রকম কোনও কথাই।

তারপর শিশিরকুমার বেশ খানিকক্ষণ ধরে বসে বসে বাক্যালাপ করে গেলেন। প্রথম দিনেই উপলব্ধি করতে পারলুম, তিনি অনায়াসেই অভিনেতা না হয়ে সাহিত্যিক হতে পারতেন। কারণ তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল নির্গত হতে লাগল কাব্য ও আর্টের কথা। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর সংলাপ শুনেছি। গিরিশচন্দ্রের সংলাপ সম্বলিত একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের সংলাপ ছিল জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ছিলেন গ্রন্থকার। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সাহিত্যিকদের মতো আলাপ করা সম্ভবপরই ছিল। কিন্তু বাঙলা দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত নটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোগ স্থাপন করে দেখেছি, তাঁরা সাহিত্যিকদের মতো আলাপ করবেন কি, তাঁদের অনেকেরই স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যরসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কই নেই। এমন সব নামজাদা অভিনেতাও দেখেছি, যাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা দূরে থাক, ঘরের জিনিস রবীন্দ্ররচনারও সঙ্গে পরিচিত নন। "শেষের কবিতা" সামনে ধরলে তাঁরা চোখে সরষে ফুল দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন। একাধিক গণ্ডমূর্খও এখানে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলেও অভিনন্দিত হয়েছেন। নাটকও সাহিত্যের অন্তর্গত। সাহিত্যরসে বঞ্চিত হয়েও নাট্যাভিনয়ে তাঁরা নাম কিনেছেন হয়তো কেবল গুরুকৃপাতেই। তাঁদের কাছে গিয়ে শুনেছি শুধু আজেবাজে গালগল্প।

এমন কি, কাব্য ও ললিতকলা নিয়ে শিশিরকুমারের মতো মুখে-মুখে বিচিত্র আলোচনা করতে পারেন, এরকম সাহিত্যিকও আমি খুবই কম দেখেছি। সাধারণ কথায় তিনি বড় কান পাতেন না, অশ্রান্তভাবে বলতে ও শুনতে চান কেবল আর্ট ও সাহিত্যের যে কোন প্রসঙ্গ এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই আবৃত্তি করে যান স্বদেশী ও বিদেশী কবিদের বচনের পর বচন। কেবল তাঁর অভিনয় দেখা নয়, তাঁর

সঙ্গে আলাপ করাও একটি পরম উপভোগ্য আনন্দ। এই প্রাচীন বয়সেও এবং রঙ্গালয় সম্পর্কীয় নানা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েও তাঁর কাব্যগত শিল্পীর প্রাণ একটুও শ্রান্ত বা অন্যমনা হয়ে পড়েনি,—গানের পাখি যেমন গান গাইবেই, শিশিরকুমারের রসনাও তেমনি শোনাবেই শোনাবে শিল্প ও সাহিত্যের বাণী। নির্জন বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করি। সেখানে যখন মাঝে মাঝে শিশির-কুমারের আবির্ভাব হয়, আমার মনে জাগে অপূর্ব আনন্দের প্রত্যাশা। নির্জনতা পরিণত হয় যেন জনসভায়—কানে শুনি কত গুণীর, কত কবির ভাষা। শিশিরকুমার একাই একশো।

রবীন্দ্রনাথ কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অতিশয় ভালোবাসতেন, তাঁর অকালমৃত্যু তাঁকে অভিভূত করেছিল। তাই প্রাণের দরদ ঢেলে রচনা করেছিলেন অসাধারণ ও সুদীর্ঘ একটি শোক-কবিতা। কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্যে একটি জন-বহুল শোকসভার অনুষ্ঠান হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে ভাবগম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে সেই কবিতাটি পাঠ করেন। সভাস্থলে শ্রোতা ছিলেন অসংখ্য সাহিত্যিক ও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে শিশির-কুমারও। সকলের মনকেই একান্ত অভিভূত করে তুলেছিল মৃত কবির উদ্দেশ্যে কবিগুরুর সেই অপূর্ব ভাষণ।

সভাভঙ্গের পর আমাদের সঙ্গে শিশিরকুমারও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভাই, আমার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যদি এই রকম একটি কবিতা রচনা করেন, তাহলে এখনি আমি চলন্ত মোটরের তলায় চাপা পড়ে মরতে রাজি আছি।" বাঙলা দেশের আর কোন অভিনেতার—এমন কি সাহিত্যিকেরও মুখ দিয়ে নির্গত হতো না এমন উক্তি। এর মধ্যে একসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনার অতুলনীয়তা সম্বন্ধে কাব্য-গতপ্রাণ শিশিরকুমারের মনের ভাব। একসঙ্গে সমালোচন ও মহাপুরুষার্চন।

শিশিরকুমার অভিনেতা, সুতরাং নাট্যজগৎ নিয়েই তাঁর একান্ত-ভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকবার কথা। যেমন ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি সামাজিক ও সাহিত্যিক বৈঠকে বা সভায় যেতে চাইতেন না। কিন্তু শিশিরকুমারের প্রকৃতিতে দেখি এর বৈপরীত্য। নাট্যসাধনাকেই জীবনের প্রধান সাধনা করে তুলেছেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতিবেশ তাঁকে সর্বক্ষণ খুশি করে রাখতে পারে না—তাঁর চিত্ত কামনা করে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গ।

অধুনালুপ্ত "ভারতী"র বৈঠক এখনকার সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে যাঁরা ওঠা-বসা করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রপন্থী সাহিত্যিক। শেষের দিকে সেই বৈঠকে যখন কতকটা মন্দা পড়ে এসেছে, তখনই শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তখন সকালে আসর বসত "ভারতী" কার্যালয়ে এবং সন্ধ্যার সময়ে বসত গজেনদার বাড়িতে। শিশিরকুমার প্রায়ই হাজিরা দিতেন দুই বৈঠকেই এবং প্রধান কাব্যরস পরিবেশকের ভার গ্রহণ করতেন সংলাপপটু শিশিরকুমারই। যে কোন সাহিত্যিকের সঙ্গেই তিনি অনায়াসে ভাব বিনিময় করতে পারতেন। হাসি, গল্প ও কাব্যপ্রসঙ্গ নিয়ে কেটে গিয়েছে সুদূর অতীতের যে সুমধুর প্রহরগুলি, আর তা ফিরে আসবে না বটে, কিন্তু তাদের স্মরণ করলে মনের মধ্যে আজও শুনতে পাই মাধুর্যের সঙ্গীত।

এই সাহিত্যপ্রীতির জন্যে শিশিরকুমারও চিরদিন আকৃষ্ট করেছেন সাহিত্যিকদের। তাঁর "নাট্যমন্দির" হয়ে উঠেছিল সাহিত্যিকদের অন্যতম বৈঠকের মতো। অভিনয় বা মহলা যখন বন্ধ হতো, শুরু হতো তাঁদের আলাপ-আলোচনা। অনেক রাতের আগে আসর ভাঙত না। তখনকার বৈঠকধারীদের কেউ কেউ এখন স্বর্গগত। কেউ কেউ জরা বা ব্যাধিগ্রস্ত এবং কেউ কেউ জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত ; আর কোন বৈঠকেই যাবার শক্তি বা সময় তাঁদের নেই। তাঁদের অভাব শিশিরকুমার অনুভব করেন নিশ্চয়ই, তাই মাঝে মাঝে নিজেই পুরাতন

বন্ধুদের কাছে এসে দু-দণ্ড হাঁপ ছেড়ে যান।

শিশিরকুমারের মতো অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আমি এ যুগের রঙ্গালয়ে আর একজনও দেখিনি। সাহিত্যজগতেও তাঁর মতো পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি নয়। বই পড়া তাঁর এক মস্ত নেশার মতো, বই বিনা তিনি থাকতে পারেন না। নতুন ভালো বই দেখলেই তখনই তা কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে বলেন, "হাতে যদি আরো বেশি টাকা পাই, তাহলে মনের সাধে আরো বেশি বই কিনতে পারি।"

একদিন কোন অতি-বিখ্যাত ও প্রবীণ নট (এখন স্বর্গত) আমাকে বললেন, "আমাকে একখানা পড়বার মতো বই পড়তে দিতে পারো?"

আমি সুধালুম, "পড়বার বই মানে তুমি কি বলতে চাও?"

তিনি বললেন, "যা পড়লে নতুন কিছু শিখতে পারা যায়।"

আমি বললুম, "অভিনয় সম্পর্কীয় বই?"

তিনি বললেন, "না, অভিনয় সম্বন্ধে আমার আর নতুন কিছু শেখবার নেই।"

শুনে বিস্মিত হলুম। অভিনেতারা হচ্ছেন শিল্পী এবং সত্যকার শিল্পীরা আমরণ নিজেদের শিক্ষার্থী বলেই মনে করেন—"আমার আর নতুন কিছু শেখবার নেই" এমন দম্ভোক্তি তাঁদের মুখে শোভা পায় না। শিশিরকুমার প্রাচীন ও বিদগ্ধ, এবং ভারতীয় নাট্যজগতের সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে আছেন, কিন্তু এমন অশোভন উক্তি তাঁর মুখে আমি কোনদিনই শ্রবণ করিনি। নাট্যকলা সম্পর্কীয় নূতন কোন বইয়ের নাম শুনলে তা পাঠ করবার জন্যে আজও তিনি শিক্ষার্থীর মতোই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। সেই জন্যে নাট্যশাস্ত্রে তাঁর মতো হালনাগাদ বা up-to-date ব্যক্তি আমি আর একজনও দেখিনি।

কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, কাব্যসাহিত্য ও চারুকলা সম্পর্কীয়

গ্রন্থ পাঠ করবার আগ্রহই তাঁর বিপুল নয়, যেমন তিনি অধ্যয়নশীল, সেই সঙ্গে তেমনি চিন্তাশীলও। তিনি ভাবতে ভাবতে পড়েন এবং পড়তে পড়তে ভাবেন এবং পাঠশেষে যে মতামত প্রকাশ করেন, তা শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরই উপযোগী।

সাধারণ দর্শকরা হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু শিশির-কুমারের প্রত্যেক ভূমিকাভিনয়ের মধ্যে থাকে তাঁর এই তীক্ষ্ণ মনীষার প্রভাব। অভিনেতা আছেন দুই রকম—আত্মহারা ও সচেতন। দানীবাবু (ও অমৃতলাল মিত্র) প্রমুখ অভিনেতারা ভূমিকার মধ্যে ডুবে গিয়ে বাঁধা সুরে ভূমিকার কথাগুলি উচ্চারণ করে যেতেন। কিন্তু শিশিরকুমারের কাছে বাঁধা সুর বলে কিছু নেই, তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বদাই বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসরণ করেই পরিবর্তিত হয় এবং বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, বাঁধা সুরকে আশ্রয় করে ভূমিকার শব্দগত অর্থ ভুলে তিনি আত্মহারা হয়ে যাননি, অভিনয়কালে তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে আছে রীতিমত সক্রিয়। "প্রফুল্ল" ও "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে যোগেশ ও চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু ও শিশিরকুমারের অভিনয়ের এই পার্থক্য খুব সহজেই ধরা পড়ত।

এই কারণেই শিশিরকুমার হচ্ছেন আদর্শ নাট্যাচার্য। তাঁর কাছে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। পরম্পরাগত উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি কোন কাজ করেন না, প্রত্যেক নূতন পালার নিজস্ব মূল সুর অবলম্বন করে এক-একখানি নাটক ও তার বিভিন্ন ভূমিকা তিনি বিভিন্নভাবে আপন বিশেষ ধারণা অনুযায়ী তৈরি করে তোলেন। এবং সেইজন্যেই শিশিরকুমারের শিষ্যরা তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী হয়েও প্রকাশ করতে পারেন উচ্চশ্রেণীর নাট্যনৈপুণ্য। অভিনেতা শিশিরকুমারকে সকলেই দেখেন। কিন্তু মহলার সময়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার হচ্ছেন অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কারণ সেই মহলা দেবার চমৎকার পদ্ধতির মধ্যেই ধরা পড়ে তাঁর অভিনয়ের যথার্থ তাৎপর্য।

আজকাল চারিদিকেই জাতীয় রঙ্গালয় নিয়ে অরণ্যে রোদন শুনতে

পাই। এখানে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করবার মতো প্রতিভা ও বহুদর্শিতা আছে একমাত্র শিশিরকুমারেরই। কিন্তু তথাকথিত অরণ্যে রোদনের মধ্যে তাঁর নাম কেউ করে না। তাই যিনি দুই হাত-ভরে দান করতে পারতেন, নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমাদের অধিকতর মহার্ঘ ঐশ্বর্য দিয়ে দিতে পারলেন না।

কল্লোলের দল

"কল্লোল যুগ" নামে একখানি বই বেরিয়েছে, লেখক হচ্ছেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বইখানি ভালো লাগলো। পূর্বস্মৃতির কাহিনী ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারলে বরাবরই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষ যৌবনের সীমানা পেরিয়ে যতই প্রাচীনতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তার মন ফিরে আসে অতীতের দিকে। কারণ অতীতে থাকে সুখের শৈশব, উৎসবমুখর যৌবন। এমন কি অতীতের অশ্রুও হয় না তেমন বেদনাদায়ক।

প্রাচীনদের ভবিষ্যতে থাকে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন। বর্তমানকে নিয়েও হয় না তারা পরিতুষ্ট। তাই সর্বদেশের সর্বকালের বৃদ্ধেরাই চিরদিনই অতীতের দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে—"হায় রে সোনার সেকাল!" সকলেই এ বিলাপ আগেও শুনেছে আজও শুনছে এবং ভবিষ্যতেও শুনবে। এই অতীতপ্রীতির ফলেই হয় স্মৃতিকথার জন্ম।

কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশে "কল্লোল যুগ" বলে কোন যুগের অস্তিত্ব ছিল কি? ক্ষুদ্র পত্রিকা "কল্লোল"এর পরমায়ু দীর্ঘ-স্থায়ী হয় নি এবং তাকে যুগস্রষ্টা বলেও গ্রহণ করা চলে না। "কল্লোল"এর সময়েই তার সমধর্মী আর একখানি পত্রিকা ছিল—"কালি-কলম"। "ভারতী" বেঁচে থাকতে থাকতেই "কল্লোল"এর জন্ম এবং "ভারতী"র আসরে আর একদল শক্তিশালী আধুনিক সাহিত্যিক সাহিত্যসাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সামনেও ছিল বিশেষ এক আদর্শ। উপরন্তু "শনিবারের চিঠি"তেও আর এক শ্রেণীর সুলেখক নিয়মিতভাবে লেখনীচালনা করতেন (এই সঙ্গে "প্রবাসী", "মানসী ও মর্মবাণী" "মাসিক বসুমতী" ও "ভারতবর্ষ"এর নাম না করলেও চলে, কারণ ওগুলি ছিল সব দলের পত্রিকা)।

মোট কথা হচ্ছে এই, পূর্বকথিত কোন পত্রিকাকেই নবযুগের প্রবর্তক বলে গণ্য করা যায় না। তাদের কারুর আদর্শ ও রচনা-ভঙ্গিই আজ পর্যন্ত সার্বজনীন হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের জীবন-কালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তারা প্রত্যেকেই লালিত হয়েছে রবীন্দ্র প্রভাবের মধ্যেই। সুতরাং আসলে সেটা ছিল রবীন্দ্রযুগ। ছিল বলি কেন, এখনো আমরা রবীন্দ্রযুগের প্রভাবের দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, অদ্যাবধি আর কেউ তাঁর কাছাকাছি গিয়েও হাজির হতে পারেন নি। অতি আধুনিক লেখক যাযাবর রচিত "দৃষ্টিপাত" অতিশয় লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং "দৃষ্টিপাত" যে সার্থক-রচনা, সে বিষয়ে একটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্যেও সর্বত্র পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভূত প্রভাব! রবীন্দ্রসাহিত্য হচ্ছে মহানদের মতো। "ভারতী" "কল্লোল", "কালি-কলম" ও "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি হচ্ছে সেই মহানদ থেকে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার মতো, কিছু দূর অগ্রসর হয়েই যারা হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায় বালুকাবিতানের ভিতরে। "কল্লোল যুগ" হচ্ছে অশ্রুতপূর্ব কথা। তবে হ্যাঁ, "কল্লোল"এর একটি নিজস্ব দল ছিল বটে এবং সে দল গঠিত হয়েছিল কয়েকজন রচনাকুশল তরুণ সাহিত্যিকের দ্বারা। আজ তাঁরা চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে পঞ্চাশের কোঠায় চলা-ফেরা করছেন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কিনেছেন যথেষ্ট সুনাম।

সেই দলের নেতা ছিলেন স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাস। দীনেশ আমার বাল্যবন্ধু ও সমবয়সী। আমি যখন এগারো-বারো বছর বয়সের বালক, তখন আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেতুম। তারপর সুদীর্ঘকাল আর দীনেশের দেখা পাইনি, তাঁর কথা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দুই যুগেরও বেশি কাল কেটে গেল। হঠাৎ খবর পেলুম দীনেশ

একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আমাদের "ভারতী" কার্যালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ছোট্ট একটি কার্যালয় থেকে ছোট্ট কাগজ "কল্লোল" প্রকাশিত হতো। দীনেশের সঙ্গে দেখাও হলো এবং দুইজনেই আবার ধরলুম পুরাতন বন্ধুত্বের খেই। দুই-একদিন "কল্লোল" কার্যালয়েও হাজিরা দিলুম, কিন্তু সেখানকার আসর তখনও ভালো করে জমে ওঠেনি। এ হচ্ছে ১৯২৪ কি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

সেই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন করেন। দীনেশের অনুরোধে দেশবন্ধুর তিরোধান উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করে "কল্লোল" কার্যালয়ে দিয়ে এলুম। "কল্লোল"এর জন্যে সেই আমার প্রথম রচনা। তার কিছুকাল পরে "কল্লোল"এর কার্যালয় উঠে যায় পটুয়াটোলায় এবং পত্রিকার আকারও কিছু বাড়ে। তার পৃষ্ঠায় ছাপা হয় আমার কয়েকটি কবিতা এবং দুই-একটি ছোট গল্প। "কল্লোল" কার্যালয়েও গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছি। সে ঘরখানিও ছোট এবং সেখানকার বৈঠকও ছিল না আমাদের "ভারতী"র মতো বড়। কিন্তু সেই অপ্রশস্ত ঘরে প্রশস্ত চিত্ত নিয়ে যে কয়েকটি তরুণ হামেসাই ওঠা-বসা করতেন, তাঁদের চক্ষে ছিল মনীষার দীপ্তি, তাঁদের মুখে ছিল সাহিত্যের বাণী এবং তাঁদের মনেও ছিল বোধ করি নিজেদের ভবিষ্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অপরিসর জায়গার মধ্যে কোনক্রমে নিজেদের কুলিয়ে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিংবা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাঁরা করতেন কলালাপ, করতেন গল্পগুজব, করতেন হাস্য-পরিহাস। জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে অনেক দূর এগিয়ে এসেও আজও তাঁরা নিশ্চয় ভুলতে পারেন নি পিছনে-পড়ে থাকা আশায়-আনন্দে রঙিন সেই সুমধুর দিনগুলিকে। অন্তত অচিন্ত্যকুমার যে ভুলতে পারেন নি তার নজীর হচ্ছে তাঁর "কল্লোল যুগ"।

"কল্লোল" পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিত না বটে, কিন্তু তার

নাম বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করবার জন্যে প্রদীপ্ত উৎসাহে নিযুক্ত হয়েছিলেন "শনিবারের চিঠি"র দল। তার ফলে লাভবান হয়েছিল উভয় পক্ষই। বেড়ে উঠেছিল, দুই পত্রিকারই গ্রাহক-সংখ্যা। নানা রচনায় স্থলবিশেষ উদ্ধার করে "শনিবারের চিঠি" প্রমাণিত করতে চাইলে, "কল্লোল" হচ্ছে একখানা অপাঠ্য, অতি অশ্লীল পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় যেন এই মর্মে বলেছিলেন যে, কোন কোন দুরন্ত ছেলে ভূতের ভয় দেখালে ভয় পায় না, উলটে ভূতকে দেখবার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা সেই রকমই। "কল্লোল"এ অশ্লীল গল্প বেরোয় শুনে অনেকেই তা পাঠ করবার জন্যে ট্যাঁকের কড়ি ফেলতে লাগল। সুতরাং "শনিবারের চিঠি"র গালাগালি "কল্লোলে"র পক্ষে হয়ে দাঁড়াল শাপে বরের মতোই।

শনিবারের চিঠির অভিযোগ নিয়ে আমি এখানে মাথা ঘামাতে চাই না। অশ্লীলতার জন্যে "কল্লোল"কে আক্রমণ হয়তো অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনের একটা উপলক্ষ মাত্র। কারণ তথাকথিত অশ্লীলতার আশ্রয় না নিলেও আক্রান্ত হতেন "কল্লোল"এর লেখকরা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের কথাই বলতে পারি। "কল্লোল"এ প্রকাশিত আমার কোন কোন কবিতাও ধিক্কৃত হয়েছে "শনিবারের চিঠি"তে। কিন্তু অশ্লীলতার জন্যে এ পরিবাদ নয়, আমি আক্রান্ত হয়েছি কেবল "কল্লোল"এর লেখক বলেই।

কি যে শ্লীল আর কি যে অশ্লীল, তার মানদণ্ড নির্ধারণ করা সহজ নয়। সমস্তই নির্ভর করে এক এক শ্রেণীর পাঠকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরে। "ম্যাডাম বোভারি" রচনা করে অশ্লীলতার জন্যে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যাচার্য ফ্লবেয়ার। কিন্তু সেই "ম্যাডাম বোভারি"ই আজ স্থান পেয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কিন্তু তখনকার "কল্লোল"-এর সেই নবীন লেখকরা আজ হয়েছেন প্রবীণ। হয়তো আগে তাঁদের কারুর কারুর রচনার ভিতরে অন্বেষণ

করে পাওয়া যেত অল্পবিস্তর ময়লামাটি। কিন্তু তাঁদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ময়লামাটি ক্রমে ক্রমে থিতিয়ে পড়েছে নীচের দিকে এবং তাঁদের রচনাও ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ ও নির্মল।

"কল্লোল"-এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ও শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী এবং আরো কেউ কেউ। ওঁদের মধ্যে প্রথম চারিজনের সাহিত্যসাধনা আজও আছে অব্যাহত। কিন্তু বাঙলা দেশের দুর্গত সিনেমার নেশায় মেতে প্রেমেন্দ্র এখন সাহিত্য-জগতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারেন মাত্র। মণীশের মধ্যে ছিল প্রভূত সম্ভাবনা, কিন্তু তিনি এখন লেখনী ত্যাগ করে বসে আছেন। হেমচন্দ্র বাগচী বেশ কবিতা লিখতেন, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে তিনি হন উন্মাদগ্রস্ত।

এই প্রসঙ্গে আর এক ভাগ্যবান কবির কথা মনে হচ্ছে। নজরুল ইসলাম। আমার মতো তিনিও ঠিক "কল্লোল" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ছিলেন না, তবে তার সম্পর্কে এসেছেন বটে। দেশবন্ধুর তিরোধান উপলক্ষে আমার সঙ্গে তাঁরও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল "কল্লোল"-এর পৃষ্ঠায়। তার কিছুকাল পরে স্বর্গীয় কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আরপুলি লেনের ভবনে এক সন্ধ্যায় আহূত হয়ে গিয়ে দেখি, সেখানে উপস্থিত আছেন নজরুল ইসলাম ও "কল্লোল"-এর কোন কোন সাহিত্যিক। নজরুল হার্মোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে শুরু করলেন।

তার আগেই আমাদের নিজস্ব আসরে নজরুলের কণ্ঠে শুনেছি অসংখ্য গান। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল না বটে শিক্ষিত ওস্তাদের মতো, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতার গুণে প্রত্যেক শ্রোতাই হতেন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। আগে তিনি গাইতেন রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতির গান কিন্তু সেদিনকার আসরে গীতিকার ও সুরকার রূপে নজরুলের পরিচয় পেলুম সর্বপ্রথমে। তাঁর মুখে শুনলুম গজল গানের পর গজল গান। বাঙলা দেশে গজল গান আগেও ছিল। আমাদের

ছেলেবেলায় লোকের মুখে এই গজলটি শুনতুম—"কুঞ্জবনে যমুনারি তীরে, রাধা রাধা বলে কে বাঁশী বাজায়।" কিন্তু সেদিন নজরুলের রচিত যে গজলগুলি শুনলুম, তাদের গড়নও সম্পূর্ণ নতুন এবং কবিত্বেও তারা সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ।

তারপর "কল্লোল"-এ আত্মপ্রকাশ করল নজরুলের সেই প্রখ্যাত গজলটি—"বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভরণে চললো গোরী!" তাঁর আরো কয়েকটি গজল "কল্লোল"-এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বেই সেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে-বাইরে যেখানে-সেখানে। বাঙলা দেশে কিছুকাল ধরে চললো গজল গানের রেওয়াজ।

নজরুলের কথা অন্যত্র বিস্তৃতভাবেই বলেছি, সুতরাং আর তা নতুন করে বলবার দরকার নেই। এর পর আমি "কল্লোল"-এর অন্যান্য কয়েকজনের কথা নিয়ে আলোচনা করব।

কল্লোল-গোষ্ঠীর দুইজন

এখনকার অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে গেলে শোনা যায় খালি কাজের কথা। সাহিত্যিকরা সেখানে আসেন, বসেন, দুটো চারটে কথা বলেন,—কিন্তু সবই প্রয়োজনের তাগিদে। ভালো করে আসর জমিয়ে নিয়মিত ভাবে বৈঠকী আলোচনা সেখানে আর হয় না।

আগেকার মাসিক পত্রিকার কার্যালয়েও যে কাজের ভিড় থাকত না, এমন কথা বলি না। কিন্তু কাজ-কর্ম চুকে যাবার পর প্রতিদিনই বৈকালের দিকে সেখানে বসত বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের বৈঠক। হোত সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান। হোত গল্পগুজব, হাসিমস্করা এবং কোথাও কোথাও শোনা যেত সঙ্গীতের কলরবও। এরই মধ্য দিয়ে নিবিড় হয়ে উঠত পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক। "জাহ্নবী", "অর্চনা", "মানসী", "যমুনা", "সঙ্কল্প", "মর্মবাণী", "ভারতী", "কল্লোল" ও "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি পত্রিকা ছিল এমনি সব আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র।

কিন্তু কেবল পত্রিকার কার্যালয়ে নয়, তখন কোন কোন সাহিত্য-রসিক গৃহস্থের বাড়িতেও নানা শ্রেণীর গুণীদের জন্যে বিছানো হোত রীতিমতো ঢালা আসর। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিশনের পার্শ্ববর্তী বাড়ির কর্তা ছিলেন স্বর্গীয় গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। দুই যুগ আগেও তাঁর বৈঠকখানায় প্রত্যহ গদীয়ান হয়ে বিরাজ করতেন উচ্চ-শ্রেণীর বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী। কারুর হাতে সিগারেট, কারুর হাতে চুরোট ও কারুর হাতে গড়গড়ার নল এবং ঘন ঘন আসছে আর যাচ্ছে চায়ের পেয়ালা ও তাম্বুলের থালা। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোন কথাই সেখানে অনালোচনীয় ছিল না। তর্ক-বিতর্ক হতে হতে মাঝে মাঝে উঠত চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ।

সেই আসরেই স্বর্গীয় কৌতুকাভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, স্বর্গীয় ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, রাজনৈতিক শ্রীনির্মলচন্দ্র, অভিনেতা শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, কবি নজরুল ইসলাম, সুলেখক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হাস্যরসিক দাদাঠাকুর শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

নজরুল হৈ হৈ করে এসেই বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করতেন টেবিল-হার্মোনিয়ামটাকে এবং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের যানবাহন ও মুক্তজনতার বিষম গোলমাল গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে গেয়ে যেতেন গানের পর গান এবং গাইতে গাইতে থালা থেকে তুলে নিতেন পানের পর পান। কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি পান নয়, আঠারো-বিশ পেয়ালা চা না পেলেও সিক্ত হোত না তাঁর কণ্ঠদেশ।

নজরুলের সঙ্গে প্রায়ই আসতেন একটি স্বল্পবাক তরুণ। তাঁর মাথায় লম্বা চুল, দেহ একহারা, বর্ণ শ্যাম, সাজগোজ সাদাসিধা, মুখে শালীন ভাব। নাম শুনলুম শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমরা নজরুলের বন্ধু বলেই গ্রহণ করলুম। তাঁর অন্য কোন পরিচয় জানতুম না এবং আসরের বিখ্যাত সব গুণী জ্ঞানীর মাঝখানে তাঁর দিকে ভালো করে মনোযোগ দিতেও পারি নি।

নৃপেন্দ্র ছিলেন বর্ণচোরা আমের মতো। নানা আসরে এমন অনেক লোককে দেখেছি যাঁরা উল্লেখযোগ্য গুণের অধিকারী না হয়েও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝখানে বসে সবজান্তার মতন অনর্গল কথার খই ফোটাতে পারেন যে, সহজেই তাদের দিকে আকৃষ্ট হয় আর সকলের দৃষ্টি। এই মুখর মানুষগুলি যে সুচতুর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। নিজেদের ঢনঢনে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের অত্যন্ত টনটনে। তাই বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে তাঁদের খ্যাতির খানিকটা তাঁরা প্রতিফলিত করতে চান নিজেদের মধ্যে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখেছি এমনি সব হসন্ত-মার্কা জীবকে।

নৃপেন্দ্র অন্য ধরনের মানুষ। মুখের কথায় বা হাব-ভাব-ব্যবহারে

কোনদিনই নিজেকে তিনি বিজ্ঞাপিত করতে কিংবা স্বয়ং প্রধান হয়ে উঠতে চান নি। তাই কিছুদিনের আলাপের পরেও আমি পাইনি তাঁর প্রকৃত পরিচয়।

তারপর "কল্লোল" পত্রিকা প্রকাশিত হলো এবং "কল্লোল"-এর পৃষ্ঠার মধ্যেই আবিষ্কার করলুম যথার্থ নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে। তাঁর চেষ্টাবর্জিত, প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক মিষ্ট ভাষা এবং প্রবন্ধরচনায় সুদক্ষ হাত দেখে সত্য সত্যই আমি বিস্মিত না হয়ে পারি নি। এমন একজন শিল্পী আমাদের সঙ্গে এসে মেলামেশা করেছেন, অথচ আমরা তাঁকে কেবল নজরুলের পার্শ্বচর এক সাধারণ ভক্ত ছাড়া আর কিছু বলেই ভাবতে পারি নি!

তারপর নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বহু সাহিত্য-বৈঠকে, "নাট্যমন্দির" ও "নাট্য-নিকেতন"-এর অন্দরের আসরে এবং আমার নিজের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কাটিয়ে দিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁর মুখে শুনিনি কোন অশোভন উক্তি এবং আত্মগৌরব কথনেও কখনো দেখিনি তাঁর এতটুকু আগ্রহ। বরং বারংবার এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে সর্বদাই তিনি যেন আপনাকে সরিয়ে রাখতে চান সকলের পিছনে এবং তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেই যেন সে সম্বন্ধে সচেতন নন! তাঁর আর একটি মস্ত গুণ, কখনো তিনি অন্য সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে গ্লানি প্রচার করেন না। ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষ তাঁর মনে ঠাঁই পায় না।

কিন্তু তিনি হচ্ছেন বাঙলাদেশের সাহিত্যিক। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে সৌভাগ্যের সম্পর্ক যদি কিছু থাকে, তবে তা এত দূরসম্পর্ক যে, কদাচ হতে পারে তারা পরস্পরের নিকটস্থ। ঠিক সেইজন্যে কি না জানি না, অধিকাংশ সময়েই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মুখের উপরে দেখেছি উদাস-উদাস ভাব। গল্পগুজব ও হাস্যকৌতুকের মাঝখানেও কেমন যেন অনাসক্ত হয়ে থাকেন। কি যেন খুঁজছেন, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না।

মাঝে মাঝে হয়ত অর্থাভাবেই তিনি স্বক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চান। উপন্যাস রচনা করেন, কিন্তু সফল হন না। চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় দেখা দেন, কিন্তু বিফল হন। উপন্যাসে ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। মেকলে ও কার্লাইলের রীতি এক রকম, স্কট ও ডিকেন্সের রীতি আর এক রকম। এটুকু ভুললে শক্তিশালী লেখকরাও নিজেদের সুনাম রক্ষা করতে পারবেন না। আবার লেখক ও অভিনেতা দুজনেই শিল্পী বটে, কিন্তু তাঁরা বিচরণ করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গে। অভিনয়ে অনেকের অশিক্ষিত পটুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অধীনে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাগ্রহণ না করলে কেহই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয় না। তেমনি যারা অভিনয়ে অভ্যস্ত, সাহিত্য-সাধনা না করে হঠাৎ কলম ধরে সেও রাতারাতি লেখক হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যেই প্রবাদে বলে—'যার কাজ তারে সাজে, অন্যের পিঠে ল্যাঠি বাজে।' কুস্তির মহামল্লও যুযুৎসুর মল্লের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয় না—অথচ দুজনেরই কর্তব্য হচ্ছে মল্লযুদ্ধ করা। আমি স্বচক্ষে একজন ক্ষুদ্রাকায় জাপানী যুযুৎসু-বিশেষজ্ঞকে বিশ্ববিজয়ী বিপুলবপু গামাকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করতে দেখেছি, কিন্তু গামা বুদ্ধিমানের মতো তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ যুযুৎসুর আর কুস্তির পদ্ধতি এক নয়।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অতুলনীয় গুণপণা দেখা যায় সন্দর্ভ রচনায় এবং জীবনচিত্রাঙ্কনে। শেষোক্ত বিভাগে তিনি কলমের রেখায় যে সব জীবনচিত্র এঁকেছেন, সেগুলি হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের অনবদ্য ও অভিনব ঐশ্বর্য। এ শ্রেণীর আরও অনেক ছবি বাঙলা দেশেই পাওয়া যাবে, কিন্তু আর কোন ছবিকারই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নিকটস্থ হতে পারবেন না। সেগুলি কেবল সুলেখকের রচনা নয়, সেগুলি হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর রচনা। যাঁদের ভিতর ও বাহির ফুটোতে চান, সম্যকরূপে ও জীবন্ত ভাবে তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন, অথচ যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের আর্টকে এবং বিশেষজ্ঞমাত্রই জানেন, যে আর্ট নিজেকে

প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, তাই-ই হচ্ছে বড় আর্ট। যাঁদের কলমের ছবি তিনি এঁকেছেন ; আবার তাঁদেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন এমন আরও লেখকের অভাব নেই। কিন্তু চার পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর তাঁরা যতটুকু দেখিয়েছেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মাত্র চারটি লাইনে তার চেয়ে ঢের বেশি দেখাতে পেরেছেন। তাঁর এই নিরতিশয় ভাবগর্ভ লিপিকুশলতা বোঝাতে কি শব্দালঙ্কার ব্যবহার করব ? বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উপমাটা বড়ই পুরাতন হয়ে গিয়েছে। তিনি হচ্ছেন একজন অনন্যসাধারণ রেখাচিত্রকার।

প্রায় সেই সময়েই আর একজন উদীয়মান লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়, এখন তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। যদিও তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন স্বতন্ত্র ভাবেই, তবু তাঁকে "কল্লোল" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদেরই মধ্যে গণ্য করতে পারি। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়, তিনি তাঁদের সঙ্গে উঠতেন, বসতেন, আলাপ ও বিচরণ করতেন বটে, তবে অদ্যাবধি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন—অর্থাৎ সব দলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, কিন্তু কোন বিশেষ দলের খাতায় নিজের নাম লিখতে রাজি হন না।

তখন আমাদের "ভারতী" উঠে গিয়েছে, কিন্তু "ভারতী" কার্যালয়ের বাড়ি থেকেই মুদ্রিত হয় "নাচঘর", যার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলুম আমি ও নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। আমরা ত্রিতলে বসে কাজ করতুম, একতলায় ছিল স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "কান্তিক প্রেস"। সেই ছাপাখানায় মুদ্রিত হোত শিবরামের দ্বারা সম্পাদিত একখানি সাময়িক পত্রিকা, তার নাম আমার সঠিক স্মরণ হচ্ছে না—হয়তো "যুগান্তর"। শিবরামের তখন প্রথম যৌবন। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি কেবল সম্পাদক নন, গ্রন্থকার রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে সেদিনকার লেখক শিবরাম এবং এখনকার হাসির গল্প-লিখিয়ে ও শব্দশ্লেষের রাজা শিবরামের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেকখানি। আগেকার শিবরাম ঘুরে বেড়াতেন সাহিত্য-জগতের

নানা পথে কখনো সাংবাদিক, কখনো ঔপন্যাসিক, কখনো নাট্যকার, কখনো প্রবন্ধকার এবং কখনো বা কবি রূপ ধারণ করে। কিন্তু এখনকার মানুষ শিবরাম আজও দুপুর রোদে গোটা কলকাতার পথে-বিপথে, অপথে-কুপথে হাঘরের মতো, চর্কীর মতো টো-টো করে ঘুরে বেড়ান বটে, তবে লেখক শিবরাম আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্য-জগতের বিশেষ এক প্রান্তে। বড়দের জন্যে মাঝে মাঝে এখনো দুই-একটা লেখায় হাত দেন, কিন্তু ছোটদের জন্যেই তাঁর বেশি মাথাব্যথা।

শিবরাম কবি। দিব্যি কবিতা লিখতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতেও ছিল প্রভূত নূতনত্ব। তাঁর কবিতার কেতাবও বাজারে বেরিয়েছে, কিন্তু আজ তা ক্রেতাদের পুস্তকাগারে সুরক্ষিত আছে, কিংবা তথা-কথিত "শ্বেত পিপীলিকা"দের কবলগত হয়েছে সে খবর দিতে পারব না। যে কারণেই হোক, কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে এখন তাঁর আর বড়-একটা বনিবনাও নেই, অথচ তাঁর কবিত্বের ক্ষেতে যে অজন্মার যুগ আসে নি, সে প্রমাণও পাই মাঝে মাঝে।

শিবরাম নাট্যকার এবং কাঁচা বয়স থেকেই পাকা নাট্যবোদ্ধা। যখন তিনি উদীয়মান, সেই সময়েই শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা"কে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে তার নাম রাখেন "ষোড়শী"। যদিও তা "ভারতী"তে প্রকাশিত এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল শরৎচন্দ্রেরই নামে, কিন্তু নাট্যরূপের সফলতার জন্যে অনেকখানি প্রশংসার উপরে দাবি করতে পারেন শিবরামই। তারপরেও তিনি "নাট্যনিকেতন'এর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিরুপমা দেবীর "দিদি" উপন্যাসকেও নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেছিলেন বটে, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতিভা ও শরৎচন্দ্রের নামের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়ে "দিদি" লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

মৌলিক নাটক রচনাতেও তিনি হচ্ছেন রীতিমত করিতকর্মা। বহুকাল আগে রচনা করেছিলেন "চাকার নীচে" নামে এক নাটক এবং আমার "নাচঘর"এ তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার সময়ে গৌর-

চন্দ্রিকায় আমি লিখেছিলুম : "শিবরামবাবু এই নাটকখানি রচনা করেছেন অতি-আধুনিক প্রথায়। এবং একটিমাত্র অঙ্কে, একটিমাত্র ঘরের ভিতরে মোট তিন-চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি আধুনিক জীবনের যে বিচিত্ররসবহুল, অপূর্ব ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন, আমরা আগে থাকতে তার আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করব না। পাঠকরা ধীরে ধীরে তার পরিচয় পাবেন এবং পরিণামে যে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হবেন, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই" প্রভৃতি।

কিন্তু তিনি নাট্যকার হয়েও হলেন না—"ছেড়ে দিলেন পথটা, বদলে গেল মতটা।" বিপুল উৎসাহে ঢুকে পড়লেন ছোটদের খেলাঘরে, তাঁর অশ্রান্ত লেখনী হুড় হুড় করে রচনা করতে লাগল রাশি রাশি হাসির গল্প, ভূরি পরিমাণে শব্দশ্লেষ (pun) ও অনুপ্রাস ছড়াতে ছড়াতে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। আজকের বাঙলা সাহিত্যে তাঁর মতন এত বেশি হাসির গল্প রচনা করেন নি আর কোন লেখকই।

"পান্" এর দিকে ঝোঁক তাঁর অতিমাত্রায়। তার লোভে তিনি গল্পের বাঁধুনিও শ্লথ করে ফেলবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। প্রাণপণে "পান"-এর পরে "পান" চালিয়ে তিনি পান আনন্দ এবং এদিকে তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্ব জাহির হলেও গল্পের আর্টও ক্ষুণ্ণ হয় অল্পবিস্তর। কেবল লেখবার সময় নয়, বন্ধুসভায় আসীন হয়ে গল্প করবার সময়েও তাঁর সংলাপ হয়ে ওঠে শব্দশ্লেষের জন্যে কৌতুককর।

বেশ আলাভোলা, মিষ্ট মানুষ এই শিবরাম। গতি তাঁর সর্বত্রই, কিন্তু কোথাও বেশিক্ষণ থাকবার পাত্র নন, এক আড্ডা ছেড়ে ছোটেন আর এক আড্ডার দিকে, তারপর আর এক আড্ডায়। চিরকুমার, নেই কোন সংসারজ্বালা এবং সেই কারণেই হয়তো যখন-তখন নির্মল কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তরল-মতি বালকের মতো হাবভাব। বুড়োর চেয়ে আকৃষ্ট হন বালকদের দিকেই। যখন কারুর বিরুদ্ধে কোন মজার গল্প বলেন, তখনও তাঁর ভিতরে থাকে না তিলমাত্র রাগের ভাব। তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্যে কখনো কখনো তাঁকে জোর করে ধরে এনেছি। এবং অনুভব করেছি খানিকটা মুক্ত বাতাসের মিষ্ট স্পর্শ।

কল্লোল-গোষ্ঠীর ত্রয়ী

কল্লোল-গোষ্ঠীর ত্রয়ী বলতে বোঝায় এই তিনজনের নাম—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁরা তিনজনেই কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক। তিনজনেই কিছু কিছু অন্যান্য শ্রেণীর রচনাতেও হাত দিয়েছেন।

এঁরা তিনজন এবং কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত আরো কয়েকজন শক্তিশালী লেখক আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকথিত অশ্লীলতার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত ও ধিক্কৃত হন। সেই সময়ে—অর্থাৎ প্রায় দুই যুগ আগে—আমি এঁদের পক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলুম: "তবে কি এই অশ্লীলতাই স্বাভাবিক? আমাদের তো বিশ্বাস তাই। এ বিশ্বাস ভুল হতেও পারে। এবং অশ্লীলতার যে একটা সীমারেখা আছে, তাও আমরা না মেনে পারব না। কিন্তু একেবারে একেলে সাহিত্য সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে কি না, এখন সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য। * * * "What is Art" লেখবার পরেও টলস্টয়ের মতন লোক যে-দুর্বলতা পরিহার করতে পারেন নি, তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করা যে সহজ নয়, সে কথা বলা বাহুল্য। এ দুর্বলতা আছে এবং থাকবেও। স্বাভাবিকতার উচ্ছেদ অসম্ভব। কেবল এই চেষ্টাই করা ভালো, যেন সে কুৎসতি না হয়, যেন সে শিষ্টতার সীমানা না ছাড়ায়, যেন সে রূপের সেবা না ভুলে যায়। রূপকে আমরা ব্যাপক অর্থে ধরছি। * * * আমরা অস্কার ওয়াইল্ডের এই বিখ্যাত উক্তি উড়িয়ে দিতে পারি না—লেখার দোষে শ্লীলও অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায় এবং লেখার গুণ তার উল্‌টোটাকেই প্রকাশ করে। যে কোন কুৎসিত বিষয় সুন্দর ও রুচিকর করে দেখানো যেতে পারে" প্রভৃতি।

একটা বড় মজার ব্যাপার এই যে, যুগে যুগে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ

লেখকেরই বিরুদ্ধে আনা হয়েছে অশ্লীলতার অপরাধ। অনেক সময়ে আবার দেখা গিয়েছে, অভিযোক্তাকেই হতে হয়েছে একই অপরাধে অভিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অশ্লীল বলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তারপর রবীন্দ্র-ভক্তরা দেখিয়ে দিলেন অশ্লীলতায় তিনিও বড় কম যান না। দ্বিজেন্দ্র-লালের মৃত্যুর অনেক পরে শিশিরকুমার যখন তাঁর "পাষাণী" নাটক মঞ্চস্থ করেন, তখন রুচিবাগীশরা এত জোরে চ্যাঁচাতে শুরু করে দেন যে, রীতিমতো সুঅভিনীত হয়েও পালাটি ভালো করে জমতে পারে নি।

স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ অশ্লীলতার উপরে হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। অশ্লীল লেখা দেখলেই কলম উঁচিয়ে তেড়ে আসতেন। অবশেষে বুড়ো বয়সে নিজেই ফেঁদে বসলেন এমন এক অশ্লীল গল্প যে, চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল ধিক্কারধ্বনিতে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোক্তা ছিলেন "শনিবারের চিঠি"র দল। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতির অশ্লীলতার প্রমাণ "শনিবারের চিঠি"তে বিতরিত হতো ভূরি পরিমাণে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও অতিশয় স্পষ্টভাবেই দেখা যেতে লাগল, "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশিত গল্পে ও কবিতাতেও অশ্লীলতার কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নেই। সুতরাং সবাই যখন ভূত, মিছামিছি রামনাম নিয়ে টানাটানি কেন?

কি শ্লীল, কি অশ্লীল, কে বলতে পারে? এর আগে আমার একটি গল্পের দুর্দশার কথা বলেছি। "কল্লোল" সম্পাদক সেটিকে শ্লীল বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গল্পটিকে চালান করা হয় "ভারতবর্ষ" কার্যালয়ে। সেখান থেকে সেটি ফেরত আসে অশ্লীলতার অভিযোগ বহন করে। ধাঁধায় পড়লুম, নিজেই বুঝতে পারলুম না আমি কি শ্লীল কি অশ্লীল? কাশীধাম থেকে এল "উত্তরা"র জন্যে লেখার তাগিদ। গল্পটিকে প্রেরণ করলুম সেইখানেই।

সে শ্লীল কি অশ্লীল তা নিয়ে "উত্তরা" মাথা ঘামালে না, তাকে ছাপিয়ে দিলে বিনাবাক্যব্যয়ে। "উত্তরা"য় প্রকাশিত আমার একটি কবিতার দুটি লাইনের জন্যে গালিগালাজে বাজার সরগরম হয়ে উঠেছিল—ঐ অশ্লীলতার অপরাধেই। কিন্তু আমার সেই একাধারে শ্লীল ও অশ্লীল (!) গল্পের জন্যে কোন চায়ের পেয়ালাতেই ওঠেনি উত্তাল তরঙ্গ।

একই গল্প যখন হতে পারে কারুর মতে শ্লীল এবং কারুর মতে অশ্লীল, তখন বিচারের মানদণ্ড কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে বাচনিক বিচারে সুরাহা হওয়া অসম্ভব। যে রচনা সুরচিত এবং যা মনকে নোংরা করে না, নিন্দা করেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মুক্ত চক্ষু ধুলোর মধ্যে কুড়িয়ে পায় রোদের সোনা। অন্ধ ধুলো হাতড়ালে ছুঁয়ে ফেলে সারমেয়-বিষ্ঠা। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্লীল মনই আবিষ্কার করে অশ্লীলতাকে। পরমহংসদেবের একটি বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে শকুনি পক্ষবিস্তার করে উড়ে বেড়ায় নির্মলনীল আকাশে, কিন্তু তার নজর পড়ে থাকে নীচে ভাগাড়ের দিকেই।

রসিক হন মরালের মতো। জলভাগ ত্যাগ করতে পারেন অনায়াসেই।

অশ্লীলতাকে অন্বেষণ করবার জন্যে কোনদিনই আমি অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেবের রচনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করি নি, বঞ্চিত হই নি তাই উপভোগের আনন্দ থেকে। তাদের উপন্যাস পড়েছি, ছোটগল্প পড়েছি, কবিতা পড়েছি। মুগ্ধ করেছে আমাকে অনেক রচনাই। আবার কোন কোন রচনার বিষয়বস্তু হয়তো আমার মনের মতো হয় নি। কিন্তু এই ভালো লাগা আর না লাগার মধ্যে একটা যে সত্য সর্বদাই উপরে ছাপিয়ে উঠেছে তা হচ্ছে এই: তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে উচ্চশ্রেণীর লিপি-কুশলতা। তাঁদের ভাষা ও শব্দবিন্যাস হচ্ছে বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ। তাঁদের কোন গল্পের আখ্যান-

বস্তু বা কোন কবিতা ভালো না লাগলেও তাঁদের ভাষা ও রচনাভঙ্গির দিকে পাঠকরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না।

"ভারতী", "কল্লোল" ও "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক এক দল শক্তিধর সাহিত্যিক পরিপুষ্ট হয়ে উঠে ছিলেন। "ভারতী" গোষ্ঠীর ভিতর থেকে আমরা পেয়েছি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার ও হেমেন্দ্রলাল রায়—যাঁরা আজ স্বর্গে। এবং সেই সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি জীবিত লেখকদের। শরৎচন্দ্রেরও প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল "ভারতী"তেই। তারপর "ভারতী"তে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হলেও তিনি নিয়মিত লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐখানেই ছিল তাঁর নিজস্ব আসর। হামেসাই উঠতেন বসতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন আমাদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একান্তভাবেই আমাদের ঘরের লোক।

"কল্লোল" গোষ্ঠীর ভিতর থেকে দেখা দিয়েছেন দীনেশরঞ্জন দাশ গোকুলচন্দ্র নাগ,—এঁরা এখন স্বর্গীয়। তারপর আছেন হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিতকুমার দত্ত, ভূপতি চৌধুরী ও জসীমউদ্দীন প্রভৃতি।

একটি বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে, একই ভাবের অনুপ্রেরণায় এমনি দলবদ্ধ হয়ে সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কেবল যে একটা সমষ্টিগত শক্তির উপলব্ধি থাকে তা নয়; উপরন্তু সেই সঙ্গে পাওয়া যায় পরম আনন্দ ও বিপুল উৎসাহ। ভিন্ন ভিন্ন পথ, লক্ষ্য কিন্তু এক।

কিন্তু আজকের দিনের তরুণ লেখকরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাহিত্য-সাধনা করতে চান না বা করতে পারেন না। "কল্লোল" লুপ্ত হবার পর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু

তাঁরা প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে দেখি ভ্রাতৃভাবের পরিবর্তে ছাড়া ছাড়া ভাব। বোঝা যায় না তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ। সাহিত্যক্ষেত্রে গোষ্ঠীই সৃষ্টি করতে পারে নব নব পদ্ধতি বা "স্কুল"। ফরাসী সাহিত্যে এটা বার বার দেখা গিয়েছে এবং বাঙলা দেশেও "বঙ্গদর্শন", "সবুজপত্র", "ভারতী" ও "কল্লোল" প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলেই যুগে যুগে বাঙলা সাহিত্যে এসেছে নূতন নূতন ধারা ও ভঙ্গি।

অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল ঠিক কোন্‌খানে, আমার মনে পড়ছে না। তবে হয় "কল্লোল" নয় "মৌচাক" কার্যালয়ে। স্মরণ হচ্ছে "কল্লোল" প্রকাশিত হবার আগেই "ভারতী"র পৃষ্ঠায় যেন তাঁর একটি রচনা পাঠ করেছি। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে নানা জায়গায়। এবং আমি তাঁকে অন্যতম অন্তরঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছি। একহারা দেহ, রঙটি কালো হলেও মুখে-চোখে আছে বুদ্ধির প্রাখর্য। শান্ত স্বভাব, সংলাপ শিষ্ট ও মিষ্ট। কথার ঝড় বহিয়ে দেন না, বাক্যব্যয় করেন বেশ সংযত ভাবেই।

"কল্লোল যুগ" পাঠ করলে বোঝা যায়, "শনিবারের চিঠি"র ধারাবাহিক আক্রমণ তাঁর মনকে তিক্ত করে তুলেছিল। সেই সময়ে "কল্লোল" এর দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি বলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণে আমিও "শনিবারের চিঠি"র দ্বারা বার বার আক্রান্ত হতে লাগলুম। কিন্তু আমি মার খেয়ে সয়ে থাকবার মানুষ নই। একই খেলা দুই পক্ষই খেলতে পারে, এটা দেখিয়ে দেবার জন্যে "নাচঘর"এ খুললুম একটি বিশেষ বিভাগ। তারপর কিছুকাল ধরে চলতে লাগল দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক্যযুদ্ধ—গদ্যে এবং পদ্যে। আমার লেখা কোন কোন ব্যঙ্গ-কবিতা নজরুল ইসলাম এবং আরো কেউ কেউ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারও উৎসাহিত হয়ে একদিন "নাচঘর" কার্যালয়ে এসে ছদ্মনামে লেখা একটি ব্যঙ্গ-কবিতা

দিয়ে গেলেন আমার হাতে। এই বিভাগে তিনি এবং অন্য কোন কোন লেখক করেছিলেন আরো কিছু কিছু সাহায্য। ফাঁপরে পড়তে হলো "শনিবারের চিঠি"কে। সে হচ্ছে মাসিক, আর "নাচঘর" ছিল সাপ্তাহিক, কাজেই মাসে একবার আক্রান্ত হলে প্রতিআক্রমণ করবার সুযোগ পায় মাসে চারবার। "শনিবারের চিঠি" মুখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই "নাচঘর"এর এই বিশেষ বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়। তারপর "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদকের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমি তাঁর "দাদা"।

অচিন্ত্যকুমার কেবল প্রভূত শব্দসম্পদের অধিকারী নন, শব্দ প্রয়োগও করেন নিপুণ শিল্পীর মতো। "কল্লোল"এর দলের মধ্যে ভাষা নিয়ে তিনিই বোধ করি সবচেয়ে মাথা ঘামান বা খাটান। একেবারে চাঁচাছোলা, ওজন করা, তীক্ষ্ণধার ভাষা, যেখানে যা মানায় খুঁজে পাওয়া যায় তাকেই। অতি-মার্জনার ও শব্দালঙ্কারের এই প্রাধান্য হয়তো সহজ সরলতার অনুকূল নয়, কিন্তু পাঠকদের চিত্তকে সমৃদ্ধ করে তোলে রীতিমত।

তারপর তিনি হলেন সরকারী চাকুরে। সচল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর আমি পড়ে রইলুম কলকাতার একটেরে, গঙ্গার ধারে। দুজনের মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তিনি যে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, সে খবর পাইনি। আচম্বিতে তাঁর অতি আধুনিক রচনা "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" পাঠ করে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করতে পারলুম সেই সত্য। শিল্পীর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি পরম-হংসদেবের অনুপম জীবনচিত্র।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ("শ্রীম") ছিলেন পরমহংসদেবের শিষ্য এবং সমসাময়িক। ঠাকুরকে তিনি যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই দেখিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"তে। সে হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। সাদাসিধে, নিরলঙ্কার, চলিত ভাষার

ভিতর দিয়ে জলজিয়ন্ত ভাবে দেখা যায় একটি বালকের মতো সহজ সরল, ভাবে ভোলা, কিন্তু দিব্যজ্ঞানী ও অনন্যসাধারণ মহামানবকে। কিন্তু তিনি যে নিজে একজন উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পী, অচিন্ত্যকুমার একথা ভুলতে পারেন নি। ঠাকুরকে তিনি সাজাতে চেয়েছেন সমুজ্জ্বল ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে। দুইখানি জীবনচিত্রের মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য।

এইবারেই দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলি। অচিন্ত্যকুমারের সখ্য আমার কাছে সত্য সত্যই প্রীতিপ্রদ। মানুষটিকে ভালো লাগে। একদিন দুপুরে সহধর্মিণী ও দুই কন্যাকে নিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম গুরুদাস লাইব্রেরীর ভিতরে বসে আছেন অচিন্ত্যকুমার। তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করলুম। এবং তাঁর কোন আপত্তি আমলে না এনে সোজা গিয়ে উঠলুম চৌরঙ্গীর চাঙ্গুয়া রেস্তোরাঁয়। তারপর সপরিবারে ও বন্ধু সমভিব্যাহারে বহুক্ষণ ধরে চললো গল্পগুজব এবং পানাহার।

আর একদিনের কথা। আমার বাড়ির ত্রিতলের অলিন্দই হচ্ছে আমার লেখবার, পড়বার, বসবার ও গল্প করবার জায়গা। হাতে যখন কাজ থাকে না, প্রবহমানা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকি। স্রোতস্বিনীর চলোর্মিমালার সঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে চলে যায় নয়ন এবং মন।

এক বৈকালে সহধর্মিণী ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সেইখানে বসে আছি, হঠাৎ গঙ্গাতীরে দেখতে পেলুম দুটি তরুণীকে। একটি মেয়ের ক্রীড়াচঞ্চল সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি আমাকে করলে আকৃষ্ট। সাধারণত বাঙালীর মেয়েরা নিজেদের নারীত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে কতকটা আড়ষ্টভাবেই পথের উপরে দেখা দেন। এ মেয়েটি সে রকম নন, জীবনের আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত। ভালো লাগল। ছোট ছেলেকে বললুম, "মেয়েটিকে বাড়িতে ডেকে আনো তো!"

স্ত্রী বললেন, "অচেনা বাড়িতে ওঁরা আসবেন কেন?"

আমি বললুম, "গৃহিণী, ওঁরা হচ্ছেন নতুন বাঙলার মেয়ে। রজ্জু

দেখে ওঁরা সাপ বলে ভয় পান না। সাপ দেখলেও আত্মরক্ষা করবার শক্তি আছে ওঁদের।"

সত্য হল আমার অনুমান। আমার বাড়িতে তাঁরা অসঙ্কোচে চলে এলেন। সদর দরজার কাছে এসে একজন বললেন, "শুনেছি এইখানে কোথায় হেমেন রায়ের বাড়ি আছে।"

ছেলে বললে, "আপনারা তো সেই বাড়িতেই এসেছেন।"

তারপর মেয়েটির পরিচয় পেলুম। একজন হচ্ছেন অচিন্ত্যকুমারের পত্নী। আর একজন তাঁর শ্যালিকা, অবিবাহিতা ও কলেজের ছাত্রী।

তারপর অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে দেখা হতে বললুম, "অচিন্ত্য, সেদিন তোমার স্ত্রী হরণ করেছিলুম!"

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে অচিন্ত্যকুমার বললেন, "শুনেছি হেমেনদা।"

প্রেমেন্দ্রের ভাষা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে। তা প্রসাদগুণে মনোরম। তা শব্দগত নয়, ভাবগত। তার মধ্যে শব্দ-সম্পদের গন্ধ নেই, চেষ্টার লক্ষণ নেই, কিন্তু স্বয়মাগত শব্দ ব্যবহার করে যথাযথ ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। লেখকের মনের কথা স্বাভাবিক ভাবেই পরিণত হয় পাঠকের মনের কথায়। নিজস্ব স্টাইল দেখাবার অছিলায় জোরে জোরে শব্দ-ঝুমঝুমি বাজিয়ে ও বহুতর মুদ্রাদোষের সাহায্য নিয়ে অনেকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চান, কিন্তু প্রেমেন্দ্রের স্টাইল হচ্ছে স্বভাবসঙ্গত ও অকৃত্রিম। তাকে চালাতে হয় না, সে আপনি চলে। তাঁর ভাষা দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ মনে পড়ে—'সরলতাই ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।'

ফরাসী সাহিত্যাচার্য ফ্লবেয়ার বলেছিলেনঃ "সাদা কথায় সাদাকে ফোটানোই হচ্ছে উচ্চতর শক্তির কাজ।" সমালোচকরা ইংরেজী বাইবেলের ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তা কত সহজ, কত সরল! আধুনিক যুগের আর এক ফরাসী সাহিত্যাচার্য আনাতোল ফ্রাঁশও ছিলেন একান্তভাবেই জটিলতার বিরোধী। কোনদিন তিনি

কুয়াশার ধার দিয়েও যাননি, সাদা কথায় গেয়ে গিয়েছেন আলোকের গান। আবার তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে ফরাসী কবি স্টিফেন ম্যালার্মিকে বলতে শুনি, "এ কবিতাটিকে আবার নতুন করে লিখতে হবে। সবাই কবিতাটিকে পাঠ করে সহজেই বুঝতে পারছে।" ম্যালার্মির পরে এলেন পল ভ্যালারি, লোকে তাঁকে বলে, "নীরবতার বাণী" এবং তিনি বলেন—আমার নীরবতা সম্পূর্ণ নির্বাক হলেই আমি হতুম মহত্তর। তিনি অভিযোগ করলেন—আনাতোল ফ্রাঁশের রচনা বড় সরল! বঙ্কিমচন্দ্র ও ফ্রাঁশের সেকেলে মত একালে বোধ করি চলবে না। আধুনিকরা হয়তো বলবেন—ভাষার শ্রেষ্ঠ ত্রুটি হচ্ছে, সরলতা। সে যাই হোক, প্রেমেন্দ্র একেলে লেখক হয়েও যে বঙ্গদেশীয় ম্যালার্মি ও ভ্যালারিদের দলভুক্ত হননি, এইটেই হচ্ছে আনন্দের কথা। বুঝতে পারব না বলে লেখা পড়ব? এ মত যুক্তিহীন। এবং এই আজব মতের দোহাই দিলে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাঁরা অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছেন, আসর ছেড়ে সরে পড়তে হবে তাঁদের প্রত্যেককেই। আপন আপন আত্মীয়সভার কবি হচ্ছেন ম্যালার্মি ও ভ্যালারি। সেক্সপীয়রের নিজের আত্মীয়দের কেউ চেনে না, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের বাসিন্দারা হচ্ছে তাঁর আত্মীয়। বার্ণার্ড শ'য়ের জীবনব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার পরেও বিশ্বের বাসিন্দারা সেক্সপীয়রকে বয়কট করেনি। জানি ওয়াকারের ভাষায়ঃ "Born 1564, still going strong!"

রচনার ঐ প্রসাদগুণের জন্যেই প্রেমেন্দ্র অতি অনায়াসে বড়দের আড্ডা ছেড়ে ছোটদের আসরে এসে নিজের জন্যে জায়গা করে নিতে পারেন। বাজারে গুজব শুনি, ছোটদের জন্যে লেখা কেতাবের চাহিদা নাকি যথেষ্ট। তাই হয়তো কৌতূহলী হয়ে অনেকেই ছোটদের খেলাঘরে এসে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারেন। কিন্তু ফল হয় না সন্তোষজনক। শরৎচন্দ্রের একখানি এই শ্রেণীর বই আছে—আমি তার নামকরণ করেছিলুম, "ছেলেবেলার গল্প"। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার তুলনায় এ-বইখানির কাটতি আশাপ্রদ নয়। যে গল্পের

রচনারীতি সাবালকদের উপযোগী, তা পরিবর্তিত না করলে নাবালকদের মনে সাড়া দেয় না। আবার এক-একজন এমন লেখক আছেন, যাঁরা সাবালকদের নিয়ে কারবার করবার সময়েও স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও স্বাভাবিক সরলতাটুকু ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন না। তাই তাঁদের সে লেখা নাবালকরাও উপভোগ করতে পারে। প্রেমেন্দ্র হচ্ছেন এই শ্রেণীর লেখক। ছোটদের জন্যে লেখবার সময়ে তিনি নিজের রচনারীতি বিশেষ পরিবর্তিত না করেই দৃষ্টি রাখেন কেবল তাদের উপযোগী বিষয়বস্তুর দিকে। তাঁর ঝরেঝরে প্রাঞ্জল ভাষা ছোট-বড় উভয়েরই পক্ষে উপভোগ্য।

পটুয়াটোলা লেনে "কল্লোল" কার্যালয়ে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ছোটখাটো শ্যামবর্ণ মানুষটি, সাজগোজের ভড়ং নেই, প্রফুল্ল মুখ। তারপর এখানে-ওখানে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল; পরিচয়ও ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল। আমি তাঁকে হয়তো তেমন আকৃষ্ট করতে পারিনি, কিন্তু তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন আমাকে। "কল্লোল"এর মাধ্যমে যে কয়েক-জন সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গেই বেশিবার সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি।

একদিন তিনি আমার বাড়িতে পাঠগৃহের ভিতরে এসে বসলেন। সে ঘরের তিনদিকে ছিল কেতাবের আলমারি। প্রেমেন্দ্র চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে বইগুলো দেখতে লাগলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, "হেমেনদা, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল।"

আমি বললুম, "বদলে গেল? কেন?"

কেতাবের আলমারির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে তিনি বললেন, "এই সব দেখে।"

আগে আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল, সে কথা আমি আর জিজ্ঞাসা করলুম না, তিনিও খুলে কিছু বললেন না।

তাঁকে ভালোবেসেছিলুম সত্য সত্যই। রাজপথে, প্রকাশকের

পুস্তকালয়ে, ফুটবল খেলার মাঠে, যেখানেই তাঁকে দেখেছি, আমার বাড়িতে ধরে এনেছি। একবার কয়েক দিন তাঁর দেখা নেই, অথচ তাঁকে কাছে পাবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোথায় বাগবাজারের গঙ্গার ধার, আর কোথায় কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধার। ট্যাক্সি ডেকে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একেবারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তিনি বেরিয়ে আসতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে টেনে আনলুম নিজের বাড়িতে। তখন তিনি নিজেও প্রায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। একদিন এলেন যুগলে—অর্থাৎ নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে। নিজেও যেমন ছোট মানুষ, সহধর্মিণীরূপেও বেছে নিয়েছেন তেমনি একটি ছোট্ট তরুণীকে। বলা যায় মানিকজোড়।

ভেবেছিলুম প্রেমেন্দ্রকে পেলুম স্থায়ী বন্ধুরূপে, কিন্তু হঠাৎ সিনেমা এসে বাদ সাধলে। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন। সিনেমার যে প্রতিবেশ আমার কাছে অসহনীয়, তার মধ্যেই দিব্য বহাল-তবিয়তে তিনি করছেন জীবনযাপন। তিনি কেবল আমাকেই ভোলেন নি, প্রায় ভুলে গিয়েছেন সাহিত্যকেও। আগে তাঁর লেখনী প্রসব করত রচনার পর রচনা। এখন ন-মাসে ছ-মাসে তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়ে দু-এক ফোঁটা কালি—তাও রীতিমত জোর তাগিদের পর। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও ঐ দশা।

ওঁদের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকটা অর্থাভাবে প্রীতিকর হয়নি। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ "সর্বক্ষণ যদি দারিদ্র্যের সঙ্গেই যুঝতে হয়, তবে সর্বানন্দ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? কোথায় বা সংগঠনের সাফল্য? শৈলজা খোলার বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন্দ্র ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের অফিসে প্রুফ দেখেছে।"

কিন্তু তবু তখন তাঁরা সাহিত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। অমর ফরাসী লেখক গতিয়েরকেও জীবিকা নির্বাহের জন্যে অমনি সব উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হোত, কিন্তু তিনি সাহিত্যকে ত্যাগ করতে

পারেন নি। ইংলণ্ডের কবি ও শিল্পী বেক সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন নিরতিশয় দারিদ্র্যজ্বালা ভোগ করতে করতে, কিন্তু তবু কি তিনি নিজের আর্টকে ভুলে থাকতে পেরেছেন? চিত্রকর রেমব্রাণ্ড যখন সর্বহারা, বাজারে যখন তাঁর চাহিদা নেই এবং দেশের লোক তাঁকে ভুলে গিয়েছে, তখনও তিনি এঁকে গিয়েছেন ছবির পর ছবি। আমাদের দেশের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এক হাতে করতেন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ, আর এক হাতে করতেন কবিতা আর কবিতা রচনা।

সাহিত্যের জন্যে অর্থ আসতে পারে—কারুর কারুর যে আসছে, স্বচক্ষেই তো সেটা দেখছি। কিন্তু অর্থের জন্যে সাহিত্য নয়, সাহিত্য নয় অর্থের জন্যে। বরং অর্থ ক্ষুণ্ণ করে আর্ট ও সাহিত্যকে। প্রমাণ প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। অর্থের জন্যে তাঁরা হয়েছেন সিনেমাওয়ালা। আশা করি, সুগম হয়েছে তাঁদের অর্থাগমের পথ। আশা করি, ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এখন তাঁরা। তবু সিনেমার কাজের ফাঁকে তাঁরা যে সাহিত্যসেবার জন্যে খানিকটা সময় ব্যয় করতে পারেন না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। মনে হচ্ছে প্রেমেন্দ্রই কোথায় যেন এই মর্মে বলেছিলেন—'আর্টের জন্যে আমি প্রিয়াকে ছাড়তে পারি, কিন্তু প্রিয়ার জন্যে ছাড়তে পারি না আমার আর্টকে।' স্বধর্ম ত্যাগ না করলে এতদিনে তাঁর সাহিত্যসাধনার একটা মহান পরিণতি দেখবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাথেকে আমরা বঞ্চিত। প্রেমেন্দ্রের জন্যে আমি দুঃখিত।

"শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক "কল্লোল" গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের পক্ষে পরমবন্ধুর কাজ করেছেন। "কল্লোল"এর মতো ছোট ছোট আরো অনেক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে বাঙলা দেশে। তবে জনসাধারণের দৃষ্টি তাদের দিকে ভালো করে আকৃষ্ট হবার আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে তাদের পরমায়ু। কিন্তু "শনিবারের চিঠি" হয়েছিল "কল্লোল"এর লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মতো। "চিঠি"র সম্পাদকই হয়েছিলেন "কল্লোল"এর প্রচারকর্তা। তার অশ্লীলতার অভিযোগ

শুনে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে "কল্লোল"এর সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তথাকথিত অশ্লীলতার জন্যে কারুর মন অশুচি হয়েছিল কি না সে কথা আমি বলতে পারব না, তবে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, একদল অজানিত ও শক্তিধর লেখকের অভাবিত আবির্ভাব দেখে সকলেই বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। কারুর কারুর কাছে তাঁদের রচনার স্থলবিশেষ হয়তো স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়নি, কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁদের রচনা যে বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও বিশিষ্ট এ সম্বন্ধে মতদ্বৈত ছিল না নিশ্চয়ই; তাঁরা কাঁচা হাতে বেলেখেলা খেললে অশ্লীলতার খোরাক জুগিয়েও কিছুতেই টেকসই হতে পারতেন না। কিন্তু তাঁরা কচি হাতেও খেলতে পেরেছিলেন পাকা খেলা। লোকে তাই তাঁদের ভুললে না, চিনে রাখলে।

এই দলেরই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন বুদ্ধদেব। কাঁচা বয়সে হয়তো তিনি বয়সোচিত দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন অল্প-বিস্তর। কারণ "কল্লোল"এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প "রজনী হলো উতলা" (নামটি খাসা) সম্বন্ধে নিজেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন—গল্পটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। ঐটিই তাঁর রচিত প্রথম গল্প কি না, সে খবর আমি রাখি না। তবে প্রথম গল্প না হলেও ওটি তাঁর প্রথম বয়সেরই রচনা। সে হিসাবে গল্পটির রচনানৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বুদ্ধদেবের নিজের মুখ থেকেই জানতে পারি, এগারো বৎসর বয়সেই তিনি তিন-চারখানা খাতা কবিতায় কবিতায় ভরিয়ে ফেলেছেন এবং তখন তাঁকে আকৃষ্ট করত আমারই কোন কোন কবিতা। সে আজ প্রায় তিন যুগ আগেকার কথা। তিনি বলেন:—"যখন যে লেখা ভালো লাগতো, তক্ষুনি তার অনুকরণে কিছু লিখে ফেলতে না পারলে আমি টিকতেই পারতুম না। মৌচাকের দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রীষ্ম-বিষয়ক একটি কবিতা বেরুলো—খুব সম্ভব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা, আমি চটপট তার একটি নকল খাড়া করে মৌচাকে পাঠিয়ে দিলুম এবং চটপট সেটি ফেরৎ এলো।"

কিন্তু আজ তাঁর নকল করে লেখবার এবং লেখা ফেরৎ আসবার দিন আর নেই। পত্রিকা সম্পাদকের কাছে তাঁর রচনা এখন মহার্ঘ্য। কেবল বাঙলাতে নয়, ইংরেজীতেও তাঁর লেখার হাত রীতিমত পরিপক্ক। তিনি কেবল গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখেন না, বেশ লেখেন প্রবন্ধও। এক সময়ে নাটক রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন, তারপর ও-বিভাগ থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নূতন এবং আধুনিক যুগের উপযোগী। গত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি তেমন শ্রদ্ধাবান নন। কিন্তু গত যুগের কোন কোন সাহিত্যিকের মতন এমন মস্ত মস্ত গ্রন্থ রচনা করতে পারেন যে দেখলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়—তাদের মধ্যে 'কোয়ালিটি' ও 'কোয়ান্টিটি' দুই-ই পাওয়া যায়, সাধারণত যা দুর্লভ।

"কল্লোল" কার্যালয়ে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সময়ে প্রথম দেখি বুদ্ধদেবকে। তাঁর লেখা পড়লে মনে জাগে, একটি একরোখা মানুষের মূর্তি, মুখে যাঁর 'কুছ পরোয়া নেহি' গোছের অদম্য ভাব। কিন্তু চেহারাটি শান্তশিষ্ট নিরীহ ধরনের, দশজনের ভিতর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাঁর লেখায় যে ব্যক্তিত্ব পাই, তাঁর চেহারায় তা নেই। হাসতে হাসতে এবং কথা কইতে কইতে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করেন।

ভারি সিগারেটের ভক্ত। অস্কার ওয়াইল্ডের মতো তাঁর কাছেও সিগারেট বোধ করি "নিখুঁত আনন্দ"। ঐখানে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে। সিগারেটের অভাব হলে চোখে আমি অন্ধকার দেখি। অচিন্ত্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব একদিন আমার বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন।

অচিন্ত্য বললেন, "হেমেনদার বাড়িতে যেখানেই বসি, সেইখানেই দেখি খালি ছাইদান আর ছাইদান।" বুদ্ধদেব গম্ভীরভাবে বললেন, "প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়িতেই তা থাকা উচিত।"

জাত-সাহিত্যিক এই বুদ্ধদেব। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠা। এসেছে সৌভাগ্য, এসেছে দুর্ভাগ্য, কিন্তু টাকার প্রভাবে বা অভাবে কোন দিনই বিসর্জন দেননি সাহিত্যধর্ম। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।